নিমাই ভট্টাচার্য

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ, ১৩৭৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫
তৃতীয় মুদ্রণ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
১১এ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
স্বকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
অজিত গুপ্ত

আট টাকা

There are two tragedies in life.
One is to lose your heart's desire.
The other is to gain it,

—G. B. S.

'যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্,
তারা তো পারে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে।"

ওয়েস্টার্ণ কোর্ট
জনপথ
নিউদিল্লী

দোলাবৌদি,

তোমার চিঠি পেলাম। অশেষ ধন্যবাদ। তুমি আমাকে ভালবাস, স্নেহ কর। তাইতো স্বপ্ন দেখ আমি ঘর বাঁধি, সুখী হই। একটা রাঙা টুকটুকে বৌ আসুক আমার ঘরে। আমাকে দেখাশুনা করুক, একটু ভালবাসুক, আমার জীবনের একটা অবলম্বন হোক। তাই না? ভাবতে বেশ লাগে। আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে একটা জুনিয়র দোলা এসে দোলা দিলে মন্দ হতো না! হয়ত তাঁর আবির্ভাব হলে নিজের জীবনটাকে নিয়ে এমন জুয়া খেলতাম না, ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি করতাম না। হয়ত তাঁর ছোঁয়া পেলে বুকের ব্যথাটা সেরে যেত, হয়ত নিকট ভবিষ্যতে মুসৌরী বা নৈনীতালের কোন নার্সিংহোমে যাবারও প্রয়োজন হতো না। হয়ত আরো অনেক কিছু হতো। নিজের কাছ থেকে নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম না। তাই না থারাবৌদি?

সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ে করতে আমার সম্মতি না থাকলেও যদি কোন মেয়ে আমাকে বিয়ে করে তাতে আমার বিশেষ অসম্মতি নেই। বরং বেশ আগ্রহই আছে। আর তাছাড়া আগ্রহ না থাকার কি কারণ থাকতে পারে?

তুমি তো নিজেই আঠারো কি উনিশ বছর বয়স থেকে খোকনদাকে দোলা দিতে শুরু করেছিলে। ইউনিভার্সিটির দুই গেট দিয়ে দু'জনে বেরুতে। তুমি ইউনিভার্সিটির দোরগোড়া থেকে ২-বি বাসে চাপতে আর খোকনদা মেডিক্যাল কলেজের পিছন থেকে ন'নম্বর বাসে চাপত। দু'জনে দুটি বাসে চাপলে কি হয়! দু'জনেই তো নেমে পড়তে লিণ্ডসে স্ট্রীট'এর মোড়ে। ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপানো শীতে ফাঁকা দার্জিলিং উপভোগ করেছ তোমরা দুজনে। এসব আমি জানি। আরো জানি তুমি নিজের হাতের কঙ্কণ আর গলার মোটা হারটা বিক্রী করেছিলে বলেই খোকনদা অত দিন ধরে রিসার্চ করে পি-এইচ-ডি হতে পারল। এমনি করে দোলা দিতে দিতে একদিন অকস্মাৎ নিজের দোলনায় তুলে নিলে খোকনদাকে।

এসবই তো নিজের চোখে দেখা। আরো অনেককেই তো দেখলাম। মঞ্জরী, লিপি, কণিকারাই কি কম খেল দেখাল। আমার প্রথম যৌবনের সেই সবুজ কাঁচা দিনগুলিতে তোমরা সবাই আমাকে যথেষ্ট ইনফ্লুয়েন্স করেছিলে। হয়ত আজো সে ইনফ্লুয়েন্স শেষ হয় নি। আর ঐ অনুরাধা? কত বড় বড় কথা, কত লেকচার, কত তর্ক-বিতর্ক! বিয়ে? সরি! শেষ পর্যন্ত একটা পুরুষের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আমাকে শিকার করবে? নেভার, নেভার, নেভার!

মনে পড়ে দোলাবৌদি? অনুরাধা শেষকালে চীৎকার করে হেনরি ফিল্ডিং'কে কোট্ করে বলত, 'His designs were strictly honourable, as the saying is: that to rob a l[illegible] of her fortune by way of marriage.'

আমাদের সেই অনুরাধাও একদিন বর্ধমানের নীতীশের গলায় মালা' পরাল। আমি দিল্লীতে ছিলাম না। তাই অনুরাধার আমন্ত্রণ পেতে একটু দেরী হওয়ায় সে দৃশ্য দেখার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু তাঁর বৌভাত-ফুলশয্যার দিন আমি বর্ধমান না গিয়ে পারিনি। প্রাচীন কাব্যে আছে অনন্তযৌবনা উর্বশীর ক্যাবারে ডান্সের ঠেলায় স্বর্গরাজ্যের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের সব কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। কিন্তু মুনি-ঋষিদের নাচে উর্বশীর ধ্যানভঙ্গ? না, পড়িনি। তবে দেখলাম অনুরাধার বেলায়। একটা ভাঙা জীপগাড়ি, ছুটো কনেস্টবল আর একটা পেটমোটা সাব-ইন্সপেক্টরের ঘাড়ে চড়ে আই-পি-এস নীতীশ এমন নাচই নাচল যে, অনুরাধাও ক্লিন বোল্ড হয়ে গেল।

ঐ উৎসবের বাড়িতেই লোকজনের ভিড় একটু পাতলা হলে আমি কানে-কানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অনু, এ কি হলো? ছিঃ ছিঃ। শেষ পর্যন্ত পুরুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিকার হলে?

তুমি তো অনুরাধাকে ভালভাবেই জান। ও ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। তাই শেক্সপিয়ারের 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' থেকে কোট করে বলল, 'My salad days when I was green in judgement.'

চমৎকার! তোমাদের এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার বিয়ে করার ইচ্ছা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? মাঝে মাঝেই ভাবি আমিও যদি খোকনদা বা নীতীশের মত……।

যাকগে ওসব। আচ্ছা দোলাবৌদি, তাছাড়া পাত্র হিসেবে কি আমি খুব খারাপ? বোধ হয় না, তাই না? লেখাপড়া না শিখলেও কলেজে—ইউনিভার্সিটিতে গেছি ক'বছর। খবরের কাগজের স্পেশ্যাল করস্পনডেন্টের চাকরিটাও নেহাত মন্দ নয়। বেশ চটক আছে। মাইনেও নেহাত কম পাই না। বাড়ি না থাকলেও গাড়ি আছে, নায়েব না থাকলেও স্টেনো তো আছে।

তাছাড়া শুনেছি আজকালকার মেয়েরা বিলেত-ফেরত দুষ্টু ছেলেদের বেশ পছন্দ করে। মেয়েদের বাপ-মা স্মার্ট-সফিসটিকেটেড বলে ঐসব দুষ্টু ছেলেদের জামাই করতে আপত্তি করেন না। সেদিক থেকে আমি ওভার-কোয়ালিফায়েড! একবার নয়, বহুবার গেছি বিলেত। লোকে বলে দুষ্টুমিও নাকি করেছি।

আরো একটা ব্যাপার আছে। পটলডাঙার গোবিন্দ বিলেত-ফেরত বলে বিয়েতে ফিল্মস্টারদের মত ইনক্যাম ট্যাক্স ফ্রি দশ হাজার টাকা ব্ল্যাকমানি পেয়েছিল। সুতরাং আমার ভবিষ্যতও বেশ উজ্জ্বল মনে হয়। আর তাছাড়া তোমার মত হাই ফার্স্টক্লাশ পাওয়া এজেন্ট যখন আছে! পয়সাওয়ালা বোকা বোকা লোকের একটা উড়ু-উড়ু মেয়ে শিকার করা অধ্যাপিকা দোলা সরকারের পক্ষে নিশ্চয়ই খুব কষ্টকর নয়।

তবে তার আগে মেমসাহেব উপাখ্যানটা তোমাদের সবার জেনে নেওয়া দরকার। আমার ঐ কালো মেমসাহেবকে নিয়ে তোমরা অনেকদিন হাসি-ঠাট্টা করেছ। হয়ত কিছু ধারণাও করেছ মনে মনে। শুধু তুমি কেন, অনেকের মনেই আমার মেমসাহেবকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন। কেউ-কেউ ভাবে মেমসাহেব বলে কেউ নেই। পুরোটাই গুল, ফোরটোয়েন্টি। আবার কেউ-কেউ ভাবেন মেমসাহেবকে আমি শুধু ভালবাসিনি, বিয়েও করেছি। নানা ধরনের নানা লোকজনের কাছ থেকে মেমসাহেব সম্পর্কে চিঠিপত্রও কম পাই না।

যার সঙ্গেই নতুন আলাপ হয়, তিনিই প্রশ্ন করেন, মেমসাহেব কে? ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ী সবারই ঐ এক প্রশ্ন। এইত কদিন আগে দিল্লী ইউনিভার্সিটির এক তন্বী-শ্যামার সঙ্গে আলাপ হলো। বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দুটো থিন-এরারুট বিস্কুট, একটা প্যাড়া সন্দেশ আর এক কাপ চা দিয়েই মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, মা জানতে চাইছিলেন মেমসাহেবের আসল নাম কি?

বছরখানেক আগে সিউড়ি থেকে এক বৃদ্ধা পার্শেল করে একটা লাল টুকটুকে সিল্কের শাড়ী পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে একটা ছোট্ট চিঠি ছিল। লিখেছিলেন, তোমার মেমবৌকে এই শাড়ীটা আশীর্বাদী পাঠাচ্ছি। বিদেশী মেমকে এই শাড়ীটা পরলে ভালই লাগবে। মাতৃতুল্যা স্নেহাতুর বৃদ্ধাকে আমি লিখেছিলাম, মা, শাড়ীটা আপনি সাবধানে রেখে দিন। সময় মত আপনার মেমবৌকে নিয়ে ওখানে গিয়েই শাড়ীটা গ্রহণ করব।

মেমসাহেবকে নিয়ে আরো কত কি কাণ্ডই হয়। তাইতো এবার ভেবেছি তোমাদের সঙ্গে এমন করে আর লুকোচুরি না খেলে পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলব। তাছাড়া আমার জীবনের এইসব ইতিহাস না জানলে তোমার পক্ষে ঘটকালি করারও অসুবিধা হতে পারে। তোমাকে সব কিছু লেখার আগে নৈতিক দিক থেকে মেমসাহেবের একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। কিন্তু আজ সে এতদূরে চলে গেছে যে, তাঁর অনুমতি যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। আর হ্যাঁ, তাছাড়া ঠিকানাটাও ঠিক আমার জানা নেই।

দুই

মনে হলো তুমি আমার চিঠি পড়ে ঘাবড়ে গেছ। গত চিঠিতে বিশেষ কিছুই লিখি নি, এমন কি গৌরচন্দ্রিকাও পূর্ণ হয় নি। সুতরাং এখনই নার্ভাস হবার কি আছে? তাছাড়া তুমি না মেয়ে? অন্যের প্রেমের ব্যাপারে তোমাদের তো আগ্রহের শেষ নেই। শিক্ষিতাই হোক, আর অশিক্ষিতাই হোক, প্রেমপত্র সেন্সর করতে মেয়েরা তো শিরোমণি! ইউনিভার্সিটির জীবনে তো দেখেছ লেকচার শোনা, কফিহাউসে আড্ডা দেবার মত অন্যদের প্রেমপত্র হাত করাও প্রায় সব মেয়েদের নিত্যকার কাজ ছিল। গণ্ডগ্রামে

যাও, সেখানেও দেখবে পারুল-বৌদির চিঠি অন্নপূর্ণা-ঠাকুরঝি না পড়ে কিছুতেই ছাড়বে না। শুনেছি স্কুল-কলেজে মেয়েদের চিঠি এলে দিদিমণিরা একবার চোখ না বুলিয়ে ছাড়েন না। ছাত্রীদের অভিভাবকত্ব করবার অছিলায় চুরি করে প্রেমপত্র পড়াকে কিছুটা আইনসম্মত করা যেতে পারে মাত্র ; কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

তাছাড়া প্রেমের কাহিনী জানতে মেয়েদের অরুচি ? কলিকালে না জানি আরো কত কি দেখব, শুনব। মেয়ের বিয়ে হলে মা পর্যন্ত জানতে চান, হ্যাঁরে খুকী, জামাই আদর-টাদর করেছিল তো ? হাজার হোক মা তো! ঠিক খোলাখুলিভাবে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। তাই ঘুরিয়ে আদর-টাদর করার খবর নেন। বাসরঘর তো মাসি-খুড়ি থেকে দিদিদের ভিড়ে গিজ-গিজ করে।

আর সেই সতী-সাবিত্রী সীতা-দময়ন্তী থেকে শুরু করে আমাদের মা-মাসিরা যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বজা বহন করে এনেছেন, শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে যে ঐতিহ্যের ধারা অম্লান রেখেছেন, আজ তুমি সেই মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে, আমি ভাবতে পারিনি।

সর্বোপরি আমি যখন নিজে স্বেচ্ছায় তোমাকে সব কথা বলছি, তখন তোমার লজ্জা বা সঙ্কোচের কি কারণ থাকতে পারে ? আর তোমাকে ছাড়া আমার এই ইতিহাস কাকে জানাব বলতে পারো ? তুমি আমার থেকে মাত্র এক বছরের সিনিয়র হলেও তোমাকে আমি সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি। খোকনদার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা যেদিন থেকে আবিষ্কার করেছি সেইদিন থেকেই তুমি আমার দোলাবৌদি হয়েছ। ছাত্রজীবনের সেই শেষ দিনগুলিতে আর আমার কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে তুমি আর খোকনদা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছ, সহানুভূতি জানিয়েছ, তার তুলনা হয় না। তাইতো জীবনের সমস্ত সুখে-দুঃখে প্রথমেই মনে পড়ে তোমাদের।

মেমসাহেবের ব্যাপারটা ইচ্ছা করেই জানাই নি। তোমরা অবশ্য কিছু কিছু আঁচ করেছিলে কিন্তু খুব বেশী জানতে পার নি। ভগবানের দয়ায় আমি দিল্লী চলে আসায় নাটকটা আরো বেশী জমে উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে আর খোকনদাকে একটা সারপ্রাইজ দেব। তাই কিছু জানাই নি। কিন্তু আর দেরি করা ঠিক হবে না। তুমি যখন আমার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ তখন সব কিছু না জানান অন্যায় হবে।

আর শুধু মেমসাহেবের কথাই নয়, আমার জীবনে যেসব মেয়েরা এসেছে, তাদের সবার কথাই তোমাকে লিখব। সব কিছু তোমাকে জানাব। কিচ্ছু লুকাব না। আর কিছু না হোক, তোমাকে হলপ করে এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে, আমার এই কাহিনী তোমার খুব খারাপ লাগবে না। যদি ভাষাটাকে একটু এডিট্ করো, তাহলে হয়ত ছাপা হয়ে বই বেরুতে পারে।

সুতরাং হে আমার দোলাবৌদি। ধৈর্য ধর! হে আমার খোকনদার প্রাণের প্রিয় 'দোলে দোদুল দোলে দোলনা' দোলা। তোমার ভ্রাতৃসম লক্ষ্মণ-দেবরের প্রতি কৃপা কর, তার ইচ্ছা পূর্ণ কর।

তিন

সেদিন কি তিথি, কি নক্ষত্র, কি লগ্ন ছিল, তা আমি জানি না। জীবন-নদীতে এত দীর্ঘদিন উজান বইবার পর বেশ বুঝতে পারছি যে সেদিন বিশেষ শুভলগ্নে আমি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখিনি। এই পৃথিবীর বিরাট স্টেজে বিচিত্র পরিবেশে অভিনয় করার জন্য আমার প্রবেশের কিছুকালের মধ্যেই মাতৃদেবী প্রস্থান করলেন। একমাত্র দিদিও আমার জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কেই জামাইবাবুর হাত ধরে শ্বশুরবাড়ি কেটে পড়ল। আমার জীবনের সেই প্রাগৈতিহাসিক

তিনটে কপিও পাওয়া গিয়েছিল। নিয়মিত বাসাবদলের দৌলতে দু'টি কপি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তৃতীয় কপিটি দিদির সংসারে ক্ষুধার্ত উইপোকার উদরের জ্বালা মেটাচ্ছে। মানুষের জীবনে প্রথম ও প্রধান নারী হচ্ছে মা। তাঁর স্নেহ, তাঁর ভালবাসা, তাঁর চরিত্র, আদর্শ প্রতি পুত্রের জীবনেই প্রথম ও প্রধান সম্পদ। আমি সেই স্নেহস্পর্শ, ভালবাসা ও সম্পদ থেকে চিরবঞ্চিত থেকে গেছি। তাইতো আমার জীবনে নারীর প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধিতে অনেক সময় লেগেছে।

ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে ও আশপাশে কোন বোন বা অন্য কোন নারীচরিত্র না থাকায় মেয়েদের সম্পর্কে আমার শঙ্কা ও সঙ্কোচ বহুদিন কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। আমার কৈশোরের সেই সেদিনের কথা মনে হলে আজও হাসি পায়।···

তখন ক্লাশ নাইন থেকে টেন'এ উঠেছি। সবে পাখনা গজান শুরু হয়েছে। হাফ প্যান্ট ছেড়ে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা ধরেছি। ফুলহাতা শার্টের হাতা না গুটিয়ে পরলে বোকা বোকা মনে হয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল পেটাতে বেশ আত্মসম্মানে লাগে। বিকেলবেলার একমাত্র 'রিক্রিয়েশন' দু'চারজন বন্ধু মিলে পাড়ার এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে আড্ডা দেওয়া। মণ্টুদার বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল, হৃদ্যতা ছিল। দু'একবার পৌষ-সংক্রান্তির দিন মণ্টুদার মা আমাকে আদর করে পিঠে-পায়েসও খাইয়েছেন। শুনেছি দিদির বিয়ের সময় মণ্টুদাদের বাড়ির সবাই খুব সাহায্য করেছিলেন। ঐ বাড়ির সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল, ওদের পরিবারের অনেক খবরই আমি জানতাম। জানতাম না শুধু নন্দিনীর কথা। ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে মণ্টুদার এই চঞ্চলা কিশোরী ভাইঝি কবে আকস্মাৎ মহানগরীতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, সে খবর আমি রাখিনি। তিনিও যে নাইন থেকে

ট্রেন'এ উঠে মীর্জাপুরের বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়কে ধন্য করার জন্য কলকাতা এসেছেন, তাও জানতাম না। জানতাম না আরো অনেক কিছু। জানতে পারিনি যে চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি তার জীবন-নাট্যের নায়ক খুঁজতে বেরিয়েছেন। এসব কিছুই আমি জানতাম না।

একদিন মন্টুদাদের বাড়ি থেকে দু' একটা গল্পের বই নিয়ে বেরুবার সময় মাথার ওপর একটা কাগজের প্যাকেট এসে পড়ায় চমকে গেলাম। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম একটা খাম। নাম ঠিকানা কিছুই লেখা ছিল না। শুধু লেখা ছিল, 'তোমার চিঠি'। তোমার চিঠি! মানে আমার চিঠি! মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গেলাম। দু'এক মিনিট বোধহয় থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর একটু হলেই চীৎকার করে মন্টুদাকে ডাক দিতাম। কিন্তু হঠাৎ যেন কে আমার মাথায় বুদ্ধি জোগাল। চারপাশটা একনজরে দেখে নিলাম। শুধু বুড়ো কাকাতুয়া পাখীটা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। খামটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলাম। উপরের লেখাটা বারকয়েক পড়লাম, তোমার চিঠি। তারপর দৃষ্টিটা দোতলার দিকে ঘুরিয়ে নিতেই কোনার ঘরের জানলায় হাসিখুশিভরা একটা সুন্দরী কিশোরীকে দেখলাম।

অনেকদিন আগেকার কথা সবকিছু ঠিক মনে নেই। তবে আবছা আবছা মনে পড়ে কি যেন একটা ইশারা করে নন্দিনী লুকিয়েছিল। নারী চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি চিঠিটি নন্দিনীরই লেখা।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বাসায় এলাম। ঘরের খিল বন্ধ করে চিঠিটা একবার নয়, অনেক বার পড়লাম। চিঠির ভাষাটা আজ আর মনে নেই কিন্তু ভাবটা একটু একটু মনে পড়ে। কিছুটা উচ্ছ্বাস, কিছুটা আবেগ ছিল চপলা কিশোরী নন্দিনীর ঐ চিঠিতে। চিঠিটা পেয়ে ভালও লেগেছিল, ভয়ও লেগেছিল। তার চাইতে আরো বেশী

লেগেছিল অবাক। ধনীর দুলালীর জীবন-উৎসবে আমার আমন্ত্রণ! আমার মত একটা ভাঙা ডিঙ্গি নৌকা চড়ে নন্দিনী জীবন-সাগর পাড়ি দেবে? আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

নন্দিনী চিঠির উত্তর চেয়েছিল কিন্তু আমার সাহস হয় নি। উৎসাহও আসে নি। উত্তর দিইনি, তবুও আবার চিঠি পেয়েছিলাম। ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, আমি নাকি তার মানসরাজ্যের রাজপুত্তুর। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে নন্দিনীকে নিয়ে অভিষিক্তা করব আমার জীবন-সঙ্গিনীরূপে। আরো অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সে। জীবন যার প্রাচুর্যে ভরা, বিলাসিতা করা যার স্বভাব, তার পক্ষে এমন অহেতুক স্বপ্ন দেখা হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মত দৈন্যভরা কিশোরের পক্ষে এমন স্বপ্ন দেখা সম্ভব ছিল না। তাইতো তাঁর সে আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করতে পারিনি। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ক্ষমতা বা সাহসও আমার ছিল না।

নন্দিনীকে আমি ভালবাসিনি। কিন্তু প্রাণচঞ্চলা এই কিশোরীকে ভুলব না কোনদিন। সে আমার জীবনযজ্ঞের উদ্বোধন-সঙ্গীত গেয়েছিল। এই কিশোরী আমার জীবন-নাট্যমঞ্চে শুধু একটু উঁকি দিয়েই সরে গিয়েছিল, বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করার অবকাশ পায় নি, কিন্তু তবু তার এক অনন্য ভূমিকা রয়ে গেছে আমার কাছে। বি-এ বা এম-এ পাশ করার পর জীবনের বৃহত্তর পটভূমিকায় অতীতের অনেক স্মৃতি হারিয়ে যায়, কিন্তু হারিয়ে যায় না পাঠশালার গুরুমশায়ের স্মৃতি। নন্দিনী আমার তেমনি একটি অমূল্য স্মৃতি। সে আমার ভোরের আকাশের একটি তারা। সে তারার জ্যোতিতে আমি আমার জীবন-পথ চলতে পারিনি বা তার প্রয়োজন হয় নি। তা না হোক। তবুও সে আমার জীবন দিগদর্শনে সাহায্য করেছিল। সর্বোপরি সে আমাকে আমার আমিত্ব আবিষ্কারে সাহায্য করেছিল।

ভালবাসা কি এবং তার কি প্রয়োজন, সেদিন আমি বুঝিনি,

জানিনি। নন্দিনী কেন আমাকে ভালবেসেছিল, কি সে চেয়েছিল, কি পেয়েছিল—কিছুই আমি জানি না। শুধু এইটুকুই জানি আমার সুখে সে সুখী হতো, আমার দুঃখে সে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জলও ফেলেছে। ছন্দোবদ্ধভাবে এইসব অনুভূতির প্রকাশ করবার সুযোগ কোনদিনই সে পায় নি। কিন্তু যখনই সে সুযোগ এসেছে, নন্দিনী তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে।

সরস্বতী পূজার আগের ক'দিন মরবার অবকাশ থাকত না। খাওয়া-দাওয়া তো দূরের কথা ঘুমুবার পর্যন্ত সময় পেতাম না। সারা দিন-রাত্তিরই রিপন স্কুলে কাটাতাম। নন্দিনী ঠিক জানত আমি কোন গরম জামা নিয়ে যাই নি। সন্ধ্যার পর এক ফাঁকে একটা আলোয়ান নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে আসত। বলত, তোমার কি ঠাণ্ডাও লাগে না? যদি জ্বরে পড়, তাহলে কি হবে বল তো!

একবার সত্যি সত্যিই আমি খুব অসুস্থ হয়েছিলাম। ন'টা বাজতে না বাজতেই বাবা বিদায় নিতেন। ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা! অখিল মিস্ত্রী লেনের ঐ বিখ্যাত ভাঙা বাড়িটার অন্ধকার কক্ষে আমি একলা থেকেছি। মন্টুদাদের বাড়ি থেকে আমার পথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল নন্দিনীর আগ্রহেই। দু'বেলা স্কুলে যাতায়াতের পথে নন্দিনী আমাকে দেখে যেত। হয়ত একটু সেবা-যত্নও করত।

এসব অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। শুধু আমার জন্য একজন পথ চেয়ে বসে থাকবে, আমাকে ভালবেসে, সেবা করে, যত্ন করে, কেউ মনে মনে তৃপ্তি পাবে, আমি ভাবতে পারতাম না। নন্দিনী আমার জীবনে সেই অভাবিত অধ্যায়ের সূচনা করে।

ম্যাট্রিক পাশ করার পরই নন্দিনী বোম্বে চলে গেল। আমার জীবনের সেই ক্ষণস্থায়ী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তবুও সে আমার জীবন থেকে একেবারে বিদায় নিল না। চিঠিপত্র

নিয়মিত আসত। আর আসত আমার জন্মদিনে একটা শুভেচ্ছা। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা নেতাজী নই। আমার মত সাধারণ মানুষের জন্মদিনে যে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান হতে পারে, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। আমার জন্মদিনে বাবা ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেই অফিসে দৌড় দিতেন। সেবারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। বিকেলবেলায় নন্দিনী টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে আমার জন্য সামান্য কিছু উপহার এনে চমকে দিয়েছিল।

নন্দিনী আজ অনেক দূরে চলে গেছে। সুখে-শান্তিতে স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘরসংসার করছে। তার আজ কত কাজ, কত দায়িত্ব। কিন্তু তবুও একটা গ্রীটিংস টেলিগ্রাম পাঠাতে ভোলে না আমার জন্মদিনে।

কলকাতা থেকে বিদায় নেবার পর আমার সঙ্গে নন্দিনীর আর দেখা হয় নি। এম-এ পড়বার সময় ওর বিয়ে হলো এক আই-এ-এস পাত্রের সঙ্গে। নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ-পত্রও এসেছিল। কিন্তু আমার পক্ষে তখন বোম্বে যাওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। টিউশানির টাকা আগাম নিয়ে পনের টাকা দামের একটা তাঁতের শাড়ী পাঠিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার জীবন-যুদ্ধে এমন মেতে উঠেছিলাম যে নন্দিনীকে মনে করার পর্যন্ত ফুরসত পেতাম না।

প্রায় বছর দশেক পরে আমি গ্যাংটক গিয়েছিলাম কি একটা কাজে। তিন-চারদিন পরে কলকাতার পথে শিলিগুড়ি ফিরছিলাম। পথে আটকে পড়লাম। সেবক ব্রীজের কাছে কিছুটা ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়েছিল। কুলি-মজুরের দল রাস্তা পরিষ্কারে ব্যস্ত। আমার মত অনেকেই প্রকৃতির এই খামখেয়ালীপনায় বিরক্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিলেন। রাস্তা পরিষ্কার হতে আরো ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। এই দীর্ঘ অবসরে অনেকের

সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হলো। কার্শিয়াং-এর তরুণ এস-ডি-ও'র সঙ্গেও বেশ ভাব হয়ে গেল।

মাসকয়েক পর আবার কর্মব্যপদেশে দার্জিলিং যাচ্ছিলাম। পথে কার্শিয়াং পড়বে। মনে মনে ঠিক করেছিলাম এস-ডি-ও সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং এলাম। হঠাৎ অফিসে গিয়ে হাজির হওয়ায় এস-ডি-ও সাহেব চমকে গেলেন। পর পর দু'কাপ কফি গিলেই পালাবার উপক্রম করছিলাম কিন্তু এস-ডি-ও সাহেব বললেন, তা কি হয়। আমার কোয়ার্টারে যাবেন, লাঞ্চ খাবেন। তারপর বিকেলের দিকে দার্জিলিং যাবেন।

আমার কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই এস-ডি-ও সাহেব কোয়ার্টারে টেলিফোনে স্ত্রীকে জানালেন, নন্দা, আমার এক বন্ধু এসেছেন কলকাতা থেকে। লাঞ্চে নিয়ে আসছি। তুমি একটু ব্যবস্থা করো।

গোটা বারো নাগাদ এস-ডি-ও সাহেব আমাকে নিয়ে কোয়ার্টারে গেলেন। ড্রইংরুমে আমাকে বসিয়ে রেখে স্নান করবার জন্য বিদায় নিলেন। মিনিট কয়েক পরে আর কেউ নয়, স্বয়ং নন্দিনী কফির কাপ হাতে নিয়ে আমার সামনে হাজির হলো। দু'জনেই একসঙ্গে বলেছিলাম, তুমি ?

সেদিন কার্শিয়াং পাহাড়ের সমস্ত কুয়াশা ভেদ করেও নন্দিনীর চোখেমুখে যে উজ্জ্বলতা, যে আনন্দ দেখেছিলাম, তা কোনদিন ভুলব না। এস-ডি-ও সাহেবকে বলেছিলাম, আপনি যে মন্টুদাদের বাড়ির জামাই, তা তো জানতাম না। সংক্ষেপে জানালাম ওর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার কথা। গোপন করিনি যে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ছোটবেলায় খেলাধুলা করেছি।

এস-ডি-ও আমাকে শ্বশুরবাড়ির দূত মনে করে আনন্দে মেতে উঠলেন। লাঞ্চের টেবিলে এক গেলাস স্কোয়াস হাতে নিয়ে আমার হেলথ্'এর জন্য প্রপোজ করতে গিয়ে ঘোষণা করলেন, মিস্টার

জার্নালিস্ট আজ রাত্রে এক স্পেশ্যাল ডিনারে চীফ গেস্ট হবেন এবং কার্শিয়াংএ রাত্রিবাস করবেন।

আমি বললাম, তা কি হয়।

এস-ডি-ও সাহেব বললেন, ভুলে যাবেন না আমি শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাই তা নয়, বিচারও করি। আমি কার্শিয়াং-এর চীফ জাস্টিস কাম প্রাইম মিনিস্টার।

নন্দিনী বলল, এতদিন পর যখন দেখা হলো, একটা দিন থাকলে কি তোমার খুব ক্ষতি বা কষ্ট হবে?

সত্যি খুব আনন্দ করে সেই দিনটি কাটিয়েছিলাম। নন্দিনী ঠিক এতটা আদর-যত্ন করবে, ভাবতে পারিনি।

কর্মজীবনের পাকচক্রে আমি ছিটকে পড়েছি বহুদূরে। নন্দিনীর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি, ভবিষ্যতে কোনদিন দেখা হবে কিনা, তাও জানি না। তবে ভুলব না তার স্মৃতি।

জান দোলাবৌদি, আমি কার্শিয়াং ত্যাগের আগে নন্দিনী বলেছিল, একটা অনুরোধ করব?

আমি বলেছিলাম, তার জন্য কি অনুমতির প্রয়োজন?

'না তা নয়। তবে বলো আমার অনুরোধটা রাখবে।'

বিদায় নেবার প্রাক্কালে মনটা নরম হয়েছিল। কোনকিছু তর্ক করার প্রবৃত্তি ছিল না। বললাম, নিশ্চয়ই রাখব।

'তোমার পুত্রবধূর নাম রেখো নন্দিতা। রাখবে তো?'

আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম ওর ঐ বিচিত্র অনুরোধ করার জন্য। ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে কথা বলতে পারিনি। শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।

এই চিঠি আর দীর্ঘ করব না। তাছাড়া তুমি তো আমার চিঠি একবার পড়ে ক্ষান্ত হও না। আর যাই কর আমার এসব চিঠি তুমি কলেজে নিয়ে ক্লাশে বসে পড়ো না। তিন-চারদিনের জন্য এলাহাবাদে যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার চিঠি দেব।

চার

ভেবেছিলাম তিন-চার দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ-বাস শেষ হবে। আশা করেছিলাম এই ক'দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার একটা হিল্লে হবে। দেশটা এমন একটা স্তরে এসে পৌঁচেছে যে আমাদের কোন আশাই যেন আর কোনদিন পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। ভাষা নিয়েও তাই আমাদের আশা পূর্ণ হলো না এবং আমার এলাহাবাদ ত্যাগ করাও সম্ভব হয় নি। আমি আজও এলাহাবাদে আছি ; আগামী কাল ও পরশুও আছি। হয়ত আরো অনেক দিন থাকতে পারি।

ক'দিন শুধু টাইপরাইটার খট্‌খট্‌ করে প্রায় অ্যালার্জি হবার উপক্রম হয়েছে। তাইতো একটু মুখ পাল্টে নেবার জন্য তোমাকে আমার মেমসাহেব কাহিনী আবার লিখতে শুরু করলাম।

নন্দিনীর বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন সংগ্রাম শুরু হলো। তুমি তো জান বাংলাদেশটা দু'টুকরো হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মত লক্ষ লক্ষ বাঙালী যুবক-যুবতীদের অদৃষ্টও টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এমন করে কালবৈশাখী দেখা দেবে। ভাবিনি জীবনের সমস্ত দিগন্ত এমনভাবে অন্ধকারে ভরে যাবে।

রিপন স্কুল ত্যাগ করে রিপন কলেজে ভর্তি হলাম। সবার মুখেই শুনছিলাম আর্টস পড়লে কোন ভবিষ্যত নেই ; সায়েন্স না পড়লে দেশ ও দেশের যুবকদের মুক্তির কোন উপায় নেই। বাপ-ঠাকুর্দার সঙ্গে জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও চোদ্দপুরুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তবুও আমি বিজ্ঞান সাধনা শুরু করলাম। তবে দেশের অবস্থা এমন অদ্ভুত জটিল

হয়েছিল যে শুধু বিজ্ঞান সাধনা করেই দিন কাটান সম্ভব ছিল না, লক্ষ্মীর সাধনাও শুরু করলাম।

কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করা মুখ্য হলেও সকাল-সন্ধ্যায় টিউশানি করে রসদ যোগাড় করার কাজটাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই দোটানার মধ্যে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। নিজের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পাচ্ছিলাম না। ছোটবেলায় কলেজ জীবন সম্পর্কে অনেক রূপকথার কাহিনী শুনতাম। স্কুলে পড়বার সময় তাই অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন দেখতাম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাতে খাতা দোলাতে দোলাতে কলেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মাস্টার মশাইদের মত প্রফেসাররা অযথা ছাত্রদের বকাবকি করছেন না, ক্লাশ ফাঁকি দেবার অবাধ স্বাধীনতা এবং আরো অনেক কিছু। আশা করেছিলাম কলেজ জীবন সাফল্যপূর্ণ বৃহত্তর জীবনের পাশপোর্ট তুলে দেবে আমার হাতে। এই ক'বছরের শিক্ষা-দীক্ষা ও সর্বোপরি অভিজ্ঞতা আমার চোখে নতুন স্বপ্ন, নতুন আশা এনে দেবে, সম্ভব করে তুলবে তাদের বাস্তব রূপায়ণ। লুকিয়ে লুকিয়ে মনে মনে হয়ত এ আশাও করেছিলাম আমি সার্থক, সাফল্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে সগর্বে এগিয়ে যাব আগামী দিনের দিকে।

সেদিন জানতাম না বাংলা দেশের সব যুবকই কলেজ জীবনের শুরুতে এমনি অনেক স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্ন চিরকাল শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। বোধহয় একজনের জীবনেও এসব স্বপ্ন বাস্তব হয়ে দেখা দেয় নি। তবুও বাঙালীর ছেলে স্বপ্ন দেখে ; স্বপ্ন দেখে হাসিতে গানে ভরে উঠবে তার জীবন। জীবন পথের চড়াই উত্‌রাই পার করতে সাহায্য করবে আদর্শবতী জীবন-সঙ্গিনী এবং আরো অনেক কিছু।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বাঙালী যুবকদের মত হয়ত আমিও এমনি স্বপ্ন দেখেছিলাম কোন দুর্বল মুহূর্তে। অতীতের ব্যর্থতার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিইনি, পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা আমাকে শাসন করতে পারে নি, সংযত করতে পারে নি।

তবে আমি আমার কল্পনার উড়োজাহাজ উড়িয়ে বেশিদূর উড়ে যাই নি। রিপন কলেজের এয়ারপোর্ট থেকে টেক্ অফ্ করার পরপরই ক্রাশ ল্যাণ্ড করে সম্বিত ফিরে পেয়েছিলাম।

একদিকে অর্থ চিন্তা ও অন্যদিকে ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি এমন প্রমত্ত থাকতাম যে আশপাশে কোন ভ্রমর আমার মধু খাবার জন্য উড়ছে কিনা, সে খেয়াল করার সুযোগ পেতাম না। জীবনটার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। আমার সীমিত জীবনের মধ্যে যে ক'টি নারী-পুরুষের আনাগোনা ছিল তাদের দিকে ফিরে তাকাবারও কোন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু কি আশ্চর্য, কিছুকাল পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম কে যেন আমার মনোবীণার তারে মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিচ্ছে। চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন একটু রঙীন মনে হলো। ক'দিন আগে পর্যন্ত যে আমার মুহূর্তের ফুরসত ছিল না নিজের দিকে তাকাবার, সেই আমি নিজের দিকে ফিরে তাকান শুরু করলাম। আরো একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি তৈরী করালাম। কায়দা করে ধুতি পরাও ধরলাম। পাড়ার সেলুনে চুল কাটা আর রুচিসম্মত মনে হলো না। পরের মাসে টিউশানির মাইনে পাবার পর একজোড়া হাল ফ্যাশানের কোলাপুরী চটিও কিনলাম।

এমনি আরো অনেক ছোটখাটো পরিবর্তন এলো আমার দৈনন্দিন জীবনে। আগে দুটো একটা বই আর খাতা নিয়ে কলেজে যেতাম। এখন বই হাতে করে কলেজে যেতে আত্মসম্মানে বাধতে লাগল। বই নেওয়া ত্যাগ করে শুধু খাতা হাতে করে কলেজ যাওয়ার নিয়মটা পাকাপাকি করে নিলাম। মোদ্দা কথা আমি এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত হলাম। বাসাংসি জীর্ণানি করে আমি এক নতুন আমি হলাম।

অদৃষ্ট নেহাতই ভাল। বেশিদূর এগুতে হলো না। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। আজ আত্মজীবনীর সেই রঙীন দিনগুলোর

কথা মনে হলে হাসি পায়। সেদিন কিন্তু হাসি পায় নি। মরীচিকাকেই সেদিন জীবনের চরম সত্য বলে মনে করে ছুটেছিলাম। ঘটনাটা নেহাতই সামান্য।

বারাকপুর-টিটাগড় বা খিদিরপুরের বড় বড় কলকারখানার মত তখন আমাদের কলেজও তিন শিফ্‌ট্‌'এ হতো। সকালে মেয়েদের, দুপুরে ছেলেদের, রাত্রিতে প্রৌঢ়দের ক্লাশ হতো। বেথুন বা লেডী ব্রাবোর্নের ছাত্রীদের মধ্যে যুবতী কুমারীদের মেজরিটি থাকলেও আমাদের কলেজের মর্নিং সেক্‌সনের চেহারা ছিল আলাদা। নীলিমা সরকারের মত সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। দেশটা স্বাধীন হবার পর অনেকের সংসারেই আগুন লাগল। এক টুকরো বস্ত্র আর এক মুষ্টি অন্নের জন্য, রুগ্ন শিশুর একটু পথ্যের জন্য, জীবনধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দাবী মেটাবার জন্য বাংলা দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ বধূদের ডালহৌসী স্কোয়ারের রঙ্গমঞ্চে নামতে হলো। তাইতো এই ডালহৌসী রঙ্গমঞ্চে আসবার পাশপোর্ট যোগাড় করার জন্য অনেক বৌদি আর ছোট মাসিমারাই আবার কলেজে পড়া শুরু করলেন। তাছাড়া আর একদল মেয়েরা নতুন করে উচ্চ শিক্ষা নিতে সে সময় শুরু করলেন। দেশটা স্বাধীন হবার পর অনেক অন্ধকার ঘরেই হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের কলেজের বীণামাসির মত যাঁরা কোন অন্যায় না করেও স্বামী ও শ্বশুর-বাড়ির অকথ্য অত্যাচার দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সহ্য করেছেন, যাঁরা বিবাহিতা হয়েও স্ত্রীর মর্যাদা পাননি, স্বামীর ভালবাসা পাননি, সন্তানের জননী হয়েও যাঁরা মা হবার গৌরব থেকে বঞ্চিতা হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই বন্দীশালার অন্ধকূপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। অজানা, অজ্ঞাত, ভবিষ্যতের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য এঁদের অনেকেই আবার কলেজে ভর্তি হলেন। আমাদের কলেজেও অনেকে ভর্তি হয়েছিলেন।

দিনের বেলায় হাফ্ আদর্শবাদী, হাফ্ ভাবুক, হাফ্ পলিটিসিয়ান, হাফ্ অভিনেতা, হাফ্ গায়ক, হাফ্ খেলোয়াড়দেরই সংখ্যা ছিল বেশী। সন্ধ্যার পর যাঁরা আসতেন তাঁদের অধিকাংশই ডালহৌসী-ক্যানিং স্ট্রীট-ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে কলেজে আসতেন।

সওয়া দশটায় মেয়েদের ক্লাশ শেষ হতো আর ছেলেদের ক্লাশ শুরু হতো। আমার ক্লাশ কোনদিন সওয়া দশটায়, কোনদিন এগারটায় শুরু হতো। সওয়া দশটায় ক্লাশ থাকলে ছেলেরা কোনদিন লেট করত না। বরং দশটা বাজতে বাজতেই কমনরুম ছেড়ে দোতালা-তিনতলার দিকে পা বাড়াত। সওয়া দশটার সন্ধিলগ্নের প্রতি অন্যান্য ছাত্রদের মত আমারও আকর্ষণ ছিল কিন্তু সকালবেলায় দু'দুটো টিউশানি করে কলেজে আসতে আসতে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে যেত। তাইতো সওয়া দশটার ক্ষণিক বসন্তের হাওয়া আমার উপভোগ করার সুযোগ নিয়মিত হতো না।

বীণামাসির সঙ্গে প্রায়ই পূরবী সিনেমার কাছাকাছি দেখা হতো। বীণামাসি বিবাহিতা যুবতী কিন্তু সিঁদুর পরত না। বীণামাসি বলত, বিয়ে করেও যখন স্বামীকে পেলাম না, শ্বশুরবাড়িতেও স্থান পেলাম না, তখন সিঁদুর পরব কার জন্য? কিসের জন্য? ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দু'চার মিনিট কথাবার্তা বলতাম। কলেজের ছোকরা অধ্যাপক ও ছাত্রদের কেউ কেউ পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু সরস দৃষ্টি দিয়ে চাইতেন। বীণামাসি ও আমি দুজনেই তা লক্ষ্য করতাম কিন্তু গ্রাহ্য করতাম না।

পর পর ক'দিন বীণামাসির সঙ্গে দেখা হলো না। প্রথম ক'দিন বিশেষ কিছু ভাবিনি। পুরো একটা সপ্তাহ দেখা না হবার পর একটু চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। অথচ বীণামাসিদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ করব সে সময়ও হয় না। কলেজ শেষ হতে না হতেই আবার টিউশানি করতে ছুটতে হয়।

সেদিনও কলেজে আসবার পথে বীণামাসির দেখা পেলাম না। কিন্তু ঐ পূরবী সিনেমার কাছাকাছিই হঠাৎ একটা জীবন্ত বারুদের স্তূপ আমার সামনে থমকে দাঁড়াল। বললো, শুনুন। বীণাদির খুব অসুখ। আপনাকে যেতে বলেছেন।

সকাল সাড়ে দশটার সময় হ্যারিসন রোডের পর পূরবী সিনেমার পাশে এমনভাবে একজন সুন্দরী আমাকে বীণামাসির সমন জারী করবে, কল্পনাও করতে পারিনি। মুহূর্তের জন্য ভড়কে চমকে গিয়েছিলাম। একটু সামলে নেবার পর অনেক প্রশ্ন মনে এসেছিল কিন্তু গলা দিয়ে সেসব প্রশ্ন বেরুতে সাহস পায় নি। শুধু বলেছিলাম, আপনি জানলেন কি করে ?

—আমি বীণাদির বাড়ি গিয়েছিলাম।

সেই দিনই বিকেলবেলা বীণামাসিকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমি যেতেই বীণামাসি আমাকে প্রশ্ন করল, 'নীলিমার কাছে খবর পেয়েছিস বুঝি ?'

আমি বললাম, 'কোন্ নীলিমা ?'

'ঐ যে আমাদের সঙ্গে পড়ে নীলিমা সরকার……'

'তা জানিনে, তবে আজ সকালেই পূরবীর কাছে একটা সুন্দর ধরনের মেয়ে……'

বীণামাসি আর এগুতে দিল না। বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ তো নীলিমা।'

আমি বললাম, 'তাই বুঝি ?'

বীণামাসির কাছে আমি আমার চিত্তচাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র আভাস দিলাম না। নিজেকে সংযত করে নিলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সেদিনের মত বিদায় নেবার আগে বীণামাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলেজ থেকে কেউ তোমাকে দেখতে আসেন না ?'

'হ্যাঁ, অনেকেই আসে।'

তিন-চারদিন পরে আবার বীণামাসিকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি সেদিনের সেই নীলিমা সরকারও বসে আছেন। নমস্কার বিনিময় করে আমি পাশের মোড়াটায় বসলাম। বীণামাসি চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বললো, 'জানিস নীলিমা, বাচ্চু আগে আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমাদের এই পাড়ায় থাকবার সময়ই ওর মা মারা যান......'

নীলিমা বললো, 'তাই নাকি ?'

আমি বললাম, 'আমার জীবন কাহিনী শোনার অনেক অবকাশ পাবেন, আজ থাক। যদি লিখতে পারত তবে বীণামাসি আমার জীবন নিয়ে একটা রামায়ণ লিখত। ভাগ্য ভাল বীণামাসির কলম চলে না, শুধু মুখ চলে। কিন্তু তার ঠেলাতেই আমি অস্থির।'

নীলিমার সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় হলো। দশ-বারো দিন পরে বীণামাসির ওখানেই আমাদের আবার দেখা। সেদিন দুজনেই একসঙ্গে বেরুলাম। তারপর কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত একসঙ্গে হেঁটে গিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেলাম।

ঐ সামান্য আলাপ-পরিচয়তেই আমি যেন কেমন পালটে গেলাম। সকালবেলার টিউশানিতে একটু একটু ফাঁকি দিয়ে ও স্নান-আহারের পর্ব কিঞ্চিৎ ত্বরান্বিত করে দৌড়ে দৌড়ে সওয়া দশটার আগেই কলেজে আসা শুরু করলাম। কোনদিন দেখা হয়, কোন-দিন হয় না; কোনদিন কথা হয়, কোনদিন হয় না। কোনদিন আবার দূর থেকে একটু তির্যক দৃষ্টি আর মুচকি হাসি-বিনিময়। তার বেশী আর কিছু নয় কিন্তু তবুও আমি কেমন স্বপ্নাতুর হয়ে পড়লাম। নীলিমাকে কো-পাইলট করে আমি আমার কল্পনার উড়ো-জাহাজ নিয়ে টেক অফ্ করলাম। ভাব-সমুদ্রে ভেসে বেড়ালাম।

ঐ শুধু একটু মুচকি হাসি ও ক্ষণিকের দৃষ্টি-বিনিময়কে মূলধন করে আমি অনেক, অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। টোপর মাথায়

দিয়ে নীলিমার গলায় মালা পরিয়েছিলাম, পাশে বসে বাসর জেগেছিলাম। বৌভাত-ফুলশয্যার দিন গভীর রাত্রে অতিথিদের বিদায় জানিয়ে আমি নীলিমার ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করলাম। নীলিমার পাশে বসে একটু আদর করলাম। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে সুইচটা অফ্ করতে গিয়েই দারুণ শক্ লাগল। আমার কল্পনার জাহাজ ক্রাশ ল্যাণ্ড করল। কো-পাইলট নীলিমাকে আর কোথাও খুঁজে পেলাম না।

সাহস করে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। মহা উৎকণ্ঠায় দিন কাটছিল। নীলিমা-বিহীন জীবন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল। বৈরাগ্যের ভাব মনের মধ্যে মাঝে মাঝেই উঁকি দিতে লাগল। আর কয়েক দিনের মধ্যে খবর না পেলে হয়ত কেদার-বদ্রীর পথেই পা বাড়াতাম। ভগবান করুণাময়। তাই সে যাত্রায় আর সংসার ত্যাগ করতে হলো না, নীলিমার দেখা পেয়ে গেলাম।

দেখা পেলাম বীণামাসির বাড়িতেই। নীলিমার কপালে অত বড় একটা সিঁদুরের টিপ দেখে বেশ আঘাত পেয়েছিলাম মনে মনে। প্রথমে ঠিক সহজ হয়ে কথাবার্তাও বলতে পারিনি। নীলিমা বোধহয় আমার মানসিক দ্বন্দ্বের ভাষা বুঝেছিল। তাই সে নিজেই বেশ সহজ সরল হয়েছিল আমার সঙ্গে।

জান দোলাবৌদি, নীলিমার বিয়ে হবার পরই আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব হলো। কোন কাজে-কর্মে সাউথে গেলেই কালীঘাটে নীলিমার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। নীলিমার স্বামী সন্তোষবাবু আজ আমার অন্যতম বিশেষ বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। ওরা এখন আমেদাবাদে আছেন। সন্তোষবাবু একটা বিরাট টেক্সটাইল মিলের চীফ্ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। এক গাদা টাকা মাইনে পান। নীলিমা আমেদাবাদ টেগোর সোসাইটির সেক্রেটারী। তোমার বোধহয় মনে আছে সেবার গোয়া অপারেশনস্ কভার করে দিল্লী ফেরার পথে দমন গিয়েছিলাম এবং আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। গত্যন্তর না পেয়ে

সন্তোষবাবুকেই একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাঠাই। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছুটে এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। দু-সপ্তাহ ওদের সেবা-যত্নে আমি সুস্থ হবার পর নীলিমা মেমসাহেবকে আমেদাবাদ আনিয়েছিল। দু'সপ্তাহ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কোন খবর না দেবার জন্য মেমসাহেব ভীষণ রেগে গিয়েছিল। আমি কিছু জবাব দিতে পারিনি। নীলিমা ওর দুটি হাত ধরে বলেছিল, 'তোমার সেবা পাবার মত অসুখ হলে নিশ্চয়ই খবর দিতাম। ডক্টর মৈত্রকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম! উনি বললেন, তাড়াহুড়ো করে ওকে আনাবার কোন কারণ দেখি না। একটু সুস্থ হলেই খবর দেবেন।'

একটু থেমে দু'হাত দিয়ে মেমসাহেবের মুখটি তুলে ধরে নীলিমা বলেছিল, 'তাছাড়া ভাই, আমি বা তোমার দাদাও বাচ্চুকে ভালবাসি। তোমার অভাব আমাদের দ্বারা না মিটলেও ওর সেবাযত্নের কোন ত্রুটি করিনি আমরা।'

মেমসাহেব তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে হাসিতে ভরিয়ে তুললো নিজের মুখটা। বললো, নীলিমাদি, আমি তো আপনাদের দুঃখ দিতে চাইনি। তবে আগে এলে হয়ত নিজে মনে মনে একটু শান্তি পেতাম, তাই আর কি...'

নীলিমা আর এগুতে দেয় নি। ঐ অধ্যায়ের ঐখানেই সমাপ্তি হলো।

তারপর আরো এক সপ্তাহ ছিলাম আমেদাবাদে। কাকারিয়ার লেকের ধারে রোজ বেড়িয়েছি আমরা। কত আনন্দ, কত হৈ-চৈ করেছি আমরা। যাকগে সেসব কথা।

নন্দিনী যখন আমার জীবনে উঁকি দিয়েছিল, তখন আমি চমকে গিয়েছিলাম। ভাবতে পারিনি, ভাববার সাহস হয় নি যে একটি মেয়ে আমার জীবনে আসতে পারে বা আমাকে কোন মেয়ে তার জীবনরথের সারথী করতে পারে। যেদিন নীলিমার দেখা পেলাম,

সেদিন কি করে এই সংশয়ের মেঘ কেটে গেল জানি না। তবে একথা সত্য যে রূপকথার রাজকুমারীর মত নীলিমার ছোঁয়ায় আমার ঘুম ভেঙেছিল, আমি কৈশোর থেকে সত্যি সত্যিই যৌবনের সিংহ-দ্বারে এসে উপস্থিত হলাম।

নীলিমার কথা আজ পর্যন্ত কাউকে জানাই নি। এসব জানাবার নয়। এ আমার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। এমন কি নীলিমাও জানে না, হয়ত ভবিষ্যতেও জানতে পারবে না।

তবে মেমসাহেবকে বলেছিলাম। মেমসাহেব কি বলেছিল জান? বলেছিল, 'সুন্দরী মেয়ে দেখলে যে তোমার মাথাটা ঘুরে যায়, তা আমি জানি। আমার মত কালো কুচ্ছিৎ মেয়েকে যে তোমার পছন্দ হয় না, সে কথাটা অত ঘুরিয়ে বলার কি দরকার?'

আমি শুধু বলেছিলাম:

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস—
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।
এ সংসারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের হাস্য-পরিহাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ।"

একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিলাম, 'তোমার পোড়া কপাল। কি করবে বল। যদি পার পালটে নেবার চেষ্টা কর।'

আলোচনা আর দীর্ঘ না করে মেমসাহেব মুচকি হেসে জিভ ভেংচি কেটে পালিয়ে যেত।

পাঁচ

আমি দিল্লী ফিরে এসেছি, কিন্তু ক'দিন এমন অপ্রত্যাশিত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটালাম যে, কিছুতেই তোমাকে চিঠি লেখার সময় পাইনি। তাছাড়া ইতিমধ্যে দু'দিনের জন্য তোমাদের বন্ধু মাধুরী চ্যাটার্জি আর তাঁর স্বামী এসেছিলেন। মাধুরীকে মনে পড়ছে তোমার ? প্রেসিডেন্সীতে ফিলসফি নিয়ে পড়ত। পার্ক-সার্কাস-বেগবাগানের মোড়ে থাকত।

দিল্লীতে আসার পর নিত্য-নৈমিত্তিক পরিচিত আধা-পরিচিত অনেকেই আসেন আমার আস্তানায়। কেউ ইণ্টারভিউ দিতে, কেউ অফিসের কাজে, কেউ বা আবার ডেরাডুন-মুসৌরী-হরিদ্বারের পথে লালকেল্লা-কুতুবমিনার আর রাজঘাট-শান্তিবন দেখার অভিপ্রায়ে। মাধুরী চালাক মেয়ে। হাজার হোক তোমাদেরই বন্ধু তো! স্বামী এসেছিলেন অফিসের কাজে; আর উনি এসেছিলেন স্বামীকে অনুপ্রেরণা দিতে। এখনও সেই আগের মতনই হৈ-হুল্লোড় করে। স্বামীকে সকাল বেলায় অফিসে রওনা করিয়ে দিয়ে সারা দিন নিজে হৈ-হৈ করে চক্কর কেটে বেড়াত আমার সঙ্গে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম কিন্তু মাধুরী হতো না। বিকেল বেলায় স্বামী এলে আমাদের সেকেণ্ড ইনিংস শুরু হতো।

যাই হোক বেশ কাটল দুটো দিন। মাধুরীর কাছে তোমার একটা শাড়ী আর পেটুক খোকনদার জন্য খানিকটা শোনহালুয়া পাঠিয়েছি। শাড়ীটা তোমার পছন্দ হলো কিনা জানিও।

এদিকে আমার মনের ওপর দিয়ে নীলিমার ঝড় বয়ে যাবার পর পরই হঠাৎ সাংবাদিকতা শুরু করলাম। আমার জীবনের সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট

হয়ে গেল। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়ে, আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ে। তারপর ইউনিভার্সিটির দেওয়া পাশপোর্ট নিয়ে চোদ্দ আনা ছেলে নেমে পড়ত জীবনযুদ্ধের পাওয়ার লীগ খেলতে। বাকি দু' আনা আরো এগিয়ে যেত। তাদের মধ্যে কেউ ফার্স্ট ডিভিশনে, কেউ আই-এফ-এ শীল্ডে বা রোভার্স খেলত। কেউ কেউ আবার আরো এগিয়ে যেত।

আমি পাওয়ার লীগে খেলবার জন্যই জন্মেছিলাম ও তারই প্রস্তুতি করছিলাম। মাঝে মাঝে অবশ্য স্বপ্ন দেখতাম ডাক্তার হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো। অথবা অধ্যাপক হয়ে কোঁচা দুলিয়ে কলেজে আসব, মেয়েদের পড়াব, ছেলেদের পড়াব। ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার জন্য মন আকুল ব্যাকুল হলেও আমি কিছুতেই তার প্রকাশ করব না। কিন্তু তবু ছাত্রীরা আমার কাছে ছুটে আসবে নানা কারণে, নানা প্রয়োজনে। ইলোরাদের বাড়ি একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করায় অনেক সরস কাহিনী ছড়াবে সমগ্র নারী-জগতের মধ্যে। তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি!

আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোনদিন খবরের কাগজে চাকরি করা তো দূরের কথা, খবরের কাগজের অফিসে পর্যন্ত যান নি। তাইতো কেউ কল্পনা করেন নি তাদের বংশের এই কুলাঙ্গার খবরের কাগজে চাকরি করবে। দেশটা দু'টুকরো হবার আগে আমাদের সমাজজীবন কয়েকটা পরিচিত ধারায় বয়ে গেছে। পরিচিত সীমানার বাইরে যাবার প্রয়োজন বা তাগিদ বিশেষ কেউই বোধ করেন নি। দেশটা স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই অতীত দিনের সে সব রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন প্রয়োজন কোথায় যেন তলিয়ে গেল। এই শান্ত-স্নিগ্ধ পৃথিবীটা যেন কোটি কোটি বছর পেছিয়ে অগ্নি-বলয়ে পরিণত হলো। জৈব প্রয়োজনটা চরম নগ্নভাবে প্রকাশ করল। ইতিহাসের বলি হয়ে মানুষগুলো

বাঁচবার প্রয়োজনে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াল চারদিকে। সেদিনের সে অগ্নি-বলয় পৃথিবীর যে যেখানে পারল আস্তানা করে নিল। লক্ষপতির ছেলে *কলেজ স্ট্রীটে হকার হলো, আমার-তোমার চাইতেও বনেদী ঘরের অনেক মেয়ে-বৌ বৌবাজার আর লিগুসে স্ট্রীটের ম্যাসেজ-বাথে গিয়ে দেহ বিক্রয় করতে বাধ্য হলো।

বৌবাজারের রথের মেলায় বা বিজয়া দশমীর দিন কুমুরটুলীর ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট বাচ্চাদের দেখেছ? দেখেছ কেমন হাউ হাউ করে কাঁদে? লক্ষ্য করেছ বাবা-মা'কে হারিয়ে অসহায় হয়ে, ব্যাকুল হয়ে অর্থহীন ভাষায় সবার দিকেই কেমন তাকায়? আমিও সেদিন এমনি করে অর্থহীন ভাষায় চারদিকে তাকাচ্ছিলাম একটু ভবিষ্যতের আশায়। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সহজ, কোন্‌টা কঠিন—তা ভাববার সময় বা ক্ষমতা কোনটাই সেদিন আমার ছিল না। তাইতো অপ্রত্যাশিতভাবে খবরের কাগজের রিপোর্টার হবার সুযোগ পেয়ে আমি আর দ্বিধা না করে এগিয়ে গেলাম।

রামায়ণে পড়েছি সতীত্বের প্রমাণ দেবার জন্য সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েও স্বামীর পাশে সীতার স্থান হয় নি। রাজরাজেশ্বরী সন্তানসম্ভবা সীতাকে প্রিয়হীন বন্ধুহীন নিঃস্ব হয়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জান দোলাবৌদি, আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় সীতার গর্ভেই বোধহয় বাঙালীর পূর্বপুরুষদের জন্ম। তা না হলে সমগ্র বাঙালী জাতটা এমন অভিশাপগ্রস্ত কেন হলো? স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চরম অগ্নি-পরীক্ষা দেবার পরও কেন তার রাহুমুক্তি হলো না? স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও কেন তাদের চোখের জল পড়া বন্ধ হলো না?

সত্যি দোলাবৌদি, সেদিনের কথা মনে হলে আজও শরীরটা শিউরে ওঠে, মাথাটা ঘুরে যায়, দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়। সেই দুর্দিনের

মধ্যেই আমি নতুন পথে যাত্রা শুরু করলাম। সকালবেলার টিউশানি দুটো ছাড়লাম না; কিন্তু বিকেলের ছাত্র পড়ান বন্ধ করলাম। দুপুরে কলেজ করে সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে বাজতেই নোট-বই পেন্সিল নিয়ে চলে যেতাম সভাসমিতি বা কোন প্রেস কনফারেন্সে। তারপর অফিস। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত রোজই কাজ করতে হতো। কোন কোনদিন আবার বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত তিনটে-চারটেও হয়ে যেত।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনি করে চালিয়েছি। বিনিময়ে কি পেয়েছি? প্রথম বছর একটি পয়সাও পাইনি। নিজের টিউশানির রোজগার দিয়ে ট্রাম-বাসের খরচ চালিয়েছি। পরের বছর থেকে মাসিক দশ-টাকা রোজগার শুরু করলাম। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান সাধনার প্রথম পর্ব শেষ করলাম। পিতৃদেব ফতোয়া জারী করলেন, সাংবাদিকতার খেলা শেষ করে একটা রাস্তা ধর। সত্যি তখন অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতি এমন সঙ্কটাপন্ন ছিল যে, কিছু একটা না করলে চলছিল না। আমার বন্ধু-বান্ধবরাও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হলো। সবাই উপলব্ধি করছিল কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে—তা কেউই জানত না। ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার মত রসদ কারুরই ছিল না। তাই ওদিকে আর কেউ পা বাড়াল না। আর্মি রিক্রুটিং অফিস থেকে শুরু করে খিদিরপুর বারাকপুরের সমস্ত কল-কারখানার দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ালাম একটা পঞ্চাশ টাকার অ্যাপ্রেনটিসশিপের জন্য। জুটল না। তাই এবার বিজ্ঞান সাধনায় ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যসাধনা আর সাংবাদিকতা নিয়েই পরবর্তী অধ্যায় শুরু করলাম।

তোমাকে এত কথা লিখতাম না। তাছাড়া হয়ত কিছু কিছু তুমি শুনেছ বা জেনেছ। কিন্তু এই জন্যই এসব জানাচ্ছি যে, আমার জীবনের কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মেমসাহেবকে

পেয়েছিলাম, তা না জানালে তুমি ঠিক গুরুত্বটা উপলব্ধি করবে না।

যৌবনে প্রায় সব ছেলেমেয়েই প্রেমে পড়ে। এটা তাদের ধর্ম, কর্ম। প্রয়োজনও বটে কিছুটা। তাছাড়া শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে পূর্ণতা লাভ করার এটা সব চাইতে বড় প্রমাণ। কলেজের কমনরুমে বা থিয়েটারের গ্রীনরুমে অনেক প্রেমের কাহিনীরই আদি-পর্ব রচিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মেয়াদ ক্ষণ-স্থায়ী। সামান্য একটু হাসি, সামান্য একটু গল্প, একটু মেলামেশার পর অনেক ছেলেমেয়েই প্রেমের নেশায় মশগুল হয়ে ওঠে। জীবনকে উপলব্ধি না করে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে যারা প্রেম করে বলে দাবী করে, তারা হয় বোকা, নয় মিথ্যাবাদী। দুটি মন, দুটি প্রাণ, দুটি ধারা, দুটি অপরিচিত মানুষ একই সঙ্গে কোরাস গাইবে অথচ তার পরিবেশ থাকবে না, প্রস্তুতি থাকবে না, তা হতে পারে না। এই পরিবেশ আর প্রস্তুতি থাকে না বলেই আমাদের দেশের কলেজ রেস্তোরাঁর প্রেম প্রায়ই ব্যর্থ হয়। দুধ জমিয়ে ভাল মিষ্টি দই খেতে হলে অনেক তদ্বির, তদারক ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। একটু হিসাব-নিকাশ বা তদ্বির-তদারকের গণ্ডগোলে হয় দই জমে না, অথবা জমলেও দইটা টক হয়ে যায়।

দুটি নারীপুরুষকে নিয়ে একটা সুন্দর ছন্দোবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে হলে শুধু চোখের নেশা আর দেহের ক্ষুধাই যথেষ্ট নয়। আরো অনেক কিছু চাই। তাছাড়া জীবনে এই পরম চাওয়া চাইবারও একটা সময় আছে। কিছু পেতে হলেও সে পাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হয়।

বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে অনেককেই অনেক সময় ভাল লাগে। হাসপাতালে হাসিখুশি ভরা নার্সদের কত আপন, কত প্রিয় মনে হয়। কিন্তু হাসপাতালের বাইরে? সমাজ-

জীবনের বৃহত্তর পরিবেশে? ক'জন পারে তাদের আপন জ্ঞানে সমাদর করতে?

আমার জীবনটা যদি সুন্দর, স্বাভাবিক ও ছন্দময় হয়ে এগিয়ে যেত তাহলে হয়ত যে কোন মেয়েকে দিয়েই আমার জীবনের প্রয়োজন মিটত। কিন্তু আমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছিলাম। একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে বাঁচবার জন্যে অসংখ্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরেও কোন ফল হয় নি। মাত্র একশ' পঁচিশ টাকার একটা সামান্য রিপোর্টারের চাকরির জন্য কতজনকে যে দিনের পর দিন তৈল-মর্দন করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। তবুও বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের যোগ্য বংশধরদের মন গলে নি।

কেন, আত্মীয়-বন্ধুর দল? পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারের সঙ্গে আবার আত্মীয়তা কিসের? নিতান্ত দু'চারজন মূর্খ বন্ধু ছাড়া আর সবার কাছেই আমি অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম।

দোলাবৌদি, আমার সে চরম দুর্দিনের ইতিহাস তোমাকে আর বেশী লিখব না। তুমি দুঃখ পাবে। তবে জেনে রাখ তোমাদের ঐ কলকাতার রাজপথে আমি দীর্ঘদিন ধরে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছি, একটি পয়সার অভাবে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে পর্যন্ত চড়তে পারিনি। দু'চারজন নিকট আত্মীয়ের প্রতি কর্তব্য পালন করে বহুদিন নিজের অদৃষ্টে দু'বেলা অন্ন জোটাতেও পারিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য! বিধাতাপুরুষ যত নিষ্ঠুর হয়েছেন আমার প্রতিজ্ঞাও তত প্রবল হয়েছে। বিধাতার কাছে কিছুতেই হার মানতে চায় নি আমার মন।

এমনি করে বিধাতাপুরুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে প্রায় সাত-আট বছর কেটে গেল। তবুও কোন কূল-কিনারা নজরে পড়ল না। এই সাত-আট বছরে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। সাত-আট বছর আগে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য আমি কর্মজীবন শুরু করেছিলাম, কিন্তু সাত-আট বছর পরে আমি

শুধু বাঁচতে চাইনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের অরণ্যের মধ্যে আমি হারিয়ে যেতে চাইনি। চাইনি শুধু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করতে। মনে মনে আরো কিছু আশা করছিলাম।

কিন্তু আশা করলেই তো আর সবকিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া শুধু আশা করে আর কতদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করা যায়? আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। মনের শক্তি, দেহের তেজ যেন আস্তে আস্তে হারাতে শুরু করলাম। হাজার হোক ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে।

কাজকর্মে ফাঁকি দিতে শুরু করলাম। ঘুরে-ফিরে নিত্য-নতুন খবর যোগাড় করার চাইতে নিউজ ডিপার্টমেণ্টে সাব-এডিটরদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াই আমার কাছে বেশী আর্কষণীয় হলো। শুধু আমাদের অফিসে নয়, আরো অনেক আড্ডাখানায় যাতায়াত শুরু করলাম। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেমন যেন দার্শনিকসুলভ ঔদাসীন্য দেখা দিল। মোদ্দা-কথায় আমি বেশ পাল্টাতে শুরু করলাম।

বেশীদিন নয়, আর কিছুকাল এমনি করে চললে আমি নিশ্চয়ই চিরকালের মত চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতাম। ঠিক এমনি এক চরম মুহূর্তে ঘটে গেল সেই অঘটন।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরছিলাম কলকাতা। বোলপুর স্টেশনে দানাপুর প্যাসেঞ্জারে আমার কামরায় আরো অনেকে উঠলেন। ভিড়ের মধ্যে কোনমতে এক পাশে জায়গা করে আমি বসে পড়লাম। জানলার পাশে মাথাটা রেখে আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ কি যে দেখছিলাম। দু'চারটে স্টেশনও পার হয়ে গেল। বীরভূমের লালমাটি আর তালগাছ কখন যে পিছনে ফেলে এসেছি, তাও খেয়াল করলাম না। বাইরে অন্ধকার নেমে এলো। উদাস দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে কামরার মধ্যে নিয়ে এলাম। ভাবছিলাম

কামরাটাকে একটু ভাল করে দেখে নেব। কিন্তু পারলাম না। দৃষ্টিটা সামনের দিকে এগুতে গিয়েই আটকে পড়ল। এমন বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল গভীর ঘনকালো টানা-টানা দুটি চোখ আগে কখনও দেখিনি। একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার দেখলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে আবার দেখলাম। আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখলাম। অসভ্যের মত, হ্যাংলার মত আমি শুধু ঐ দিকেই চেয়ে রইলাম।

আমি যদি খোকনদার মত সাহিত্যের ভাল ছাত্র হতাম ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়া থাকত, তাহলে হয়ত কালিদাসের মেঘদূতের উত্তরমেঘ থেকে 'কোট' করে বলতাম—'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।' কালিদাসের মত আমি আর এগিয়ে যেতে পারিনি। এইখানেই আটকে গেলাম। তাছাড়া দানাপুর প্যাসেঞ্জারের ঐ কামরায় অতগুলো প্যাসেনঞ্জারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এর চাইতে বেশী কি এগুতে পারা যায়?

পরে অবশ্য মেমসাহেবকে আমি আমার সেদিনের মনের ইচ্ছার কথা বলেছিলাম। ক'মাস পর আমি আর মেমসাহেব দানাপুর প্যাসেঞ্জারেই শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরছিলাম। বর্ধমানে এসে কামরাটা প্রায় খালি হয়ে গেল। ও পাশের বেঞ্চিতে শুধু এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না। মেমসাহেব আমার হাতের 'পর মুখটা রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। আমিও যেন কি ভাবছিলাম। হঠাৎ মেমসাহেব আমাকে একটু নাড়া দিয়ে বলল, শোন।

আমি ঠিক খেয়াল করিনি। মেমসাহেব আবার আমাকে ডাক দিল, শোন না।

'কিছু বলছ?'

মেমসাহেব হাত দিয়ে আমার মুখটাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। আঙুল দিয়ে আমার কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে

দিল। দু'চার মিনিট শুধু চেয়ে রইল আমার দিকে। একটু হাসল। সলজ্জ দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে।

এবার আমি ওর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কিছু বলবে ?

আমার দিকে তাকাতে পারল না। ট্রেনের কামরার ঐ স্বল্প আলোয় ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হলো যেন লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে গেছে। দেখতে বেশ লাগছিল। দু'চার মিনিট আমি ওকে প্রাণভরে দেখে নিলাম। তারপর কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, লজ্জা করছে ?

মেমসাহেব জবাব দিল না। শুধু হাসল। একটু পরে আমার কানে কানে বলল, একটা কথা বলবে ?

'বল।'

'প্রথম যেদিন তুমি আমাকে এমনি ট্রেনে যাবার সময় দেখেছিলে, সেদিন আমাকে তোমার ভাল লেগেছিল ?'

'মনে হয়েছিল—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পকবিম্বাধরোষ্ঠী,
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং,
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥'

মেমসাহেব ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মেরে বলল, অসভ্য কোথাকার!

'ছি, ছি, মেমসাহেব, তুমি আমাকে অসভ্য বললে। অসভ্য বলতে হলে কালিদাসকে অসভ্য বলো।'

আমি একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি রামায়ণ পড়েছ ?

'কেন ? এবার বুঝি রামায়ণের একটা কোটেশন শোনাবে ?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

'পড়েছি।'

'মূল রামায়ণ বা তার অনুবাদ পড়েছ?'

'মূল সংস্কৃত রামায়ণ পড়িনি, কিন্তু অনুবাদ পড়েছি।'

'ভেরী গুড! দণ্ডকারণ্যে সীতাকে প্রথম দেখার পর রাবণ কি বলেছিলেন জান?'

'সীতার রূপের তারিফ করেছিলেন, কিন্তু ঠিক কি বলেছিলেন, তা মনে নেই।'

'বেশ তো আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। রাবণ সীতাকে বলেছিলেন—'

মেমসাহেব বাধা দিয়ে বললো, 'তোমার আর শোনাতে হবে না। ঠিক লাইনগুলো মনে না থাকলেও আমি জানি রাবণ কি ধরনের সংঘাতিক বর্ণনা করেছিলেন।'

একটু থেমে দৃষ্টিটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আমার মুখের কাছে মুখটা এনে বলল, তুমিও তো আর এক রাবণ। ডাকাত কোথাকার! দিনে দুপুরে কলকাতা শহরের মধ্যে আমাকে চুরি করলে।

যাকগে সেসব কথা। সেদিন শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছিলাম। চুরি করে দেখতে দেখতে একবার ধরা পড়লাম। চোখে চোখ পড়তেই আমি দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু মিনিটখানেক পরেই আবার চেয়েছি। আবার ধরা পড়েছি। আবার চেয়েছি, আবার ধরা পড়েছি।

মেমসাহেবের আর দুটি বন্ধু কিছু ধরতে না পারলেও হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর কামরা থেকে বেরুবার সময় আমার মনটা যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা ও বেশ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কি করা যাবে? দুজনের কেউই কিছু বলতে পারিনি। জীবনের বর্ষণমুখর পথ চলতে গিয়ে এমনি একটু-আধটু বিদ্যুতের চমকানি তো সবার জীবনেই দেখা দিতে পারে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই।

ওরা তিন বন্ধু কামরা থেকে নামবার বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি নামলাম। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিলাম গেটের দিকে। আরেকবার তাকিয়ে নিলাম ওর দিকে। মনে মনে ভাবছিলাম, এইত এক্ষুনি গেট পার হলেই দুজনে হারিয়ে যাব কলকাতা শহরের জনারণ্যের মধ্যে। আর হয়ত জীবনেও কোনদিন দেখা হবে না। হয়ত কেন? নিশ্চয়ই কোনদিন দেখা হবে না। হঠাৎ গেটের দিকে তাকাতে নজর পড়ল, মেমসাহেব একবার মুহূর্তের জন্য থম্‌কে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। আমি দূর থেকে হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানালাম।

কেউ বুঝল না, কেউ জানল না, কি ঘটে গেল। এমন কি আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি কি হয়ে গেল। আমি তো এর আগে কোনদিন কোন মেয়ের দিকে অমন করে দেখিনি, কোন মেয়েও তো অমন করে আমাকে মাতাল করে তোলে নি। কেন এমন হলো? শুধু বুঝেছিলাম, বিধাতাপুরুষের নিশ্চয়ই কোন ইঙ্গিত আছে। আর মনে মনে জেনেছিলাম, দেখা আমাদের হবেই।

বিশ্বাস কর দোলাবৌদি, শুধু আমার চোখের নেশা নয়, শুধু মেমসাহেবের দেহের আকর্ষণও নয়, আরো কি যেন একটা অশ্চর্য টান অনুভব করেছিলাম মনের মধ্যে। মনে মনে বেশ উপলব্ধি করলাম যে, আমার জীবনযুদ্ধের নতুন সেনাপতি হাজির! এই নতুন সেনাপতি আমাকে সহজে পরাজয় বরণ করতে দেবে না, আমাকে পিছিয়ে যেতে দেবে না। আমাকে হারিয়ে যেতে দেবে না ভবিষ্যতের অন্ধকারে।

অদৃষ্ট যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, কি অশ্চর্যভাবে দুটি অপরিচিত মানুষকে নিবিড় করে এক সূত্রে বেঁধে দেয়, তা ভাবলে চমকে উঠি।

পরের দিন বেশ দেরি করে অফিসে গেলাম। চীফ্‌ রিপোর্টার আশা করেন নি আমি অফিসে আসব। তাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের

মিটিং আর গোটা তিনেক প্রেস কনফারেন্স কভার করার ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন। তবুও আমি যেতেই উনি লাফিয়ে উঠলেন দেখে আশ্চর্য হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ?

'তুমি দৌড়ে একবার পার্ক স্ট্রীট আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রীতে গিয়ে যামিনী রায়ের একজিবিশনটা দেখে এসো। আজই শেষ দিন। ওর একটা রিভিউ না বেরুলে দোতলায় উঠতে পারছি না।'

বুঝলাম উপরওয়ালারা বার বার বলা সত্ত্বেও একজিবিশনটার রিভিউ ছাপা হয় নি এবং এডিটর সাহেব বেশ অসন্তুষ্ট।

কলকাতার অন্যান্য রিপোর্টারদের মত আমিও নৃত্য-গীত বা শিল্পকলা বুঝতাম না, কিন্তু প্রয়োজনবোধে কলমের পর কলম রিপোর্ট লিখতে পারতাম ওসব নিয়ে। কেন তানসেন-সদারঙও তো কভার করেছি। বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব গাইবার আগে স্টেজের পাশে ব্ল্যাকবোর্ডে 'রাগ' ইত্যাদি লিখে দিত। আমার মত সঙ্গীতবিশারদ রিপোর্টারের দল সেই ফর্মুলা ভাঙিয়েই বেশ এক প্যারা লিখে দিতাম। শেষে আবার বাহাদুরী করে হয়ত মন্তব্য লিখতাম, গতবারের চাইতেও এবারের খাঁ সাহেবের গান অনেক বেশী মেজাজী হয়েছিল। অথবা লিখেছি, রাগ রাগেশ্বরীতে সেতার বাজিয়ে মুগ্ধ করলেন রবিশঙ্কর। অনেক ভিন্নমত পোষণ করলেও আমার মনে হয় রাগ রাগেশ্বরীতেই রবিশঙ্কর তাঁর শিল্পীসত্তাকে সব চাইতে বেশী প্রকাশ করতে পারেন।

কেন মহাজাতি সদনের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে ? রোজ অন্তত এক কলম লিখতেই হতো। লিখেছি, আজকের অধিবেশনের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন দ্বিজেন মুখার্জি। বিশেষ করে তাঁর শেষ গানখানি 'ভরা থাক ভরা থাক স্মৃতি-সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি' বহুদিন ভুলতে পারব না। গত বছরের সম্মেলনে এই গানখানিই আর একজন খ্যাতনামা শিল্পী গেয়েছিলেন। ভালই গেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও যেন এত ভাল লাগে নি। বোধ করি

দরদের অভাব ছিল। তাছাড়া কিছু কিছু গান আছে যা বিশেষ বিশেষ শিল্পীর কাছেই ভাল লাগে। ‘চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে’ অনেকেই গাইতে পারেন, কিন্তু পঙ্কজ মল্লিকের মত কি আর কেউ গাইতে পারবেন ? কেন সায়গলের গাওয়া ‘আমি তোমায় যত’ বা কানন দেবীর ‘সেদিন ছজনে ছলেছিন্থ বনে’ ?...

এমনি করে কিছুটা কমনসেন্স আর কলমের জোরে রিপোর্টারের দল বেশ কাজ চালিয়ে যান। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা অনেকটা মফঃস্বলের ডাক্তারবাবুদের মত। কিছুতেই বিশেষজ্ঞ নন, অথচ সব কিছু রোগেরই চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনবোধে ছুরি-কাঁচি নিয়ে একটা ছেঁড়া অ্যাপ্রন গায় চাপিয়ে পঞ্চানন চাটুজ্যে বা মুরারী মুখার্জির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও দ্বিধা করেন না।

সুতরাং আমিও দ্বিধা না করে চলে গেলাম যামিনী রায়ের একজিবিশন রিভিউ করতে।

একেই একজিবিশনের শেষ দিন, তারপর আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রির ছোট্ট ঘর। বেশ ভিড় হয়েছিল। তবুও আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে কিছু কিছু নোট নিচ্ছিলাম। একটা হলের দেখা শেষ করে পাশের হলটায় যাবার মুখে অকস্মাৎ দেখা পেলাম মেমসাহেবের। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কিন্তু হাজার হোক Truth is stranger than fiction. তাই না দোলাবৌদি ?

প্রায় ছজনেই একসঙ্গে বললাম, আরে আপনি ?

‘আপনি বুঝি যামিনী রায়ের ভক্ত ?’—আমাকে প্রশ্ন করে মেমসাহেব।

‘পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারী করি বলে এই আধ-ঘণ্টার জন্য ভক্ত হয়েছি।’

‘আপনি বুঝি রিপোর্টার ?’

‘নির্লজ্জ আর বেহায়াপনা দেখে এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ?’

‘ছি, ছি, ওকথা কেন বলছেন ?’ পাশের পেন্টিংটা এক

নজর দেখে মেমসাহেব মন্তব্য করল, রিপোর্টারদের তো ভারী মজা।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস…'

শেষ করতে হয় না। তার আগেই বলল, আপনি দেখছি রবীন্দ্রনাথেরও ভক্ত।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আর একটু পরে দেখবেন আমি আপনারও ভক্ত।'

লোকের ভিড়ের মধ্যে আর কথা হলো না। এই দু'এক মিনিটের মধ্যেই কিছু কিছু কলারসিক বেশ এক ঝলক আমাদের দেখে নিলেন।

পাশের হলটা চটপট ঘুরে দেখে নিয়ে আমরা দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

এখন রাত প্রায় দেড়টা বাজে। তাই আজ আর লিখছি না। কালকে সকাল সকাল উঠতে হবে। ন'টার সময় প্রাইম-মিনিস্টারের মান্থলি প্রেস কনফারেন্স। সুতরাং তুমি বেশ বুঝতে পারছ কাল সকালে আমার কি দুর্ভোগ আছে।

কাল তো তোমাদের দুজনেরই ছুটি। তোমরা নিশ্চয়ই এখনও ঘুমোওনি। বেশ কল্পনা করতে পারছি খোকনদা তোমার কোলের 'পর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে আর তুমি তোমার ঐ বিখ্যাত বেসুরো গলায় তাঁকে একটা পচা প্রেমের গান শোনাচ্ছ। তাই না?

ছয়

তুমি যেদিন প্রথম খোকনদার দেখা পেয়েছিলে, সেদিন খোকনদা তোমাকে কি বলে সম্বোধন করেছিল, কি ভাষায় কথা বলেছিল, কি সে বলেছিল, আমি সেসব কিছুই জানি না। সেদিন তুমি কিভাবে ওকে গ্রহণ করেছিলে, তাও জানি না। তবে বেশ কল্পনা করে নিতে পারি তুমিই আগে খোকনদার মাথাটা খেয়েছ। কিছু কবচ-মাতুলী ধারণ করেছিলে কিনা জানি না; তবে কিছু না কিছু একটা নিশ্চয়ই করেছিলে। নয়ত খোকনদার মত ছেলে…

তুমি রাগ করছ? রাগ করো না। তবে তোমাদের ব্যাপারটার ঐ রহস্যভরা আদি পর্বটা জানা থাকলে আমার অনেক সুবিধে হতো। তাইতো সেদিন আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি থেকে বেরুবার পর কি বলব, কি করব কোথায় যাব, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। পার্ক স্ট্রীট ছেড়ে চৌরঙ্গী ধরে এসপ্লানেডের দিকে এগুতে এগুতে শুধু বলেছিলাম, আমি জানতাম আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'আজই দেখা হবে, একথা জানতেন?'

'না, তা জানতাম না। তবে জানতাম দেখা হবেই।'

মেমসাহেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে ফিরে বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, কি করে জানতেন যে আমাদের দেখা হবেই?

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করি, আপনার বাবা কি লিগ্যাল প্রাকটিশনার?

'হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করছেন?' সন্দেহের রেখা ফুটে উঠল মেমসাহেবের কপালে।

'ভয় পাবেন না, আমি দস্যু মোহন বা ডিটেকটিভ কিরীটী রায় নই।'

কিড্ স্ট্রীট পার হলাম। বেশ বুঝতে পারলাম মেমসাহেবের মন থেকে সন্দেহের মেঘ কেটে যায় নি। তাইতো বললাম, আপনি যে ল' পড়েন নি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে যেভাবে জেরা করতে শুরু করেছিলেন, তাতেই মনে হলো, আপনি বোধহয় ল-ইয়ারের-মেয়ে।'

মেমসাহেব এবার হেসে ফেললো। বোধহয় মনটাও একটু হালকা হলো।

মিনিট কয়েক দুজনেই চুপচাপ। মিউজিয়াম পার হয়ে এলাম, ওয়াই-এম-সি-এ পিছনে ফেললাম। লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে এসে পড়লাম। আরো এগিয়ে গেলাম। ফিরপো পার হয়ে আর সোজা না গিয়ে রক্সীর দিকে ঘুরলাম। মৌনতা ভাঙলাম আমি, চা খাবেন?

'চা? বিশেষ খাই না, তবে চলুন খাওয়া যাক।'

পাশের রেস্তোরাঁর একটা কেবিনে বসলাম। বেয়ারা এলো। হাতের তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার টেবিলটা আর একবার মুছে দিল। নোংরা মেনু কার্ডটা আমার সামনে দিয়ে এক নজর দেখে নিল মেমসাহেবকে।

'দু'টো ফিস ফ্রাই, দু'টো চা।'

বেয়ারা বিদায় নিল। কিছু বলব বলব ভাবতেই ক' মিনিট কেটে গেল। ইতিমধ্যে বেয়ারা দুটো ফর্ক আর দুটো ছুরি এনে আমাদের দুজনের সামনে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল। আবার ভাবছি কিছু বলব। কিন্তু বলা হলো না। বেয়ারাটা আবার এলো। এক শিশি সস্ আর দু' গেলাস জল দিয়ে গেল। বুঝলাম

বেয়ারাটা বুঝেছে নতুন জুড়ী এবং সেজন্য ইন্‌স্টলমেণ্টে কাজ করছে। ফিস ফ্রাই'এর প্লেট দুটো নিয়ে বেয়ারাটা আসবার আগেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু ভাবছেন ?

আঁচলটা টেনে নিয়ে মেমসাহেব বলল, 'না, তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু না হলেও কিছু তো ভাবছেন ?'

ফিস ফ্রাই এসে গেল। আমি একটা টুকরো মুখে পুরলাম কিন্তু ফর্কটা হাতে নিয়ে মেমসাহেব কি যেন ভাবছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলবেন ?'

'একটা কথা বলবেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাদের দেখা হবে, একথা আপনি জানলেন কি করে ?'

'কি করে জানলাম তা জানি না, তবে মনের মধ্যে স্থির বিশ্বাস ছিল যে আপনার সঙ্গে দেখা হবেই।'

'শুধু মনের বিশ্বাস ?'

'হ্যাঁ।'

সেদিন একে প্রথম সাক্ষাৎকার তারপর ঐ ছোকরা বেয়ারাটার অতিরিক্ত কর্তব্যপরায়ণতার জন্য আর বিশেষ কথা হলো না। তবে ঐ কেবিন থেকে বেরুবার আগে আমার নোটবই-এর একটা পাতা ছিঁড়ে অফিসের টেলিফোন নম্বরটা লিখে দিলাম। শুধু বলেছিলাম, সম্ভব হলে টেলিফোন করবেন।

কিছুটা লজ্জায় আর কিছুটা ইচ্ছা করেই আমি ওর নাম-ধাম ঠিকানা কিছুই জানতে চাইলাম না। মনে মনে অনেক কিছু ইচ্ছা করছিল। ইচ্ছা করছিল বলি, 'তুম মুখাতিব ভী হো, করিব্ ভী হো, তুমকো দেখু, কী তুমসে বাত করু।'—তুমি আমার কাছে বসে আছ, কথা বলছ। তুমিই বল, তোমাকে দেখব, না তোমার সঙ্গে কথা বলব।

আবার ভাবছিলাম, না, না! তার চাইতে বরং প্রশ্ন করি,

আঁখো মে হি রহে হো, দিলসে নেহি গ্যায়ে হো, হয়রান হুঁ ঐ সখী আঁই তুমে কাঁহাসে?—সব সময় তুমি আমার চোখে, তুমি আমার হৃদয়ে রয়েছ। ভাবতে পারি না কি ভাবে তুমি আমার হৃদয়-মাঝে এমন ভাবে নিজের আসন বিছিয়ে নিলে।

সত্যি বলছি দোলাবৌদি, ওকে কাছে পেয়ে, পাশে দেখে বেশ অনুভব করছিলাম, এ তো সেই, যাঁর দেখা পাবার জন্য আমি এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছি, এত দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি। মনে মনে বেশ অনুভব করছিলাম এবার আমার দিন আগত ঐ।

আরো অনেক অনেক কিছু ভেবেছিলাম। সে সব কথা আজ আর লিখে এই চিঠি অযথা দীর্ঘ করব না। তবে শুধু জেনে রাখ, মেমসাহেব এক এবং অদ্বিতীয়া। এই পৃথিবীতে আরো অসংখ্য কোটি কোটি মেয়ে আছেন, তাঁদের প্রেম-ভালবাসায় কোটি কোটি পুরুষের জীবন ধন্য হয়েছে। তাঁদের স্পর্শে অনেকেরই ঘুম ভেঙেছে। আমি তাঁদের সবার উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি জানি আমার কালো মেমসাহেবের চাইতে অনেক মেয়েই সুন্দরী, অনেকেই ওর চাইতে অনেক বেশী শিক্ষিতা। তবে একথাও জানি আমার জন্য এই পৃথিবীতে একটিমাত্র মেয়েই এসেছে এবং সে আমার ঐ মেমসাহেব। মেমসাহেব ছাড়া আর কেউ পারত না আমাকে এমন করে গড়ে তুলতে। মাটি দিয়ে তো সব শিল্পীই পুতুল গড়ে। কিন্তু সব শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য কি সমান? মেমসাহেব আমার সেই অনন্যা জীবন-শিল্পী যে কাদা-মাটি দিয়ে আমার থেকে আজ একটা প্রাণবন্ত পুতুল গড়ে তুলেছে।

তুমি শুনলে অবাক হবে আমি সেদিন ওর বাসে পর্যন্ত ওঠার অপেক্ষা করলাম না। আমি আগেই একটা বাসে চড়ে অফিসে চলে এলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমি তো ওর জন্য অনেক ভেবেছি, ভাবছি। এবার না-হয় রেকর্ডের উল্টো দিকটা দেখা যাক। দেখা যাক না ও আমার জন্য ভাবে কিনা।

রাত্রে অফিসে ফিরেই দেখি বেশ চাঞ্চল্য। সন্ধ্যার পরই টেলিপ্রিন্টারে নিউজ এজেন্সীর খবর এসেছে পূর্ব-পাকিস্থানের বাগেরহাটে খুব গণ্ডগোল হয়েছে। কি ধরনের গণ্ডগোল হলো এবং কলকাতায় কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেই চিন্তায় সবাই উৎকণ্ঠিত। পরের দিন আমার ডিউটি পড়ল শিয়ালদহ স্টেশনে। পূর্ব-পাকিস্থানের ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করে সেখানকার পরিস্থিতি জানতে হবে। রিপোর্ট করতে হবে। পরের দিন খুলনার ট্রেনটি এসেছিল, তবে অনেক দেরি করে। প্ল্যাটফর্ম থেকে আজে-বাজে লোক আগে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিছু সরকারী কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। বাগেরহাটের পরিস্থিতি জানবার পর ওরা সবাই আগত যাত্রীদের হুঁশিয়ার করে দিলেন, অযথা বা মিথ্যা গুজব ছড়াবেন না।

যাত্রীদের কথাবার্তা শুনে বেশ বুঝতে পারলাম অবস্থা বেশ গুরুতর। কোথা থেকে কিভাবে যে গণ্ডগোল হলো, সেকথা কেউ বলতে পারলেন না। তবে যাত্রাপুরের এক ভদ্রলোক জানালেন যে, বাগেরহাটের এক জনসভায় পশ্চিম-পাকিস্থানের এক নেতা বক্তৃতা দেবার পরই ওখানে প্রথমে কিছু লুটপাট শুরু হয়। দু-তিন দিন পরে ছুরির খেলা শুরু হলো। গুণ্ডাদের হাতে প্রথম দিনেই প্রাণ দিলেন লুৎফর রহমন।

শিয়ালদহ স্টেশনের বুকিং অফিসের সামনে দুটো ট্রাঙ্কের 'পর বসে আমরা দুজনে কথা বলছিলাম। কথা বলছিলাম নয়, কথা শুনছিলাম। ভদ্রলোক আগে একটা ছোট্ট স্কুলে মাস্টারী করতেন। অনেকদিন মাস্টারী করেছেন ঐ একই স্কুলে। বাগেরহাটের সবাই ওঁকে চিনতেন, ভালবাসতেন। অধিকাংশ ছাত্রই মুসলমান ছিল কিন্তু তা হোক। ওরাও ওকে বেশ শ্রদ্ধা করত। লুৎফর সাহেব যখন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন, তখন স্কুলবাড়ি দোতলা হলো, ছেলেদের ভলিবল খেলার ব্যবস্থা হলো, দশ-পনের টাকা করে

মাস্টার মশাইদের মাইনেও বাড়ল। কি জানি কি কারণে পরের বছর সরকার স্কুল-কমিটি বাতিল করে দিলেন। ক' মাস পরে স্কুলের তহবিল তছরূপের অভিযোগে লুৎফর সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু কোর্টে সেসব কিছুই প্রমাণিত হলো না।

ইতিমধ্যে স্কুলের নতুন কর্তৃপক্ষ ভদ্রলোকের চাকরি খতম করে দিলেন অযোগ্যতার অভিযোগে। অনন্যোপায় হয়ে একটা দোকান খুললেন। প্রথম প্রথম বিশ্রী লাগত দোকানদারী করতে। কিন্তু কি করবেন? পরে অবশ্য মন লেগেছিল ব্যবসায়ে। ব্যবসাটাও বেশ জমে উঠেছিল। পোড়া কপালে তাও টিকল না। এবারের গণ্ডগোলে দোকানটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এসব কাহিনী আমার না জানলেও চলত, কিন্তু কি করব। আর এমন কোন যাত্রী পেলাম না যার কথায় ভরসা করে রিপোর্ট লেখা যায়। তাই চুপচাপ বসে শুনছিলাম। তবে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এত কথা শোনার পুরস্কার পেলাম পরে।

লুৎফর সাহেব ছাত্রজীবনে ছাত্র-কংগ্রেসে ছিলেন। পরে ওকালতি করার সময় রাজনীতি প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্থানের রাজনৈতিক আবহাওয়া জটিল হবার সঙ্গে সঙ্গে লুৎফর সাহেব আবার রাজনীতি শুরু করলেন। সারা খুলনা জেলা লুৎফর সাহেবের কথায় উঠত, বসত। সারা জেলার মধ্যে কোন অন্যায় অবিচারের কথা শুনলেই গর্জে উঠেছেন। খুলনা ডকের কয়েক হাজার বাঙালী মুসলমান শ্রমিক অনেক দিনের অনেক অত্যাচার আর অপমানের বিরুদ্ধে প্রথম গর্জে উঠেছিল লুৎফর সাহেবেরই নেতৃত্বে।

পূর্ব-পাকিস্থানের মসনদ থেকে ফজলুল হক সাহেবকে অপসারিত করে ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব বাংলাকে শায়েস্তা করবার জন্য ঢাকায় আসার কিছুকালের মধ্যেই লুৎফর সাহেবকে ডেকে পাঠান লুৎফর সাহেব লাটসাহেবের নেমন্তন্ন খেতে ঢাকা গিয়েছিলেন.

তবে একবেলা বুড়ীগঙ্গার ইলিশ খাইয়েই সে নেমন্তন্ন খাওয়া শেষ হয় নি। ছুটি বছর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বিশ্রাম নেবার পর লুৎফর সাহেব খুলনা আসার অনুমতি পান।

খুলনা ফেরার পর লুৎফর সাহেব আরো বেশী রুখে দাঁড়ালেন।

আমার অফিসে ফিরে রিপোর্ট লিখতে হবে। এত দীর্ঘ কাহিনী শোনার অবসর ছিল না। তাই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, লুৎফর সাহেব আজকাল কি করেন?

—লুৎফর সাহেব আর নেই। এই দাঙ্গায় বাগেরহাটের প্রথম বলি হলেন লুৎফর।

'সে কি বলছেন?'

'আমাদেরও তো ঐ একই প্রশ্ন।'

'তবুও কি মনে হয়?'

'বাগেরহাটের লাহোর কটন মিলে অনেকদিন ধরেই শ্রমিক ধর্মঘট চলছে। লুৎফর সাহেব ওদের লীডার। কিছুদিন ধরেই আমরা শুনছিলাম লুৎফর সাহেবকে শায়েস্তা করার জন্য শহরে নাকি বাইরের অনেক গুণ্ডা এসেছে। আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি; কারণ—বাগেরহাট শহরে লুৎফর সাহেবের গায় হাত দেবার সাহস স্বয়ং ইস্কান্দার মির্জারও হয় নি। কিন্তু এরই মধ্যে সর্বনাশা দাঙ্গা শুরু হলো বুধবার সন্ধ্যার দিকে। পরের দিন বাড়ির থেকে বাইরে যাইনি। শুক্রবার সকালে দোকানটা দেখতে গিয়ে শুনি লুৎফর সাহেব শেষ।'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম লুৎফর সাহেবকে সরাবার জন্যই লাহোর কটন মিলের মালিকদের চক্রান্তে বাগেরহাটে গণ্ডগোল বাধানো হয়েছে। কেননা, শহরের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে লুৎফর সাহেবকে শেষ করা যেত না।

অফিসে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হলো। বেশ ক্লান্ত বোধ

করছিলাম। তবুও চটপট করে 'বাগেরহাটে'র দাঙ্গার নেপথ্য কাহিনী' লিখে ফেললাম।

তাই সারাদিন মেমসাহেবের কথা ভাববার ঠিক সময় পেলাম না।

পরের দিন আমার উইকলি অফ ছিল। অফিসে গেলাম না। তার পরের দিন আমার টেলিফোন ডিউটি ছিল। তাই একটু দেরি করেই অফিসে গেলাম।

এখনকার মত তখন ডায়াল ঘুরালেই নম্বর পাওয়া যেত না। অপারেটরের ওপর নির্ভর করতে হতো। খবরের কাগজের রিপোর্টারের নাইট-টেলিফোন ডিউটি একটা বিচিত্র ব্যাপার। পুলিস, হাসপাতাল, এ্যাম্বুলেন্স, ডক, রেল-পুলিস, রেল স্টেশন, দমদম এয়ারপোর্ট ইত্যাদি জায়গার থেকে দৈনন্দিন টুকটাক 'লোক্যাল' নিউজ পাবার জন্যে প্রায় শতখানেক টেলিফোন করতে হতো। আমাদের কাগজের পাড়াতে এবং একই টেলিফোন এক্সচেঞ্জে আরো চার-পাঁচটি কাগজের অফিস ছিল। এক্সচেঞ্জের অপারেটররা প্রতি রাত্রে এই লাইন দিতে দিতে প্রায় রিপোর্টার হয়ে উঠেছিলেন। নাম্বার বলবার প্রয়োজনও হতো না; শুধু বললেই হতো, রিভার পুলিস দেবেন নাকি ?

উত্তর আসত, রিভার পুলিস এনগেজ। টাইমস অফ ইণ্ডিয়া কথা বলছে।

এখনকার মত তখন এয়ারপোর্ট রিপোর্টার বলে কিছু ছিল না। তাই সাধারণ ছোটখাটো খবরের জন্য এয়ারপোর্ট পুলিস-সিকিউরিটিতে রোজ রাত্তিরে ফোন করতে হতো। তাইতো রিভার পুলিস না পেয়ে বলতাম, এয়ারপোর্ট দিন।

অপারেটর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতেন, সিকিমের মহারাজার এ্যারাইভাল ছাড়া আজ আর কিছু নেই।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার হয়ত বলতেন, এবার নীলরতনের

সঙ্গে কথা বলুন। কি একটা সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্টের খবর আছে।

সব অপারেটরই যে এইরকম সাহায্য করতেন, তা নয়। তবে অধিকাংশ মেয়েই খুব সহযোগিতা করতেন। রাত্রে টেলিফোন ডিউটি করতে করতে বহু অপারেটরের সঙ্গে অনেক রিপোর্টারেরই বেশ মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নানা অবস্থায় রিপোর্টাররাও যেমন অপারেটরদের সাহায্য করতেন, তেমনি অপারেটররাও রিপোর্টারদের যথেষ্ট উপকার করতেন।

কোন কোনদিন খবরের চাপ বিশেষ না থাকলে অনেক সময় আমরা নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলতাম। এইরকম কথাবার্তা বলতে বলতেই আমরা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অনেক কাহিনী শুনেছিলাম। জানতে পেরেছিলাম অনেক অফিসারের 'আনটোল্ড স্টোরি'। কিছু কিছু কাগজে ছাপিয়ে ফাঁস করেও দেওয়া হয়েছিল। অপারেটরদের উপর অনেক অফিসারের খাম-খেয়ালিপনা বন্ধ হয়েছিল।

অপারেটররাও আমাদের কম উপকার করতেন না। কৈলাশনাথ কাটজু তখন পশ্চিম বাংলার গভর্নর আর ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী। কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে তীব্র মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে নানা মহলে গুজব শোনা গিয়েছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মত-বিরোধের সঠিক কারণগুলো কেউই জানতে পারছিলাম না। শেষে একদিন অকস্মাৎ এক টেলিফোন অপারেটর জানালেন, জানেন, আজ একটু আগে টেলিফোনে গভর্নরের সঙ্গে চীফ মিনিস্টারের খুব একচোট···

দুদিন বাদে এই ঝগড়ার কাহিনীই আমাদের কাগজের ব্যানার স্টোরি হলো। মোটা মোটা অক্ষরে চার-কলম সামারিতে লেখা হলো, রাজভবনের সহিত সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মহলের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে রাজ্য পরিচালনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাজ্যপালের সহিত মুখ্যমন্ত্রীর মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে।···

শুধু বাংলা দেশের জনসাধারণ বা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কিছু অফিসার নয়, স্বয়ং ডাঃ রায় ও কাটজু সাহেব পর্যন্ত চমকে গিয়েছিলেন এই খবরে। অনেক তদন্ত করেও ওঁরা জানতে পারেন নি কি করে এই চরম গোপনীয় খবর ফাঁস হয়ে গেল।

আমরা অফিসে বসে শুধু হেসেছিলাম। আর ভাবছিলাম ইচ্ছা করলে আরো কত কি আমরা ছাপতে পারতাম কিন্তু ছাপিনি।

এইরকম আরো অনেক চমকপ্রদ খবর পেতাম আমাদের অপারেটর বান্ধবীদের মারফত ও মাঝে মাঝেই বাজার গরম করে তোলা হতো। মন্ত্রী আর অফিসারের দল কানামাছি ভোঁ-ভোঁ করে মিছেই হাতড়ে বেড়াতেন, আর আমরা মুচকি হাসতে হাসতে ঐ মন্ত্রী ও অফিসারদের ঘরে বসে ওদের পয়সায় কফি খেয়ে বেড়াতাম।

সেদিন রাত্রে অফিসে এসে যথারীতি টেলিফোনটা তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, কে কথা বলছেন?

কণ্ঠস্বর অপরিচিত নয়। তাই উত্তর আসে, আমি গার্গী।

এক মুহূর্ত পরেই আমাকে প্রশ্ন করেন মিস গার্গী চক্রবর্তী, অনেকদিন পর আজ আপনার টেলিফোন ডিউটি পড়ল, তাই না?

উত্তর দিই, না অনেকদিন কোথায়···

গার্গী মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জানতে চায়, কাল আর পরশু আপনি অফিসে আসেন নি?

'কেন বলুন তো।'

'আগে বলুন কোথায় ছিলেন দু'দিন।'

'কোথায় আবার থাকব, কলকাতাতেই ছিলাম। তবে কালকে আমার অফ ছিল। আর পরশু অনেক রাত্রে অফিসে এসেছিলাম।'

'তাই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

গার্গী চক্রবর্তী টেলিফোন ছাড়ে না। ইনিয়ে-বিনিয়ে দু'চারটে আলতু-ফালতু কথার পর জিজ্ঞাসা করল, তারপর আপনি কেমন আছেন?

'হঠাৎ আজ পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারের এত খবর নিচ্ছেন, কি ব্যাপার?'

'যাস্ট এ মিনিট' বলে গার্গী অন্য কাউকে লাইন দিতে গেল। আমি টেলিফোন ধরে রইলাম। একটু পরেই ফিরে এলো আমার লাইনে। বলল, কাল-পরশু আপনার অনেক টেলিফোন এসেছিল।

আমি গার্গীকে দেখতে পাই না কিন্তু বেশ অনুভব করতে পারছিলাম ওর হাসিখুশী ভরা মুখখানা। আমি এবার একটু ঠাট্টা করে বললাম, 'আমি তো মিস গার্গী চক্রবর্তী নই যে আমার অনেক টেলিফোন আসবে।'

'তাই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

গলার স্বরে একটু অভিনবত্ব এনে গার্গী বলে, 'অনেকে না হোক একজনও তো অনেকবার টেলিফোন করতে পারে···যাস্ট এ মিনিট···'

গার্গী আবার লাইন দিতে চলে যায়।

আমি ভাবি কে আমাকে অনেকবার টেলিফোন করতে পারে। মেমসাহেব হয়ত একবার টেলিফোন করতে পারে কিন্তু অনেকবার কে করল?

গার্গী এবার ফিরে এসে বলল, সত্যি বলছি একজন আপনাকে অনেকবার···

'কিন্তু তাতে আপনাকে এত ইণ্টারেস্ট।'

'কিছুই না। তবে এতদিন আপনার এই ধরনের টেলিফোন আসত না বলেই আর কি···'

এবার আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল। তবে কি মেমসাহেবই ?

গার্গী বলল, ধরুন, আমি তাঁর সঙ্গে কানেকশন করে দিচ্ছি।

'আপনি বুঝি নাম্বারটাও জেনে নিয়েছেন ?'

ওদিক থেকে গার্গীর গলার স্বর শুনতে পেলাম না। একটু পরেই বলল, নিন, স্পীক হিয়ার।

আমি বেশ সংযত হয়ে শুধু সম্বোধন করলাম, নমস্কার।

'নমস্কার।'

'কি খবর বলুন ?'

'কি আর খবর! আপনারই তো দুদিন পাত্তা নেই।'

মেমসাহেব দুদিন ধরে আমাকে খোঁজ করেছে জেনে বেশ সুখী হলাম। তবুও ন্যাকামি করে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি টেলিফোন করেছিলেন ?

'কি আশ্চর্য! আপনাকে কেউ বলেন নি ?'

আমাদের অফিস আর হরি ঘোষের গোয়ালের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই সেকথা মেমসাহেবকে কি করে বোঝাই। তাই বললাম, খবরের কাগজের অফিসে এত টেলিফোন আসে যে কারুর পক্ষেই মনে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া রোজই তো ডিউটি বদলে যাচ্ছে।

মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কেন ঐ অপারেটর ভদ্রমহিলা আপনাকে বলেন নি ?'

গার্গী হঠাৎ আমাদের দুজনের লাইনে এসে বলে গেল, বলেছি।

মেমসাহেব চম্‌কে গেল। আমি কিন্তু জানতাম গার্গী আমাদের লাইন ছেড়ে পালাবার পাত্রী নয়।

মেমসাহেব ঘাবড়ে প্রশ্ন করল, কে উনি ?

'মিস গার্গী চক্রবর্তী।'

হাজার হোক মেয়ে তো! গার্গীর নাম শুনেই মেমসাহেবের মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। হয়ত বা ঈর্ষাও। তাই হেঁয়ালি করে

জানতে চায়, আপনার সঙ্গে বুঝি মিস চক্রবর্তীর বিশেষ পরিচয় আছে ?

আমি আপন মনেই একটু হেসে নিই। আর বলি, অধিকাংশ অপারেটরের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সব রিপোর্টারদেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে।

আমি আবার টিপ্পনী কেটে জিজ্ঞাসা করি, কোন ছোট প্রেমের গল্পের প্লট এলো নাকি আপনার মাথায় ?

বোধ করি মেমসাহেব বুঝেছিল, গার্গীর বিষয়ে আর প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। বললো, 'কালকে আপনার সঙ্গে দেখা করে প্লটটা ঠিক করব।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করি, কাল দেখা হবে ?

'বিকেলের দিকে হতে পারে।'

'বিকেল পাঁচটায় লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। আসবেন।'

'হ্যাঁ, আসব।'

দোলাবৌদি, তুমি তো জান কলকাতার শহরে মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের একটু প্রেম করা কি দুরূহ ব্যাপার। প্রেম করা তো দূরের কথা, একটা গোপন কথা কইবার পর্যন্ত জায়গা নেই কলকাতায়। আমাদের শৈশবে লেকে গিয়ে প্রেম করার প্রথা চালু ছিল, কিন্তু পরে লেকের জলে এতগুলো ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা আত্মহত্যা করল যে লেকে গিয়ে প্রেম করা তো দূরের কথা, একটু বেড়ানও অসম্ভব হলো।

এমন একটা আশ্চর্য শহর তুমি দুনিয়াতে কোথাও পাবে না। শুধু কলকাতা বাদ দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত শহরে-নগরে কত সুন্দর সুন্দর বেড়াবার জায়গা আছে। নিত্যনতুন আরো সুন্দর সুন্দর বেড়াবার জায়গা তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমাদের কলকাতা ? সেই জব চার্নক আর ক্লাইভ সাহেবের ওভারসিয়ারবাবুরা যা করে গেছেন,

আমাদের আমলে তাও টিঁকল না। কলকাতার মানুষগুলোকে যেন একটা অন্ধকূপের মধ্যে ভরে দিয়ে চাবুক লাগান হচ্ছে অথচ তাদের চোখের জল ফেলার একটু সুযোগ বা অবকাশ নেই।

সমস্ত যুগে সমস্ত দেশের মানুষই যৌবনে প্রেম করেছে ও করবে। যৌবনের সেই রঙীন দিনগুলোতে তারা সবার থেকে একটু দূরে থাকবে, একটু আড়াল দিয়ে চলবে। কিন্তু কলকাতায় তা কি সম্ভব? নতুন বিয়ে করার পর স্বামী-স্ত্রীতে একটু নিভৃতে মনের কথা কইবার জায়গা কোথায়? মাতৃহারা শিশু বা সন্তানহারা পিতামাতা গলা ফাটিয়ে প্রাণ ছেড়ে কাঁদতে পারে না কলকাতায়। এর চাইতে আর কি বড় ট্র্যাজেডী থাকতে পারে মানুষের জীবনে?

কেতাবে পড়েছি ও নেতাদের বক্তৃতায় শুনেছি বাঙালী নাকি সৌন্দর্যের পূজারী, কালচারের ম্যানেজিং এজেন্টস। রুচিবোধ নাকি শুধু বাঙালীরই আছে। কিন্তু হলপ করে বলতে পারি কোন নিরপেক্ষ বিচারক কলকাতা শহর দেখে বাঙালীকে এ অপবাদ নিশ্চয়ই দেবেন না। রবীন্দ্রনাথ যে কিভাবে চিৎপুর-জোড়াসাঁকোয় বসে কবিতা লিখলেন, তা ভেবে কুলকিনারা পাই না। শেক্সপিয়র বা বায়রন বা অধুনাকালের টি এস ইলিয়টকে চিৎপুরে ছেড়ে দিলে কাব্য করা তো দূরের কথা একটা পোস্টকার্ড লিখতে পারতেন না।

আশ্চর্য, তবুও বাঙালীর ছেলেমেয়েরা আজো প্রেম করে, কাব্য-চর্চা করে, শিল্প-সাধনা করে। যেখানে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ নেই, যেখানে একটা কোকিলের ডাক শোনা যায় না, দিগন্তের দিকে তাকালে যেখানে শুধু পাটকলের চিমনি আর ধোঁয়া চোখে পড়ে, সেই বিশ্বকর্মার তীর্থক্ষেত্রে আমি আর মেমসাহেবও নতুন জীবন শুরু করলাম।

সাত

আমি ভাবছি চিঠিগুলো বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি লিখেছ আরো অনেক বড় করে লিখতে। অথবা কদিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়ে মুখোমুখি সব কিছু বলতে প্রস্তাব করেছ। প্রথম কথা, এখন পার্লামেন্টের বাজেট সেসন চলছে। ছুটি নিয়ে কলকাতা যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া নিজের মুখে তোমাকে এ কাহিনী আমি শোনাতে পারব না। মেমসাহেব আমাকে কত ভাল-বাসত, কত আদর করত, কত রকম করে আদর করত, কেমন করে ছুজনে রাত জেগেছি, সে সব কথা তোমাকে বলব কেমন করে? লজ্জায় আমার গলা দিয়ে স্বর বেরুবে না। ভগবান সবাইকে কণ্ঠস্বর দিয়েছেন। কিন্তু সবার কণ্ঠেই কি সুর আছে? আছে মিষ্টত্ব? নেই। কণ্ঠ থাকলেই কি সব কথা বলা যায়? সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার সব অনুভূতিই কি বলা যায়? হয়ত অন্যেরা বলতে পারে কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সময় থাকলে চিঠিগুলো হয়ত আরো দীর্ঘ হতো। তাছাড়া চিঠি লিখতে বসেও কলম থেমে যায় মাঝে মাঝেই। আমাকে ফাঁকি দিয়ে মনটা কখন যে অতীত দিনের স্মরণীয় স্মৃতির অরণ্যে লুকিয়ে পড়ে, বুঝতে পারি না। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজির পরে দেখি মেমসাহেবের আঁচলের তলায় মন লুকিয়ে আছে। তোমাকে এই চিঠিগুলো লিখতে বসে বার বার মনে পড়ে সেসব দিনের স্মৃতি। আপন মনে কখনো হাসি, কখনো লজ্জা পাই। কখনো আবার মনে হয় মেমসাহেব গান গাইছে এবং বেসুরো গলায় আমি কোরাস গাইতে চেষ্টা করছি। এই চিঠি লিখতে বসেই আবার মনে রিভলবিং স্টেজ ঘুরে যায়, দৃশ্য বদলে যায়। আমার চোখটা

ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। কলমটা থেমে যায়। একটু পরে দু'চোখ বেয়ে জল নেমে আসে।

দোলাবৌদি, তোমাকে চিঠি লিখতে বসে এমনি করে প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। নিজেকেই নিজে হারিয়ে ফেলি। কিন্তু তবুও অনেক কষ্টে ফিরে যাই অতীতে এবং আবার তোমাকে চিঠি লিখতে বসি।

আগে থেকে তোমাকে দুঃখ দেবার ইচ্ছা আমার নেই। যথাসময়ে তুমি আমার চোখের জলের ইতিহাস জানবে। তবে জেনে রেখো, আজ সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আমার নেই। হাঁটবার সাহস নেই, কোনমতে যেন হামাগুড়ি দিয়ে গড়িয়ে চলেছি।

তোমার নিশ্চয়ই এসব পড়তে ভাল লাগছে না। মনটা ছটফট করছে আমাদের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা শুনতে। তাই না? শুধু প্রথম দিনের কথাই নয়, আরো অনেক কিছুই তোমাকে বলব। তবে অনেক দিন হয়ে গেল। কিছু কথা, কিছু স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

সেদিন দুপুরের দিকে অফিসে গিয়ে কিছুক্ষণ কাজ করে জরুরী কাজের অছিলায় বাসায় চলে এলাম। ভাল করে সাবান দিয়ে স্নান করলাম। ধোপাবাড়ির কাচানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরলাম। বোধহয় মুখে একটু পাউডারও বুলিয়েছিলাম। তারপর মা কালীর ফটোয় বার কয়েক প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। দেরি হয়ে যাবার ভয়ে আগে আগেই বেরিয়ে পড়লাম।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই এসপ্লানেড পৌঁছে গেলাম। অফিস ছুটির সময় অনেক পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা। তাই চৌরঙ্গী ছেড়ে রক্সী সিনেমার পাশ দিয়ে ঘুরে ফিরে নিউ মার্কেট চলে গেলাম। মার্কেটের সামনের কিছু স্টলের সামনে কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করে এলাম লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে।

দেরি করতে হলো না। মেমসাহেবও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলো। একঝলক দেখে নিলাম। চমৎকার লাগল। বড় পবিত্র মনে হলো আমার মেমসাহেবকে। খুব সাধারণ সাজগোছ করেএসেছিল। ঐ বিরাট গোছা-ভরা চুলগুলোকে দিয়ে নিছকই একটা সাধারণ খোঁপা বেঁধেছিল। মুখে কোথাও প্রসাধনের ছোঁওয়া ছিল না। পরনে সাদা খোলের একটা মাঝারি ধরনের তাঁতের শাড়ী। গায়ে একটা লক্ষ্ণৌ চিকনের ব্লাউজ। ডান হাতে একটা কঙ্কণ, বাঁ হাতে স্টেনলেস স্টিলের ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা একটা ঘড়ি। হাতে ছুটো-একটা খাতা বই আর ছোট্ট একটা পার্স।

প্রথমে কে কথা বলেছিল, তা আর আজ মনে নেই। ঠিক কি কথা হয়েছিল, তাও মনে নেই। তবে মনে আছে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, চা খাবেন ?

মেমসাহেব বলেছিল, না, চা আর খাব না। তার চাইতে চলুন একটু বসা যাক।

রাস্তা পার হয়ে ময়দানের দিকে এলাম। তারপর কিছুদূর হেঁটে ময়দানের এক কোণায় বসলাম ছুজনে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলাম ছুজনেই। মাঝে মাঝে একবার ওর দিকে তাকিয়েছি আর তৃপ্তিতে ভরে গেছে মন। মেমসাহেবও মাঝে মাঝে আমাকে দেখছিল। কয়েকবার ছুজনের দৃষ্টিতে ধাক্কা লেগেছে। হেসেছি ছুজনেই।

এক সেকেণ্ড পরে আবার আমি তাকিয়েছি মেমসাহেবের দিকে। এবার আর মেমসাহেব চুপ করে থাকতে পারে না। প্রশ্ন করে, 'কি দেখছেন ?'

প্রথমে আমি উত্তর দিতে পারিনি। লজ্জা করেছে, দ্বিধা এসেছে।

মেমসাহেব একটু পরে আবার প্রশ্ন করে, 'কি হলো ? উত্তর দিচ্ছেন না যে।'

'সব সময় কি সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, না দেবার ক্ষমতা থাকে ?'

'আমার প্রশ্নটা কি খুব কঠিন ?'

'কদিন বাদে হয়ত এ প্রশ্ন কঠিন থাকবে না, তবে আজ বেশ কঠিন মনে হচ্ছে।'

দুজনের দৃষ্টিই চারপাশ ঘুরে যায়। আমি আবার চুরি করে মেমসাহেবকে দেখে নিই। ধরা পড়লাম না। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না, ধরা পড়ে গেলাম।

একটু হাসতে হাসতে মেমসাহেব আবার জানতে চায়, 'অমন করে কি দেখছেন ?'

আমি কয়েকবার আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

আমি বললাম, 'আপনি জানেন না আমি কি দেখছি ?'

'না।'

'সত্যি ?'

মেমসাহেব আবার হাসে। বলে, 'প্রথম দিনেই কিভাবে বুঝলেন আমি মিথ্যে কথা বলি।'

'না, তা ঠিক না।'

'তবে বলুন কি দেখছেন।' মেমসাহেব যেন দাবী জানাল।

আমি আর দেরি করি না। মেমসাহেবকে দেখতে দেখতেই বললাম, 'আপনার চোখ দুটি বড় সুন্দর...'

ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় মেমসাহেব। একটু নীচু গলায় বলল, 'ঘোড়ার ডিম সুন্দর!'

আবার কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপচাপ থাকি। তারপর মেমসাহেব আবার বলে, 'আমি কালো কুচ্ছিৎ বলে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন ?'

জান দোলাবৌদি, কোন কারণ ছিল না কিন্তু তবুও দুজনে মুচকি

হাসতে হাসতে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করলাম। প্রথম প্রথম প্রেমে পড়লে এমন অকারণ অনেক কিছুই করতে হয়, তাই না? তবে শেষে আমি বলেছিলাম, 'সত্যি আপনার চোখ দুটো বড় সুন্দর।'

পরে বিদায় নেবার আগে বলেছিলাম, 'প্রথম পরিচয়ের দিনই আপনার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনার জন্য যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে তো মাপ করবেন।'

তুমি তো মেমসাহেবকে দেখেছ। সত্যি করে বল তো, ওর চোখ দুটো সুন্দর কিনা। অত কালো টানা টানা ঘন গভীর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ আমি তো জীবনে কোথাও দেখিনি। ঐ চোখ দুটো আমাকে চুম্বকের মত টেনে নিয়েছিল। সেই সেদিন দানাপুর প্যাসেঞ্জারের কামরায় মেমসাহেবের প্রথম দেখা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেশ উপলব্ধি করেছিলাম আমার নিঃসঙ্গ জীবনের শেষ হতে চলেছে। ময়দানে মেমসাহেবের পাশে বসে আমার সে উপলব্ধি আরো দৃঢ় হলো। বেশ বুঝতে পারলাম জীবনদেবতা আমাকে জনারণ্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেবেন না। নিঃশব্দে নিভৃতে তিনি আমার কাছে মেমসাহেবকে পাঠিয়েছেন আমার জীবনযুদ্ধের সেনাপতিরূপে।

আমার নতুন সেনাপতিও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে বিধাতাপুরুষ শুধু একটু হাসি, একটু গান, একটু সুখ, একটু আনন্দ, একটু ভাললাগার জন্য তাকে আমার কাছে টেনে আনেন নি।

দু'চারদিন আরো দেখাশোনা হবার পর একদিন সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ময়দানের এক কোণায় বসে মেমসাহেবকে আমার জীবনকাহিনী শোনালাম। সব কিছু শুনে মেমসাহেব বলেছিল, 'ধাতুটা ভাল তবে খাদ মিশে গেছে। গহনা গড়বার জন্য একটু বেশী পোড়াতে হবে, একটু বেশী পেটাতে হবে।'

'কাকে পোড়াবেন? কাকে পেটাবেন?'

'বুঝতে পারছেন না?'

'বুদ্ধি থাকলে তো বুঝব।'

এবার একটু হেসে একটু জোর গলায় বললো, 'আপনাকে।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'সে কি সর্বনাশের কথা।'

প্রায় তোৎলামী করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমাকে পোড়াবেন, পেটাবেন?'

মেমসাহেব গাম্ভীর্য আনার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বলল, 'তবে কি আপনাকে পুজা করব?'

একটু পরে বলেছিল, 'দেখবেন, আপনাকে কেমন জব্দ করি, কেমন শাসন করি।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই।'

'পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।' বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মেমসাহেব জবাব দেয়।

'পাছে হেরে যান, সেই ভয়ে মা পর্যন্ত আগে আগেই পালিয়েছেন, সুতরাং আপনি কি···।'

আরো কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে মেমসাহেব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল আমি পরীক্ষা দিয়ে কোনমতে পাশ করেছি কিন্তু ঠিক লেখাপড়া বিশেষ কিছু করিনি। তাই বলল, রোজ একটু পড়াশুনা করবেন।

'সে কি? এই বুড়ো বয়সে আবার পড়াশুনা করব?'

সোজা জবাব আসে, 'বাজে তর্ক করবেন না। নিশ্চয়ই রোজ একটু পড়াশুনা করবেন।'

'ডজন খানেক খবরের কাগজ আর ডজন খানেক জার্নাল তো রেগুলার পড়ি।'

'খবরের কাগজে কাজ করতে হলে শুধু খবরের কাগজ পড়লে চলে না, আরো কিছু পড়া দরকার

আমি চুপ করে থাকি। বসে বসে ভাবি মেমসাহেবের কথা।

মেমসাহেব বলে, 'একটা কথা বলবেন ?'

'বলব।'

'আপনি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন, তাই না ?'

'না, না, বিরক্ত হবো কেন ?'

'তবে এত গম্ভীর হয়ে ভাবছেন কি ?'

দৃষ্টিটা উদাস হয়ে যায়। মনটা উড়ে বেড়ায় অতীত-বর্তমানের সমস্ত আকাশ জুড়ে। শুধু বলি, 'একটুও বিরক্ত হচ্ছি না। শুধু ভাবছি কেউ তো আমাকে এসব কথা আগে বলে নি···।'

'তাতে কি হলো ?'

এমনি করে এগিয়ে চলে আমাদের কথা। শেষে মেমসাহেব বলে, 'চিরকালই কি আপনি একটা অর্ডিনারী রিপোর্টার থাকবেন ?'

'মাত্র একশ' পঁচিশ টাকা মাইনের সেই রিরোর্টার হবার সুযোগই আজ পর্যন্ত পেলাম না ; সুতরাং কল্পনা করে আর কতদূর যাব ?'

স্পষ্ট জানিয়ে দেয় মেমসাহেব, 'ওসব কথা বাদ দিন। অতীত আর বর্তমান নিয়েই তো জীবন নয়, ভবিষ্যতই জীবন।'

'অতীত আর বর্তমানের ক্ষয়রোগে ভুগতে ভুগতে মেরুদণ্ডটা ভেঙে গেছে। তাই ভবিষ্যতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব বলে ভরসা পাই না।'

'কথাটা ঠিক হলো না। অতীত-বর্তমান হচ্ছে ক্যানভাস আর ব্যাকগ্রাউণ্ড মাত্র, ছবিটা এখনও আঁকা বাকি।

যাই হোক শেষে মেমসাহেব বলল, 'অতীত-বর্তমান নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না, ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে তৈরি করুন। ক্লাসিকস্ পড়ুন, ভাল ভাল লিটারেচার পড়ুন।'

সাধারণত ছেলেমেয়েরা ছাত্রজাবনে পড়াশুনা করে। প্রথম কথা, আমাকে গাইড করার কেউ ছিল না। দ্বিতীয়ত ছাত্রজীবনে সে সুযোগ বা অবসরও পাইনি। পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য কিছু

ইংরেজি-বাংলা সাহিত্য পড়তে বাধ্য হয়েছি। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ইত্যাদি কোন না কোন কারণে বা উপলক্ষে পড়েছি। কদাচিৎ কখনও কোন দুর্ঘটনার জন্য জনসন বা টি এস ইলিয়টও হয়ত পড়েছি। কিন্তু ঠিক পড়াশুনা বলতে যা বোঝায়, তা আমি করতে পারিনি। মেমসাহেবের পাল্লায় পড়ে এবার আমি সত্যি সত্যিই একটু পড়াশুনা করা শুরু করলাম।

কোনদিন নিজেদের বাড়ি থেকে কোনদিন আবার ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে মেমসাহেব আমার জন্য বই আনা শুরু করল। আমিও ধীরে ধীরে পড়াশুনা শুরু করলাম। ইংরেজি-বাংলা দুইই পড়লাম। বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল আবার পড়লাম। রমেশচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও বাদ পড়লেন না। তারপর মোহিতলাল থেকে জীবানন্দও মেমসাহেব প্রেসক্রিপশন করল। ওদিকে ডরোথী পার্কারকে পড়লাম, পড়লাম রবার্ট ফ্রস্ট—টি এস ইলিয়ট—এজরা পাউণ্ডের কবিতা। আমার মন ছটফট করে ওঠে। মেমসাহেবকে বললাম, 'মেমসাহেব, এবার তোমার পাঠশালা বন্ধ কর।'

মেমসাহেব কি বলল জান? বলল, 'বাজে বকো না। কিছু লেখাপড়া না করে জার্নালিজম করতে তোমার লজ্জা করে না?'

'লজ্জা? জার্নালিস্টদের লজ্জা! তুমি হাসালে মেমসাহেব!'

মেমসাহেবের দাবড় খেয়ে হাক্সলে, হেনরি গ্রীন, হেমিংওয়ে, লরেন্স ডুরেল, অ্যানি পর্টার, মেরী ম্যাকার্থির এক গাদা বই পড়লাম।

এর পর একদিন আমাকে গীতবিতান প্রেজেণ্ট করল। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, মেমসাহেব কি এবার আমাকে গানের স্কুলে ভর্তি করবে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'তানপুরা পাব না?'

মেমসাহেব রেগে গেল। 'আমার মুণ্ডু পাবে।'

পরে বলেছিল, যখন হাতে কাজ থাকবে না, চুপচাপ গীতবিতানের পাতা উল্টিয়ে যেও। খুব ভাল লাগবে। দেখবে তুমি অনেক কিছু ভাবতে পারছ, কল্পনা করতে পারছ।

ইতিমধ্যে এম. এ. পাশ করে মেমসাহেব একটা গার্লস কলেজে অস্থায়ীভাবে অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে আরো অনেক কিছু হয়ে গেছে। মেমসাহেব উপলব্ধি করল আমার অন্তরের শূন্যতা, জীবনের ব্যর্থতা, ভবিষ্যতের আশঙ্কা। উপলব্ধি করল আমার জীবন-যজ্ঞে তাঁর অনন্য প্রয়োজনীয়তা। আমি নিজেই একদিন বললাম, জান মেমসাহেব, প্রথমে শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরে এক দুর্বল মুহূর্তে স্বপ্ন দেখলাম আমি এগিয়ে চলেছি। দশজনের মধ্যে একজন হবার স্বপ্ন দেখলাম। সেই স্বপ্নের ঘোরে বেশ কিছুকাল কেটে গেল। যখন সম্বিত ফিরে পেলাম, তখন নিজের দুরবস্থা দেখে নিজেই চম্‌কে গেলাম, ঘাবড়ে গেলাম, হতাশ হলাম।

একটু থামি।

আবার বলি, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনা বিসর্জন দিয়ে নিজেকে তুলে দিলাম অদৃষ্টের হাতে। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সব হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আবার সমস্ত স্বপ্ন উড়ে এসে জড়ো হলো মনের আকাশে।

মেমসাহেবের হাতটা চেপে ধরে বললাম, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, মেমসাহেব। তোমাকে দেখেই যেন মনে হলো তুমি তো আমারই। এই অন্ধকূপ থেকে আমাকে মুক্তি দেবার জন্যই যেন ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন।

আমার মত মেমসাহেব কোনদিনই বেশী কথা বলত না। শুধু বলল, হয়ত তাই। তা না হলে তোমার সঙ্গে অমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে পরের দিনই আবার দেখা হবে কেন?

অদৃষ্টের ইঙ্গিত, নিয়তির নির্দেশ মেমসাহেবও বুঝতে পেরেছিল। আমি অনেক কথা বলার পরই দু'হাত তুলে মেমসাহেবের কাছে

আত্মসমর্পণ করেছিলাম। মেমসাহেবের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছিল।

প্রতিদিনের মত সেদিন বেলা দেড়টা-তুটোর সময় অফিস গিয়েছিলাম। টেলিপ্রিণ্টারের কয়েকটা লোক্যাল কপি দেখতে দেখতেই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে অভ্যাস মত বললাম, রিপোর্টার্স।

'কখন অফিসে এলে?'

'এইত একটু আগে।'

'একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'শুনবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।'

আমি একটু অবাক হয়ে জানতে চাই, 'এখন?'

'হ্যাঁ।'

'কি ব্যাপার বল তো।'

'বল না যাবে কিনা?'

চীফ রিপোর্টার বা নিউজ এডিটর তখনও অফিসে আসেন নি। কি করব, ভাবছিলাম। মেমসাহেব টেলিফোন ধরে থাকল। আমি ডায়েরীতে দেখে নিলাম তুটো প্রেস কনফারেন্স ছাড়া আর কিছু নেই। একটা চারটের সময় আর দ্বিতীয়টা সন্ধ্যা সাতটায়।

মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সাতটার মধ্যে ফিরতে পারব?'

'সাতটা? বোধহয় না।'

'কখন ফিরবে?'

'আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরব।'

চীফ রিপোর্টারকে একটা শ্লিপ লিখে রেখে গেলাম, একটা জরুরী

নিউজের লোভে বেরিয়ে যাচ্ছি। রাত্রে ফিরে টেলিফোন ডিউটি দেব।

অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এসপ্লানেডের মোড়ে দুজনে মীট করে সোজা চলে গেলাম দক্ষিণেশ্বর। মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। তাই এদিক-ওদিক ঘুরে পঞ্চবটী ছাড়িয়ে আরো খানিকটা দক্ষিণে গঙ্গার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম দুজনে।

মেমসাহেব বলল, 'চোখ বন্ধ কর।'

'কেন?'

'আঃ। সব সময় কেন কেন করো না। বলছি চোখ বন্ধ কর।'

'পুরোটা না অর্ধেকটা বন্ধ করব?'

'তুমি বড্ড তর্ক কর।' মেমসাহেব এবার কড়া হুকুম দেয়, 'আই সে, ক্লোজ ইওর আইজ।'

সত্যি সত্যিই চোখ বন্ধ করলাম। মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করলাম মেমসাহেব আমার দুটি পায় হাত দিয়ে প্রণাম করছে। চম্‌কে গিয়ে চোখ খুলে প্রশ্ন করলাম, 'একি ব্যাপার?'

দেখি মেমসাহেবের মুখে অনির্বাণ আনন্দের বন্যা, দুটি চোখে পরম তৃপ্তির দীপশিখা জ্বলছে। দুটি হাত দিয়ে মেমসাহেবের মুখটা তুলে ধরে আবার প্রশ্ন করলাম, 'হঠাৎ প্রণাম করলে কেন মেমসাহেব?'

কোন উত্তর দিল না মেমসাহেব। আত্মসমর্পণের ভাষায় চাইল আমার দিকে। আমিও ওর দিকে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর আবার জানতে চাইলাম, 'বল না প্রণাম করলে কেন?'

এবার মেমসাহেব কথা বলে, 'আমি তোমাকে প্রণাম করলাম, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে না?'

আমি অবাক হয়ে যাই। নিজের দৈন্য এত স্পষ্ট হলো যে নিজেকে বেশ ছোট মনে হলো। মেমসাহেব প্রণাম করার পর

কৈফিয়ত তলব না করে আমার আশীর্বাদ করা প্রথম কাজ ছিল। যাই হোক তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে কাছে টেনে নিলাম। দুটি হাত দিয়ে ওর মুখখানা তুলে ধরে বললাম, ভগবান যেন তোমাকে সুখী করেন।

মেমসাহেব হঠাৎ মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে দুহাত দিয়ে আমাকে চেপে ধরে বলল, 'ভগবান কি করবেন, তা ভগবানই জানেন কিন্তু তুমি কি আমাকে সুখী করবে?'

'কি মনে হয়?'

'মনে মনে তো ভয়ই হয়।'

'কিসের ভয়?'

কানে কানে ফিস ফিস করে মেমসাহেব বলল, 'হাজার হোক খবরের কাগজের রিপোর্টার! কবে, কখন, কোথায় হয়ত কোন সুন্দরী এসে তোমাকে ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাবে···।'

'তাই নাকি?'

'তবে আবার কি! পুরুষদের বিশ্বাস নেই·····।'

'জান মেমসাহেব, তোমাকে নিয়ে আমারও অনেক ভয়।'

আমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে মেমসাহেব অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে নিয়ে তোমার ভয়?'

'জি, মেমসাহাব।'

'বাজে বকো না।'

'বাজে না মেমসাহেব। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন মানুষের আমন্ত্রণ এলে পঞ্চাশ টাকার এই রিপোর্টারকে নিশ্চয়ই তোমার ভুলে যেতে কষ্ট হবে না।'

দপ করে জ্বলে উঠল মেমসাহেব, 'সব সময় তুমি পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টার, পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টার বলবে না তো! সারা জীবনই কি তুমি পঞ্চাশ টাকার রিপোর্টার থাকবে?'

'থাকব না ?'

'না, না, না।'

'তাহলে কি হবো ?'

'কি আবার হবে ? জীবনে মানুষ হবে, বড় হবে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।'

'পারব ?'

'একশ'বার পারবে। তাছাড়া আমি আছি না।'

মেমসাহেব আমাকে একটু কাছে টেনে নেয়। একটু আদর করে। মাথার চুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আবার বলে, 'তুমি ভাব কেন যে তুমি হেরে গেছ ?'

'কি করব বল মেমসাহেব ? অকুল সমুদ্রে জাহাজ ভেসে বেড়ায়, কিন্তু লাইট হাউসের ঐ ছোট্ট একটা আলোর ইঙ্গিত না পেলে তো সে বন্দরে ভিড়তে পারে না।'

'আমি তো এসেছি, আর ভয় কি ? কিন্তু কথা দিতে পার আমার বন্দর ছেড়ে তুমি তোমার জাহাজ নিয়ে অন্য বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াবে না ?'

আচ্ছা দোলাবৌদি, সব মেয়েদের মনেই ঐ এক ভয়, এক সন্দেহ কেন বলতে পার ? পৃথিবীর ইতিহাস কি শুধু পুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীতেই ভরা ? যাই হোক মেমসাহেবের কথা আমার বেশ লাগত। অন্তত এই ভেবে আমি তৃপ্তি পেতাম যে সে আমাকে সম্পূর্ণভাবে কামনা করে।

সেদিন কথায় কথায় সন্ধ্যা নেমে এলো। মন্দিরের মঙ্গলদীপের আলোর প্রতিবিম্ব পড়ল গঙ্গায়। স্রোতস্বিনী গঙ্গা সে আলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল দূর-দূরান্তরে, শহরে, নগরে, জনপদে আর অসংখ্য মানুষের মনের অন্ধকার গহন অরণ্যে।

মেমসাহেব শেষকালে প্রশ্ন করল, 'কই তুমি তো জানতে চাইলে

না তোমাকে আজ এখানে নিয়ে এলাম কেন ? তুমি তো জানতে চাইলে না তোমাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইলাম কেন ?'

'কোন বিশেষ কারণ আছে নাকি ?'

'তবে কি', এই বলে মেমসাহেব ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে আমাকে পড়তে দিল।

পড়ে দেখি হাওড়া গার্লস কলেজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। মেমসাহেবের দুটি হাত ধরে বললাম, 'কনগ্রাচুলেশনস। এইত অয়মারম্ভ, আনন্দে ঐশ্বর্যে ভগবান নিশ্চয়ই তোমাকে ভরিয়ে তুলবেন।'

একটু থেমে প্রশ্ন করি, 'মাসে মাসে আড়াইশ' টাকা দিয়ে কি করবে মেমসাহেব ?'

'কেন ? দুজনে মিলেও ওড়াতে পারব না ?'

দুজনেই হেসে উঠি।

মেমসাহেব অধ্যাপনা করা শুরু করায় গর্বে আমার বুকটা ভরে উঠল। কদিন পরে অফিস থেকে পঁচিশটা টাকা অ্যাডভান্স নিলাম। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর সেলস এম্পোরিয়াম থেকে আঠারো টাকা দিয়ে একটা তাঁতের শাড়ী কিনলাম। বিকেল বেলায় মেমসাহেবকে প্যাকেটটা দিয়ে বললাম, এই শাড়ীটা পরে কালকে কলেজে যেও।

পরের দিন ঐ শাড়ীটা পরে কলেজে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর আর পরত না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'শাড়ীটা বুঝি তোমার পছন্দ হয় নি ?'

'খুব পছন্দ হয়েছে।'

'সেইজন্যই বুঝি পরতে লজ্জা করে ?'

কানে কানে বলল, 'না, গো, না। ওটা তোমার প্রথম প্রেজেন-টেশন। যখন তখন পড়ে নষ্ট করব নাকি ?'

প্রথম মাসে মাইনে পাবার পর মেমসাহেব আমাকে কি

দিয়েছিল জান? একটা গরদের পাঞ্জাবি আর একটা চমৎকার তাঁতের ধুতি।

ধুতিটা কেনার সময় ভারী মজা হয়েছিল।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করল, জরি পাড় নেবে? নাকি প্লেন পাড় নেবে?

দোকানের আর কেউ শুনতে না পারে তাই কানে কানে বললাম, যদি টোপরটাও কিনে দাও তাহলে জরিপাড় ধুতি কেন; আর যদি এখন টোপর না কিনতে চাও তবে প্লেন পাড়ই···।'

'অসভ্য কোথাকার।'

ধুতি কিনে দোকান থেকে বেরুতে বেরুতে মেমসাহেব বলল, 'তুমি ভারী অসভ্য।'

'কি আশ্চর্য! তোমার সঙ্গেও ফ্রাঙ্কলি কথা বলব না?'

'এই তোমার ফ্রাঙ্কলি বলার ঢং?'

সেসব দিনের কথা আজ তোমাকে লিখতে বসে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। কি কারণে ও কেমন করে আমরা দুজনে এত দ্রুততালে এগিয়ে চলেছিলাম, তা আমি জানি না। কোন যুক্তি-তর্ক দিয়ে এসব বোঝান সম্ভব নয়। মানুষের মন লজিকের প্রফেসর বা বিচারকদের পরামর্শ বা উপদেশ মেনে চলে না। মুক্ত বিহঙ্গের মত সে আপন গতিতে উড়ে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়। মানুষের মন যদি বিচার-বিবেচনা মেনে চলতে জানত তাহলে শুধু আমার বা মেমসাহেবের কাহিনী নয়, পৃথিবীর ইতিহাসও একেবারে অন্যরকম হতো।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই মানুষ একজনকে অবলম্বন করে বড় হয়, ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলে। একটি মুখের হাসি, দুটি চোখের জলের জন্য মানুষ কত কি করে! আমি বড় হয়েছি, ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছি নিতান্তই প্রকৃতির নিয়মে। মায়ের মুখের হাসি বা প্রিয়জনের চোখের জলের কোন

ভূমিকা ছিল না আমার জীবনে। তাইতো আমি মেমসাহেবকে সমস্ত মন, প্রাণ, সত্তা দিয়ে চেয়েছিলাম। এই চাওয়ার মধ্যে একটুও ফাঁকি ছিল না। তাইতো মেমসাহেবকেও পাওয়ার মধ্যেও কোন ফাঁকি থাকতে পারে নি। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির বাইশটি বসন্ত অতিক্রম করতে মেমসাহেবের জীবনে নিশ্চয়ই কিছু কিছু মাছি বা মৌমাছি ভন্‌ভন্ করেছে চারপাশে। হয়ত বা কারুর গুঞ্জন মনে একটু রং লাগিয়েছে কিন্তু ঠিক আমার মত কেউ সমস্ত জীবনের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে নি। তাইতো মেমসাহেবের জীবনের সব বাঁধন খুলে গিয়েছিল, সংযম আর সংস্কার ভেসে গিয়েছিল।

আমার মত মেমসাহেবের জীবনেও অনেক অনেক পরিবর্তন এলো। আমার পছন্দ-অপছন্দ মতামত ছাড়া কোনকিছুই করতে পারত না। আমি সঙ্গে গিয়ে পছন্দ না করলে শাড়ী-ব্লাউজ পর্যন্ত কেনা হতো না। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, 'এত দিন কার পছন্দ মত কিনতে?'

'মা বা দিদির···।'

'এখন কি ওঁদের রুচি খারাপ হয়ে গেছে?'

'না তা হবে কেন? তাই বলে কি ওঁরা চিরকালই পছন্দ করবে?'

'তা তো বটেই।'

মেমসাহেব অভিমান করত। 'বেশ ত আমার সঙ্গে দোকানে যেতে অপমান হলে যেও না।'

আমি কথার মোড় ঘুড়িয়ে দিই। 'না জানি এরপর আরো কত কি কিনে দিতে বলবে!'

মেমসাহেব আমার ইঙ্গিত বোঝে। প্রথমে বলে, 'আবার অসভ্যতা করছ!'

একটু পরে একটু কাছে এসে, একটু আস্তে বলে, 'দরকার হলে নিশ্চয়ই কিনবে। তুমি ছাড়া কে কিনে দেবে বল?'

দোলাবৌদি, ভাবতে পারছ আমাদের অবস্থা ?

নিত্য কর্মপদ্ধতির বাইরে এক ধাপ নড়তে-চড়তে গেলেই মেমসাহেব আমার কাছে আবেদনপত্র নিয়ে হাজির হতো।

'জান, রবিবার কলেজের একদল প্রফেসর শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন। আমাকেও ভীষণ ধরেছেন। কি করি বল তো ?'

'কি আবার করবে, যাবে।' তারপর জেনে নিই, 'কবে ফিরবে ?'

'সোমবার রাত্রেই। মঙ্গলবার তো কলেজ আছে।'

কোন দিন আবার দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলতো, 'দেখ, কালকে ভ্রমরের জন্মদিন। কি দেব বল তো।'

আমি মেমসাহেবের কথা শুনে মনে মনে হাসতাম। ভ্রমর ওর বাল্যবন্ধু, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি একসঙ্গে পার হয়েছে। প্রতিবছরই জন্মদিনে যেতে হয়েছে, কিছু না কিছু প্রেজেনটেশনও দিয়েছে। আজ এই সামান্য ব্যাপারটা এত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল যে, মেমসাহেব নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোন কুলকিনারা পেল না। ডাক পড়ল আমার।

আমার ওপর মেমসাহেবের নির্ভরতার খবর আমাদের আশেপাশের সবাই জানত। মেমসাহেবের মেজদি হয়ত সিনেমার টিকিট কেটেছে কিন্তু তবুও ছোটবোনের সঙ্গে মজা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করত, 'হ্যাঁরে, রিপোর্টারকে জিজ্ঞাসা করিস তুই রবিবার ম্যাটিনীতে সিনেমা যেতে পারবি কিনা।'

মেমসাহেব দৌড়ে গিয়ে মেজদির মুখটা চেপে ধরে বলত, 'ভাল হচ্ছে না কিন্তু!'

মুচকি হাসি লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে মেজদি বলত, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমিই রিপোর্টারকে ফোন করে জেনে নেব।'

মেমসাহেব হুঙ্কার দিত, 'মা! মেজদি কি করছে!'

কোনদিন আবার মেজদি মেমসাহেবকে বলত, 'হ্যাঁরে, রিপোর্টারকে একবার ফোন করবি ?'

'কেন ?'

'জিজ্ঞাসা কর ত তুই আজকে মাছের ঝোল খাবি না ঝাল খাবি ।'

মেমসাহেব মেজদিকে ধরতে যেত আর মেজদি দৌড়ে পালিয়ে যেত ।

অনেক রাত হয়ে গেছে । কত রাত জান ? পৌনে তিনটে বাজে । চারপাশের সব বাড়ির সবাই সারাদিন কাজকর্ম করে কত নিশ্চিন্তে, কত শান্তিতে এখন ঘুমোচ্ছে । আর আমি ?

মখমুর দেহলভির একটা 'শের' মনে পড়ছে—

মহব্বত জিসকো দেতে হ্যায়,
উসে ফির কুচ নেই দেতে,
উসে সব কুচ দিয়া হ্যায়,
জিসকো ইস্ কাবিল নেহি সমঝা।

—জীবনে যে ভালবাসা পায়, সে আর কিছু পায় না ; যে জীবনে আর সব কিছু পায়, সে ভালবাসা পায় না ।

তোমাদের জীবনে নয়, কিন্তু আমার জীবনে কথাটা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে ।

আট

ইতিহাসের সে এক প্রাগৈতিহাসিক অধ্যায়ে কক্ষচ্যুত গ্রহের আকারে পৃথিবী মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। উদ্দেশ্যহীন হয়ে পৃথিবী কতদিন ঘুরপাক খেয়েছিল, তা আমার জানা নেই। জানা নেই কতদিন পর সে সূর্যকে কেন্দ্র করে আপন কক্ষপথ আবিষ্কার করেছিল। তবে জানি প্রতিটি মানুষকেও এমনি উদ্দেশ্যহীন হয়ে মহাশূন্যে ঘুরপাক খেতে হয়। সময় কম-বেশী হতে পারে কিন্তু কালের এই নির্মম রসিকতার হাত থেকে কেউ মুক্তি পায় না। আমিও পাই নি। তোমরাও তো পাও নি।

মেমসাহেবকে পাবার পর আমার সে অকারণ ঘুরপাক খাওয়া বন্ধ হল। ঠিকানাহীন চলার শেষ হলো। আপন কক্ষপথ দেখতে পেলাম। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়া বন্ধ হলো; দুনিয়াটাকে, জীবনটাকে বড় ভাল লাগল। তুমি তো জান আমি সব কিছু পারি; পারি না শুধু কবিতা লিখতে। তাই কাব্য করে ঠিক বোঝাতে পারছি না।

বড়বাজার বা চিৎপুরের মোড়ের ফুলের দোকান দেখেছ? দেখেছ তো কত অজস্র সুন্দর সুন্দর ফুল বোঝাই করা থাকে দোকানগুলিতে? ঐ ভিড়ের মধ্যে এক একটি ফুলের সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দোকান থেকে সামান্য কটি ফুল কিনে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে ফ্লাওয়ার-ভাস-এ রাখলে সারা ড্রইংরুমটা যেন আলোয় ভরে যায়। তাই না? হাওড়া ব্রীজের তলায়, জগন্নাথ ঘাটের পাশে মণ দরে ঝুড়ি বোঝাই করে রজনীগন্ধা বিক্রী হয় কিন্তু সে দৃশ্য দেখা যায় না। তার চাইতে অর্গানের ওপর একটা লম্বা ফ্লাওয়ার-ভাসের মধ্যে মাত্র দু-চারটে স্টিক দেখতে অনেক ভাল লাগে, অনেক তৃপ্তি পাওয়া যায় মনে।

জগন্নাথ ঘাটের রজনীগন্ধার পাইকারী বাজার দেখে নিশ্চয়ই কোন কবির কাব্যচেতনা জাগবে না। কিন্তু প্রেয়সীর অঙ্গে একটু রজনীগন্ধার সজ্জা অনেকের মনেই দোলা দেবে।

আমি রজনীগন্ধা না হতে পারি কিন্তু ক্যাকটাস তো হতে পারি? মেমসাহেব সেই ক্যাকটাস দিয়ে জাপানীদের ঢং-এ চমৎকার গৃহসজ্জা করেছিল। আমি আমিই থেকে গেলাম। শুধু পরিবেশ পরিবর্তনে আমার জীবন-সৌন্দর্যের প্রকাশ পেলো।

ইডেন গার্ডেনের ধার দিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা দুজনে গঙ্গার ধারে হারিয়ে গেলাম। কয়েকটা বড় বড় জাহাজ পৃথিবীর নানা প্রান্ত ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গঙ্গাবক্ষে বিশ্রাম করছিল। ক্লান্ত আমিও মেমসাহেবের কাঁধে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম করছিলাম।

মেমসাহেব আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে প্রশ্ন করল, এমনি করে কতদিন কাটাবে?

'তুমি কি ঘর বাঁধার কথা বলছ?'

'সব সময় স্বার্থপরের মত শুধু ঐ এক চিন্তা', মেমসাহেব মিহি সুরে আমাকে একটু টিপ্পনি কাটল।

'তুমি কি অন্য কিছু বলছ?' আমি জানতে চাইলাম।

এবার মেমসাহেবের পালা। 'তুমি কি নিজের জীবন সম্পর্কে একটুও ভাববে না? শুধু মেমসাহেবকে ভালবাসলেই কি জীবনের সবকিছু মিটবে?'

'নিজের কথা ভাবতে ভাবতে কিছু হদিশ না পেয়েই তো তোমার ঘাটে এই ডিঙি ভিড়িয়েছি। এখন তো তোমার দায়িত্ব।'

'তাই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অন্ধকারটা একটু গাঢ় হলো। আমরা আর একটু নিবিড় হলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে একটা চীনেবাদামওয়ালা হাজির হলো আমাদের পাশে। লজ্জায় একটু সঙ্কোচবোধ করলাম

হুজনেই। বাদাম চিবুবার কোন ইচ্ছা না থাকলেও ওর উপস্থিতিটা অসহ্য মনে হচ্ছিল বলে তাড়াতাড়ি দু' প্যাকেট বাদাম কিনলাম।

আমি আবার একটু নিবিড় হলাম। বললাম, 'মেমসাহেব একটা গান শোনাবে?'

'এখানে নয়।'

'এখানে নয় তো তোমার কলেজের কমনরুমে বসে গান শোনাবে?'

নির্বিকার হয়ে মেমসাহেব বলে, যখন আমরা কলকাতার বাইরে যাব, তখন তোমাকে অনেক গান শোনাব।'

সেদিন মেমসাহেবের এই কথার কোন গুরুত্ব দিই নি। ভেবেছিলাম এড়িয়ে যাবার জন্য ঐ কথা বলছে।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। দুজনে সন্ধ্যার পর বেলভেডিয়ারের ধার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মেমসাহেব হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল, বেড়াতে যাবে?

'কোথায়?'

'কলকাতার বাইরে?'

'কার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

আমি আর ধৈর্য ধরতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলাম, 'আজই যাবে?'

'তুমি কি কোনদিন সিরিয়াস হবে না?'

'তুমি কি চাও? আমি তোমার সঙ্গে ডিয়ারনেস এলাউন্স বা বাড়িভাড়া নিয়ে আলোচনা করি?'

মেমসাহেব হাসে। দুজনে হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আরো এগিয়ে যাই।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই আমার প্ল্যান হয়ে গেল। মেমসাহেবের কলেজ থেকে তিন-চার দল ছাত্রী আর অধ্যাপিকা তিন-চার দিকে যাবেন এডুকেশন্থাল টুরে। মেমসাহেবের যাবার কথা ঠিক থাকবে কিন্তু যাবে না। বাড়িতে জানবে মেমসাহেব কলেজের ছাত্রী আর সহকর্মীদের সঙ্গে বাইরে গেছে কিন্তু আসলে—

মেমসাহেব শুধু ইলাদিকে একটু টিপে দেবে। ইলাদি আবার মেজদির ক্লাশ ফ্রেণ্ড। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য একটু সতর্ক থাকাই ভাল।

কবে, কখন, কোথায় আমরা গিয়েছিলাম, সেসব কথা খুলে না বলাই ভাল। জেনে রাখ, আমরা বাইরে গিয়েছিলাম। নগর কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ের বাইরে মেমসাহেবকে পেয়ে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম।

তুমি হয়ত ভাবছ ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের কুপেতে করে আমরা দুজনে হনিমুন করতে বেরিয়েছিলাম। তা নয়। অত টাকা কোথায়? আমি তো মাত্র পনের টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। তবে আমার মেমসাহেব করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের চাইতেও উদার ছিল। সেকেণ্ড ক্লাশেরই টিকিট কেটেছিল। গেস্টহাউসে দুটো ঘর ভাড়া নিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, অযথা কেন খরচ করছ? একটা ঘর নিলেই তো হয়।

মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে মেমসাহেব বলেছিল, 'তুমি কি লাউঞ্জে রাত কাটাবে?'

'লাউঞ্জে?—না। তার চাইতে বরং ডাইনিং রুমের টেবিলে রাত কাটাব। কি বল?'

আচ্ছা ওসব পরে বলব। ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে মেমসাহেবকে পাশে পেয়ে আমি যেন আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। ইচ্ছা করছিল, জড়িয়ে ধরি, আদর করি। তা সম্ভব ছিল না। যাত্রীদের সতর্ক দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব ফাঁকি দিয়ে মেমসাহেবকে পাশে পাবার

ছুর্লভ সুযোগ উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। ও কখনো হেসেছে, কখনও চোখ টিপে ইশারা করেছে।

যখন একটু বাড়াবাড়ি করেছি, তখন বলেছে, আঃ। কি করছ ?

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছি, এক্সকিউজ মী, আপনি আমাকে কিছু বলছেন ?

'আজ্ঞে আপনাকে ? না, না, আপনাকে কি বলব ?'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'নো মেনশন।'

আশপাশের ঘর-বাড়ি, বন-জঙ্গল, নদী-নালা পিছনে ফেলে ট্রেনটা ছুটে চলে সামনের দিকে। আমাদের ছুজনের মনটাও দৌড়তে থাকে ভবিষ্যতের দিকে। কত শত অসংখ্য স্বপ্ন উঁকি দেয় মনের মধ্যে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা রূপ নিতে চায় ভবিষ্যতের সেই সব স্বপ্নকে ঘিরে।

নতুন কোন স্বপ্ন, নতুন কোন আশা আমার মনে আসে নি। চিরকাল মানুষ যা স্বপ্ন দেখেছে, যা আশা করেছে, আমি তার বেশী একটুও ভাবিনি। ভাবছিলাম, একদিন অনিশ্চয়তা নিশ্চয়ই শেষ হবে। মেমসাহেব কল্যাণীরূপে আমার ঘরে আসবে, আলো জ্বলে উঠবে আমার অন্ধকার ঘরে।

তারপর ?

উপভোগ ?

নিশ্চয়ই।

সম্ভোগ ?

নিশ্চয়ই।

তবে ঐ সম্ভোগের মধ্যেই দ্বৈত জীবনের যবনিকা টানব না। ছুজনে হাত ধরে এগিয়ে যাব। অনেক অনেক এগিয়ে যাব। দশজনের কল্যাণের মধ্য দিয়ে নিজেদের কল্যাণ করব। দশজনের আশীর্বাদ কুড়িয়ে আমরা ধন্য হবো।

ময়নার মত সুর করে মেমসাহেব ডাক দিল, শোন।

আমি ওর ডাক শুনেছিলাম কিন্তু উত্তর দিলাম না। কেন? ওর ঐ 'শোন' ডাকটা আমার বড্ড ভাল লাগত, বড্ড মিষ্টি লাগত। আমি মুখটা ঘুরিয়ে অন্যদিকে চাইলাম।

আবার সেই ময়নার ডাক, শোন।

'ডাকছ?'

'হ্যাঁ।'

মেমসাহেব কি যেন ভাবে, দৃষ্টিটা যেন একটু ভেসে বেড়ায় ভবিষ্যতের মহাকাশে। আমি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি আমার কাছে। ডাক দিই, মেমসাহেব!

মেমসাহেব সংক্ষিপ্ত সাড়া দেয়, কি?

'আমাকে কিছু বলবে?'

মেমসাহেব এবার ফিরে তাকায় আমার দিকে। ঘন গভীর মিষ্টি দৃষ্টি দিয়ে দেখে আমাকে।

আবার দু-চার মিনিট কেটে যায়। শুধু দুজনে দুজনকে দেখি।

'একটা সত্যি কথা বলবে?' মেমসাহেব এতক্ষণে প্রশ্ন করে।

'বলব।'

আবার মুহূর্তের জন্য মেমসাহেব চুপ করে। দৃষ্টিটা একটু সরিয়ে দিয়ে জানতে চায়, একদিন যখন আমরা দুজনে এক হবো, সংসার করব, তখনও তুমি আমাকে আজকের মত ভালবাসবে?

ইচ্ছা করল মেমসাহেবকে টেনে নিই বুকের মধ্যে। ইচ্ছা করল আদর ভালবাসায় ওকে স্নান করিয়ে দিয়ে বলি, সেদিন তোমাকে হাজার গুণ বেশী ভালবাসব। কিন্তু পারলাম না। কম্পার্টমেণ্টে আরো কজন যাত্রী ছিলেন। তাই শুধু মেমসাহেবের হাতটা টেনে নিয়ে বললাম, আমাকে নিয়ে কি আজও তোমার দুশ্চিন্তা হয়?

মেমসাহেব তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, না, না। আমি জানি তুমি আমাকে অনেক অনেক বেশী ভালবাসবে। আমি জানি তুমি আমাকে সুখী করবে।

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

দোলাবৌদি, সে কদিনের কাহিনী আমার জীবনের অবিস্মরণীয় স্মৃতি। সে স্মৃতি শুধু অনুভবের জন্য, লেখার জন্য নয়। তাছাড়া অনেক দিন হয়ে গেছে। প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের ইতিহাস মনে নেই। মনে আছে—

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কিসের যেন আওয়াজ ভেসে এলো কানে। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম মেমসাহেব দরজা নক করে ডাকছে, 'শোন'। সেই ময়না পাখীর ডাক, 'শোন।'

আমি শুনি কিন্তু জবাব দিই না। বেশ লাগে ঐ ডাকটা। কেমন যেন আদর-ভালবাসা আবেদন-নিবেদন, দাবী ইত্যাদি ইত্যাদির ককটেল থাকত ঐ ডাকে। তাই তো আমি ভণ্ডামী করে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকি। বেশ বুঝতে পারছি ঘুমুবার সময় একলাই ঘুমিয়েছে কিন্তু আর পারছে না। এবার একটু ছুটে আসতে চাইছে আমার কাছে। হয়ত একটু আদর করতে চায়, হয়ত একটু আদর পেতে চায়। হয়ত আমার পাশে শুয়ে আমার হৃদয়ের একটু নিবিড় উষ্ণতা উপভোগ করতে চায়। হয়ত···

আবার দরজায় আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে···'শোন'···'শুনছ' ?

আমি চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করি, কে ?

'আমি। দরজা খোল।'

বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দিলাম, খুলছি।

একটু পরে গায় চাদরটা জড়িয়ে চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করা অবস্থায় দরজাটা খুলে দিলাম। চোখ দুটো বন্ধ করা অবস্থাতেই আবার এসে ঝপাং করে খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম।

মেমসাহেব দরজাটার পর্দাটা বেশ ভাল করে টেনে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, বাপরে বাপ! কি ঘুম ঘুমুতে পার তুমি।

আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকায় উত্তর দিলাম না। দেখলাম মেমসাহেব আস্তে আস্তে আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমার চোখ দুটো বন্ধ ছিল কিন্তু ওর নিশ্বাস পড়া দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে কত নিবিড় হয়ে আমাকে দেখছিল। মুখে, কপালে হাত দিয়ে আদর করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, ঘুমুচ্ছ?

আমি তবুও নিরুত্তর রইলাম। সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে শুলাম। মেমসাহেব আমার পাশে বসে বসে অনেকক্ষণ আমাকে আদর করল। আমি আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে ডান হাত দিয়ে মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধরলাম। একটু অস্পষ্টভাবে ডাক দিলাম, মেমসাহেব।

'এইত।'

আমি আর কোন কথা বলি না।

মেমসাহেব বলে, শুনছ? কিছু বলবে?

আমি তবুও কোন জবাব দিই না।

এমনি করে আরো কিছুক্ষণ কেটে যায়। তারপর মেমসাহেব একটু অভিমান করে বলে, তুমি কি জাগবে না? উঠবে না?

আমি হঠাৎ চোখ দুটো খুলে স্বাভাবিকভাবে বলি, জাগব কিন্তু উঠব না।

মেমসাহেব আমার গালে একটা চড় মেরে বলে, অসভ্য কোথাকার। জেগে থেকেও কথার উত্তর দেয় না।

আমি শুধু বলি, আমি জেগে আছি জানলে কি অমন করে তুমি আমাকে আদর করতে?

'আবার অসভ্যতা!'

আমি আস্তে আস্তে মেমসাহেবকে কাছে আনি, বুকের মধ্যে

টেনে নিই। একটু আদর করি, একটু ভালবাসি। মেমসাহেবকে একটু দেখে নিই। আদর-ভালবাসায় ওর চোখ দুটো যেন আরো উজ্জ্বল হয়, গাল দুটো যেন আরো একটু ফুলে উঠে, ঠোঁট দুটো যেন কথা বলে।

তারপর ?

বলতে পার দোলাবৌদি, তারপর কি হলো ? দুষ্টুমি ? হ্যাঁ, একটু করেছিলাম। বেশী নয়। শুধু ওর দুটি ওষ্ঠের ভাষা, ইঙ্গিত জেনেছিলাম, আর কিছু নয়। মেমসাহেব ? মুখে কিছু বলে নি। চোখ বুজে মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

তারপর ?

তারপর মেমসাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করল, গান শুনবে ?

আমি বললাম, না।

'বেশ করব আমি গান গাইব, তোমায় শুনতে হবে না।'

মেমসাহেব ঘুরে বসল। কনুই-এ ভর দিয়ে হাতের ওপর মুখটা রেখে প্রায় আমার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর খুব আস্তে আস্তে গাইল—মন যে কেমন করে মনে মনে, তাহা মনই জানে।

এমনি করেই শুরু হতো আমাদের সকাল। স্নান সেরে ন'টার মধ্যে ডাইনিং হলে গিয়ে মেমসাহেব ব্রেকফাস্ট খেয়ে আসত কিন্তু আমি তখনও উঠতাম না। ডাইনিং হল থেকে ফিরে এসে মেমসাহেব আমাকে একটা দাবড় দিত, ছি, ছি, তুমি এখনও ওঠনি ?

'একবার কাছে এস, তবে উঠব।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে মেমসাহেব বলে, না আমি আর কাছে আসব না।

'কেন ?'

'কাছে গেলেই তুমি—'

মেমসাহেব আর বলে না। আমিই জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি ?

'কি আবার ? কাছে গেলেই তো আবার হুষ্টুমি করবে।'

'তাতে কি হলো ?'

ঐ টানা টানা ভ্রূ দুটো উপরে উঠিয়ে ও বলে, কি হলো ? তোমার ঐ দাড়ির খোঁচা খেয়ে আমার সারা মুখটা এখনো জ্বলে যাচ্ছে।

আমি তিড়িং করে এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে মেমসাহেবকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি। বলি, জ্বলে যাচ্ছে ?

'তবে কি।'

'বিষ দিয়ে বিষক্ষয় করে দিচ্ছি।'

'আবার অসভ্যতা ?'

আমি বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতেই মেমসাহেব আমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে। আমি বলি, কি আশ্চর্য ! একটা বেয়ারাকে বলতে পারলে না ?

'আজ্ঞে বেয়ারারা আপনার চাকর নয়। ন'টার পর ওরা ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে না।

'তাই বলে তুমি ? যারা দেখল, তারা কি ভাবল বল তো ?'

ট্রে-টা নামিয়ে রেখে টোস্টে মাখন মাখাতে মাখাতে বলল, ভাবল আমার কপালে একটা অপদার্থ কুঁড়ে জুটেছে।

বল দোলাবৌদি, এ কথার কি জবাব দেব ? আমি জবাব দিতাম না। চুপটি করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতাম।

তারপর বারান্দায় দুটো সোফায় বসে আমরা গল্প করতাম কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণের জন্য একটু ঘুরে ফিরেও আসতাম। দুপুর-বেলায় লাঞ্চ খাবার পর মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করত, এখন একটু ঘুমোও।

'কেন আজকে কি রাত্রি জাগবে ?'

আবার সেই গালে একটা চড়। আবার সেই মন্তব্য, অসভ্য কোথাকার !

দুপুরে ঘুমুতাম না। শুয়ে থাকতাম। আমার হাতটা ভুল করে একটু অবাধ্যতা করলে মেমসাহেব বলত, দয়া করে তোমার হাতটাকে একটু সংযত কর।

'কেন? আমি কি না বলিয়া পরের দ্রব্যে হাত দিতেছি?'

'পরের দ্রব্য না হইলেও আমি এখনও আপনার দ্রব্য হই নাই বলিয়া আপনি হাত দিবেন না।'

আমি চট করে উঠে পড়ে গায় জামাটা চাপিয়ে বেরুতে যাই। মেমসাহেব জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছ?

'বাজারে।'

'কেন?'

'মালা কিনতে, টোপর কিনতে।'

মেমসাহেব হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তাই বলে এই দুপুরে যেও না।

ও আমাকে টেনে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আমার পাশে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে বলে, এখনই যদি আমার জন্য এত পাগলামি কর, তবে ভবিষ্যতে কি করবে?

'দেখ মেমসাহেব, রেশনের হিসাব মত চাল-গম বিক্রী করা চলতে পারে কিন্তু ভালবাসা চলতে পারে না।'

আমার কথা শুনে ও মুচকি মুচকি হাসে।

জান দোলাবৌদি, সমাজ-সংসার থেকে কটি দিনের জন্য আমরা দূরে চলে গিয়েছিলাম। ইচ্ছা করলে মুক্ত বিহঙ্গের মত সম্ভোগের মহাকাশে আমরা উড়ে বেড়াতে পারতাম কিন্তু তা করিনি। মেমসাহেবকে অত কাছে পেয়ে, নিবিড় করে পেয়ে, স্বাধীনভাবে পেয়ে মাঝে মাঝে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়েছে, শিরার মধ্য দিয়ে উত্তেজনার বন্যা বয়ে গেছে, ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি কখনও কখনও হারিয়ে গেছে কিন্তু তবুও শান্ত-স্নিগ্ধ ভালবাসার ছোঁয়ায় মেমসাহেব আমাকে সংযত করে রেখেছে। প্রথম কদিন ওকে

কাছে পাবার সময় ওর এই সংযম, সংযত আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি হয়ত ওকে শ্রদ্ধাও করতে আরম্ভ করেছিলাম।

ভবিষ্যতের জন্য আমরা অনেক কিছু গচ্ছিত রাখলেও এই কটি দিনে অনেক কিছু পেয়েছিলাম। দেহের ক্ষুধা মিটাইনি কিন্তু চোখের তৃষ্ণা, প্রাণের হাহাকার, মনের দৈন্য দূর হয়েছিল। আর? আর দূর হয়েছিল চিত্ত-চাঞ্চল্য ও মানসিক অস্থিরতা। আমার চোখের সামনে একটা সুন্দর শান্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছিল।

আর মেমসাহেব? আমার অনেক দুর্বলতার মধ্যেও মেমসাহেব আমার ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করেছিল। অন্ধের যষ্টির মত আমার জীবনে তার অনন্য গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। শিক্ষিতাই হোক আর সুন্দরীই হোক, গরীব হোক বা ধনী হোক, মেয়েদের জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে?

তাইতো হাসি, খেলা, গান ও রাত্রি জাগরণের মধ্য দিয়েও আমরা ভবিষ্যতের রাস্তা ঠিক করে নিয়েছিলাম। দুজনে মিলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম শুধু কিছু হাসি আর খেলা করে জীবনটাকে নষ্ট করব না।

কলকাতা ফেরার আগের দিন রাত্রিতে মেমসাহেব সেই আমার দেওয়া শাড়ীটা পরেছিল। তারপর মাথায় কাপড় দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে আমাকে প্রণাম করেছিল। সেদিন আমার জীবন-উৎসবের পরম মুহূর্তে কোন পুরোহিত মন্ত্র পড়েন নি, কোন কুলবধূ শাঁখ বাজান নি, আত্মীয়-বন্ধু সাক্ষী রেখে মালা বদল করিনি কিন্তু তবুও আমরা দুজনে জেনেছিলাম আমাদের দুটি জীবনের গ্রন্থিতে অচ্ছেদ্য বন্ধন পড়ল।

তোমার চিঠি পেয়েছি। একবার নয়, অনেকবার পড়েছি। তুমি হয়ত আমার মনের খবর ঠিকই পেয়েছ। কিন্তু আমার মনে অনেক দুঃখ থাকলেও আক্ষেপ নেই, বেদনা থাকলেও ব্যর্থতার গ্লানি নেই। তার দীর্ঘ কারণ আজ বলব না, হয়ত তুমিও বুঝবে না। আমার এই কাহিনী যখন লেখা শেষ হবে, সেদিন আশা করি সবকিছু দিনের আলোর মত স্পষ্ট হবে।

তবে হ্যাঁ, আজ এইটুকু জেনে রাখ আমি জীবনে যে প্রেম-ভালবাসার ঐশ্বর্য পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। হয়ত আরো অনেকে এই ঐশ্বর্য পেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার ঐশ্বর্যের কোন তুলনা করার মাপকাঠি আমার জানা নেই, প্রয়োজনও নেই। তবে এইটুকু নিশ্চয়ই জানি আমি পূর্ণ পরিপূর্ণ হয়েছি। আর জানি আমার এই ঐশ্বর্যের সঙ্গে পৃথিবীর কোন ধনীর কোন ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। ধনী একদিন সমস্ত কিছু হারিয়ে দরিদ্র, ভিখারী হতে পারে, সে ঐশ্বর্যের হস্তান্তর হতে পারে, অপব্যয়, অপব্যবহার হে পারে কিন্তু আমার প্রাণ-মনের এই অতুলনীয় সম্পদ কোনদিন হারাবে না, হারাতে পারে না। যতদিন আমি এই পৃথিবীতে থাকব, ততদিন ঐ ঘন কালো টানা টানা গভীর দুটি চোখ আমার জীবন-আকাশে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই পৃথিবীর পঞ্চভূতের মাটিতে একদিন আমি মিশে যাব, আমার সমস্ত খেলা একদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে, সবার কাছ থেকে আমি চিরতরে হারিয়ে যাব, কিন্তু আমার মেমসাহেব কোনদিন হারিয়ে যাবে না। আমার এই চিঠিগুলি যতদিন থাকবে, মেমসাহেবও ততদিন থাকবে। তারপর সে রইবে তোমার ও আরো

অনেক অনেকের স্মৃতিতে। তারপরও ভারতবর্ষের অনেক শহরে-নগরে গ্রামে গেলে মেমসাহেবের স্মৃতির স্পর্শ পাওয়া যাবে। উত্তর বঙ্গের বনানীতে, বোম্বাই'এর সমুদ্রসৈকতে, বরফে-ঢাকা গুলমার্গের আশেপাশে নিস্তব্ধ রাত্রে কান পাতলে হয়ত মেমসাহেবের গান আরো অনেকদিন শোনা যাবে।

দোলাবৌদি, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না, লিখতে পারব না আমার মেমসাহেবের সবকিছু। জানাতে পারব না আমার মনের ভাব, ভাষা, অনুভূতি। পৃথিবীর কত দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি, কত অসংখ্য উৎসবে কত অগণিত মেয়ে দেখেছি। তাদের অনেককে কাছে পেয়েছি, নিবিড় করে দেখেছি। কতজনকে ভালও লেগেছে। কিন্তু একজনকেও পেলাম না যে আমার কাছে আমার মেমসাহেবের স্মৃতিকে ম্লান করে দিতে পারে।

তুমি তো জান আমি বাচবিচার না করেই সবার সঙ্গে মেলামেশা করি। সমাজ সংসারের নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করেই মিশেছি অনেক মেয়ের সঙ্গে। রক্তকরবীর মত তাঁদের অনেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনেকের রূপ-যৌবন লাবণ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে, শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শ ভাল লেগেছে কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আমার প্রাণের মন্দিরে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিনি। হেসেছি, খেলেছি, ঘুরেছি অনেক মেয়ের সঙ্গে। আমার এই হাসি-খেলা নিয়ে তুমি হয়ত অনেকের কাছে অনেক কাহিনী শুনবে। দিল্লী ইউনিভার্সিটির বনানী রায়কে নিয়ে আজো ডিফেন্স কলোনীর অনেক ড্রইংরুমে আমার অসাক্ষাতে সরস আলোচনা হয়, আমি তা জানি। আমি জানি আমাদের লণ্ডন হাই কমিশনের থার্ড সেক্রেটারী অতসীকে নিয়ে আমার ব্রাইটন ভ্রমণকে কেন্দ্র করে অনেক আরব্য উপন্যাসের কাহিনী বিলেত থেকে কলকাতার কফি হাউস পর্যন্ত গড়িয়েছে।

আমি কি করব বল? আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থাই এমন

যে স্বামী-স্ত্রীর একটু স্বাধীন আচরণ আজও বহুজনে বরদাস্ত করতে পারেন না। সমাজ অনেক এগিয়েছে। সারা পৃথিবীর বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে আমরা অনেকেই মেলামেশা করছি কিন্তু রক্তের মধ্যে আজও অতীত দিনের সংস্কারের বীজ হয়ে গেছে। তাইতো ভাটপাড়ার কূপমণ্ডুক সমাজ থেকে হাজার মাইল দূরে বসেও দিল্লীর সফিসটিকেটেড বাঙালী গৃহিণীরা বনানীকে দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেলে দেখলে আলোচনা না করে থাকতে পারেন না।

একটু কান পাতলে শোনা যাবে মিসেস দত্ত বলছেন, এই চন্দ্রিমা ছাখ, ছাখ, বনানী এসেছে।

'কই? কই?'

'ঐ তো।'

'একলা?'

'তাইতো দেখছি।'

চন্দ্রিমা একটু এদিক ওদিক দেখে বলে, ঐ তো সাদা হেরল্ড! রিপোর্টার সাহেব নিশ্চয়ই এসেছে।

বলাকা সরকারও প্রায় ছুটে চলে আসে। চন্দ্রিমার কানে কানে বলে, দেখেছিস, মিসেস রিপোর্টার এসেছে।

'অনেকক্ষণ দেখেছি?'

বনানী এগিয়ে যায় প্রতিমার কাছে। হাত জোড় করে প্রণাম করে। ইতিমধ্যে আমি পাশে এসে দাঁড়াই। বনানী গাড়িতে পার্সটা রেখে এসেছে; আমার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে প্রণামী দেয়।

বলাকা, চন্দ্রিমা, মিসেস দত্ত ও আরো অনেকে তা দেখেন। আরো অনেক নবীনা প্রবীণা দেখেন আমাদের।

বলাকা বলে, যাই বলিস ভাই, দুজনকে বেশ ম্যাচ করে কিন্তু!

মিসেস দত্ত বলেন, ম্যাচ করলে কি হবে! ওরা তো আর বিয়ে করছে না, শুধু খেলা করছে।

চন্দ্রিমা বলে, না, না। নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। তা নাহলে দুজনে মিলে এমন করে ঘোরাঘুরি করে।

আমরা দুজনে প্যাণ্ডেল থেকে বেরুবার জন্য এগিয়ে চলি। বনানীর সাইড-ভিউ বোধহয় বলাকার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তাইতো চন্দ্রিমাকে ফিসফিস করে বলে, যাই বলিস, সী হ্যাজ এ ভেরী অ্যাট্রাক্‌টিভ ফিগার?

বনানীর প্রশংসায় মিসেস দত্ত মুহূর্তের জন্য নিজের ফিগার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়েন। শাড়ীর আঁচলটা আর একটু বেশী নিবিড় করে জড়িয়ে নেন। মনে মনে বোধহয় একটু ঈর্ষাও দেখা দেয়। তাইতো বনানীকে ছোট করার জন্য আমাকে একটু বেশী মর্যাদা দেন। বলেন, রিপোর্টারও তো কম হ্যাণ্ডসাম নয়।

দূরে এক পুরোন বন্ধুকে দেখে বনানী নজর না করেই ডান দিকে ঘুরতে গিয়ে এক ভদ্রলোককে প্রায় ধাক্কা দিতে গিয়েছিল। আমি ওর হাত ধরে চট করে টেনে নিলাম।

বনানী শুধু বলল, থ্যাঙ্কস্।

সান-গ্লাসের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিটা একটু ঐ কোণার দিকে নিতেই বেশ বুঝতে পারলাম বনানীর হাত ধরার জন্যে অনেকের হার্ট অ্যাটাক্ হতে হতে হয় নি।

এসব আমি জানি। কি করি বল? সবার সঙ্গে আমি মিশতে পারি না। কিন্তু যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি, তাদের সবার সঙ্গেই এমনি সহজ, সরল, স্বাভাবিকভাবেই মিশে থাকি। বনানী, অতসী ও আরো অনেকেই একথা জানে। মেমসাহেব তো জানেই।

এই যে অতসী! যাঁরা জানেন না তাঁরা কত কি কল্পনা করেন আমাদের দুজনকে নিয়ে।

তুমি কি অতসীর কথা শুনেছ? ও যে জাস্টিস রায়ের একমাত্র কন্যা সে কথা নিশ্চয়ই জান। তারপর ওর মা হচ্ছেন অভারতীয়, আইরিশ মহিলা। সুতরাং সংস্কারের বালাই নেই, নেই অর্থের

অভাব। লেখাপড়া শিখেছে পাবলিক স্কুলে, পরে বি-এ পাশ করেছে অক্সফোর্ড থেকে। এখন তো ফরেন সার্ভিসে।

অতসী যখন অক্সফোর্ডে পড়ে তখনই আমার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়। তার পরের বছর ও যখন দেশে ফেরে, তখন আমিও ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরছি। একই প্লেনে দুজনে লণ্ডন থেকে রওনা হই। পথে দুদিন বেইরুটে ছিলাম।

সেই দুটি দিন আমরা প্রাণভরে আড্ডা দিয়েছি। দিনের বেলায় বীচ্এ বসে, সন্ধ্যার পর সেণ্ট জর্জ হোটেলের বার বা লাউঞ্জে বসে একটু আধটু ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খেতে খেতে গল্প করেছি। দিল্লী রওনা হবার ঠিক আগের দিন গভীর রাত্রে অতসীর মাথায় ভূত চাপল। বলল, চলুন, নাইট ক্লাব ঘুরে আসি।

'এত রাত্রে?'

'হায়াটস্ রঙ ইন্ দ্যাট্?'

'কাল সকালেই তো আবার রওনা হতে হবে। তাই আর কি!'

'নাইট ক্লাবগুলো তো গভর্নমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার অফিস নয় যে দশটা-পাঁচটায় খোলা থাকবে! নাইট ক্লাব তো রাত্রেই খোলা থাকে।'

অতসী আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে রাজী নয় বলে, 'কাম অন। ফিনিশ ইওর গ্লাস।'

চক্ষের নিমেষে বাকি শ্যাম্পেনটুকু গলা দিয়ে ঢেলে দিল অন্তরের অজানা গহ্বরে। ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে আমিও শেষ করে উঠলাম। চলে গেলাম 'ব্লাক এলিফ্যাণ্ট'!

পালামে মেমসাহেব এসেছিল আমাদের রিসিভ করতে। অতসী ওকে কি বলেছিল জান? বলেছিল, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর একজন জার্নালিস্ট যে এত কনজারভেটিভ হয়, তা আমি ভাবতে পারিনি।

মেমসাহেব একটু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কেন কি হয়েছিল?

'মাই গড! কি হয় নি তাই জিজ্ঞাসা কর। অতসী রায়ের ইনভিটেশনে নাইট ক্লাবে যেতে চায় না!'

মেমসাহেব হাসতে হাসতেই একবার আমাকে দেখে নেয়। অতসী বলে, তুমি আর হাসবে না! যে অতসী রায়ের সঙ্গে লণ্ডনের ছোকরা ব্যারিস্টাররা এক কাপ কফি খেতে পেলে ধন্য হয়, সেই আমার সঙ্গে বেইরুটের 'ব্ল্যাক এলিফ্যাণ্টে' বসে শ্যাম্পেন খেতে দ্বিধা করে তোমায় এই অপদার্থ প্রসপেকটিভ্ গার্ডিয়ান!

মেমসাহেব বাঁকা চোখে এক ঝলক আমাকে দেখে নিয়ে বলে, আই অ্যাম সরি অতসী। আই প্লীড গিল্টি……

মেমসাহেবের গাল টিপে দিয়ে অতসী বলে, অত ভালবেসো না। ছোকরাটার মাথাটা খেলে!

যাই হোক সেবার ঢাকা থেকে লণ্ডন যাবার পথে প্রথমে কলকাতা, পরে দিল্লী এলো। কলকাতা থেকে সে যে মেমসাহেবকে নিয়ে এসেছে, তা জানতাম না। দিল্লী আসার খবরটাও আগে পাইনি। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় অতসীর টেলিফোন পেয়ে চম্‌কে গেলাম।

'কি আশ্চর্য! আসার আগে একটা খবর দিলে না?'

অতসী দুঃখ প্রকাশ করে, ক্ষমা চায়। শেষে একবার জরুরী কারণে তক্ষুনি হোটেলে তলব করে।

আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লারিজে হাজির হই। দোতলায় উঠে করিডর দিয়ে একেবারে কোণার দিকে চলে যাই। দরজা নক্ করি।

কোন জবাব পেলাম না। আবার নক্ করলাম।

এবার উত্তর পাই, যাস্ট এ মিনিট।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই অতসী দরজা খুলে অভ্যর্থনা করে। আদর করে ভিতরে নিয়ে যায়।

'কি ব্যাপার ? এবার যে একটা খবরও দিলে না ?'

'বিলিভ মী, ইট অল হ্যাপেনড সাডেন্‌লী। তাছাড়া কলকাতা থেকে বুকিং করতেই বড্ড ঝামালা পোহাতে হলো।'

'কদিন কলকাতায় ছিলে ?'

'তিন দিন।'

'ডিড ইউ মীট মেমসাহেব ?'

'মাই গড! মেমসাহেব ছাড়া কি কোন চিন্তা নেই আপনার মনে ?'

'নিশ্চয়ই আছে। তবে আফটার মেমসাহেব।'

হাত দিয়ে আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে অতসী জানতে চায়, আমিও তাই ?

'তুমি তো অন্য ক্যাটাগরীর।'

অতসী কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। বলে, কেন, আমি কি আপনার মেমসাহেবের জায়গায়···

আমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। শুধু বলি, অতসী আমার অনেক কাজ আছে। এখন চলি, পরে দেখা হবে।

অতসী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। দু'হাত দিয়ে আমার দুটো হাত চেপে ধরে। বলে, না, তা হবে না। আপনি এখন আমার কাছেই থাকবেন।

আমি অবাক হয়ে যাই। ভেবে কূলকিনারা পাই না অতসীর এই বিচিত্র পরিবর্তনের কারণ। মুহূর্তের মধ্যে নারী-চরিত্রের বিচিত্র-ধারার নানা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে নিলাম। ভাবলাম, মনের টান, না দেহের দাবী ? বড়লোকের মেয়ের খামখেয়ালি নাকি···

অতসীকে নিয়ে আমার অত শত চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম না। যা ইচ্ছে তাই হোক। আমি ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়লেই হলো।

আরো একটু চিন্তা করি। ডিপ্লোম্যাট হয়ে ডিপ্লোম্যাসী করছে না তো?

আমি বললাম, অতসী, ঘোড়ার গাড়ির একটা কোচোয়ানের হাতে ইম্‌পালা দিয়ে খেলা করতে তোমার ভয় হচ্ছে না?

'ওসব হেঁয়ালি ছাড়ুন। আই অ্যাম ফিলিং লোনলি, উড ইউ গিভ মী কম্পানী অর নট?'

'হোয়াই নট হ্যাভ বেটার কম্পানী?'

'আমার খুশী।'

'কিন্তু আমার তো খুশী নাও হতে পারে?'

এক ঝলক অতসীকে দেখে নিলাম। দু'হাত দিয়ে অতসীর ডান হাতটা টেনে নিয়ে হ্যাণ্ডসেক করে বললাম, গুড বাই।

আমি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে কানে ভেসে এলো, শোন।

থমকে দাঁড়ালাম কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে যাবার ভয়ে পিছন ফিরলাম না। মনের ভুল?

'শোন'।

আমার জীবন-রাগিণীর সুরকারের ঐ কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার শোনার পর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। পিছন ফিরলাম।

কি আশ্চর্য! মেমসাহেব!

অতসীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসতে হাসতে মেমসাহেব ডাক দিল, এই শোন।...

আমি প্রায় দৌড়ে গেলাম। মেমসাহেব আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, তুমি!

সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, মিষ্টি গলায় মেমসাহেব বলল, কি করব বল, অতসী জোর করে নিয়ে এলো।

তুমি বেশ কল্পনা করতে পারছ তারপর ক্লারিজ হোটেলের ঐ কোণার ঘরে কি কাণ্ড হলো! প্রথম আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমি অতসীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, টেল মী অতসী হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

অতসী বলল, বেশী কিছু চাইব না। শুধু অনুরোধ করব আগামী সাত দিন এদিকে এসে দুটি যুবতীকে বিরক্ত করবেন না।

'প্রতিজ্ঞা করছি বিরক্ত করব না, তবে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য, সুখী করার জন্য নিশ্চয়ই আসব।'

মেমসাহেব টিপ্পনী কেটে বলল, অতসী ওসব কল্পনাও করিস না। পুরুষদের যদি অত সংযম থাকত তাহলে পৃথিবীটা সত্যি পাল্টে যেত।

আমি মেমসাহেবকে বলি, বিশ্বামিত্রের মত কাজকর্ম নিয়ে আমি তো বেশ ধ্যানমগ্ন ছিলাম কিন্তু তুমি মেনকা দেবী এক হাজার মাইল দূরে নাচতে এলে কেন?

তারপর ঐ ঘরে বসেই তিনজনে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম। মেমসাহেব বলল, জান, অতসীর সঙ্গে আমার কি বাজী হয়েছে?

'কি?'

অতসী বলে, না, না, কিছু না।

আমি বলি, থাক মেমসাহেব, এখন বলো না। অতসী ঘাবড়ে গেছে।

অতসী কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে বলল, তাহলে আমিই বলি শুনুন, বাজী হয়েছিল যে আমি যদি আপনাকে ভোলাতে পারি তাহলে কাজলদি আমাকে একটা শাড়ী প্রেজেণ্ট করবে। আর আমি হেরে গেলে আমি কাজলদিকে একটা শাড়ী প্রেজেণ্ট করব।

এতক্ষণে বুঝলাম অসতী কেন আমার সঙ্গে অভিনয় করেছিল।

আমি বললাম, অসতী তোমার কাজলদিকে তোমার শাড়ী

কিনে দিতে হবে না। তুমি যে তোমার কাজলদিকে টেনে আনতে পেরেছ, সেজন্য তুমিই তো প্রথমে শাড়ী পাবে।

আমি দুজনকেই শাড়ী কিনে দিয়েছিলাম। দুজনেই খুশী হয়েছিল। আমিও খুশী হয়েছিলাম। একটা সপ্তাহ যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

অতসী আমাদের দুজনকে সত্যি ভালবাসে। ও মেমসাহেবকে কাজলদি বলে কেন জান? অতসী বলত মেমসাহেবের চোখ দুটিতে স্বয়ং ভগবান সযত্নে কাজল মাখিয়ে দিয়েছেন। সেজন্যই অতসী মেমসাহেবকে কাজলদি বলত। ভারী চমৎকার নাম, তাই না?

যাই হোক এদের আমি ভালবাসি, আমি এদের কল্যাণ কামনা করি। ওরাও আমার মঙ্গল কামনা করে। আমি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু মেমসাহেবের স্মৃতিকে ম্লান করতে পারে না কেউ। পারবে কেন বল? আমার ভবিষ্যতের জন্য মেমসাহেব যে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল, তার কি কোন তুলনা হয়? হয় না।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। আমার জীবনের সেই অমাবস্যার রাতে শুধু মেমসাহেবই এসেছিল আমার পাশে। প্রেম দিয়েছিল, ভালবাসা দিয়েছিল, অভয় দিয়েছিল আমাকে। নিজের প্রাণের প্রদীপের মঙ্গল-আলো দিয়ে আমাকে সেই তিমির রাত্রি থেকে প্রভাতের দ্বারদেশে এনে দিয়েছে আমার সেই মেমসাহেব। তাইতো তার সে স্মৃতিকে ম্লান করার ক্ষমতা শত সহস্র বনানী বা অতসীর নেই।

সেবার বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর মেমসাহেব আমাকে বলল, তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে নতুন কিছু ভাবনি?

'ভেবেছি বৈকি।'

'কি ভেবেছ?'

'ভেবেছি যে কলকাতার মায়া কাটিয়ে একটু বাইরে চেষ্টা করব।'

'তবে করছ না কেন?'

'কিছু অসুবিধা আছে বলে।'

মেমসাহেব ছাড়ার পাত্রী নয়। তাছাড়া আমার জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকা আজ আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাইতো একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মেমসাহেব আমার হাতে হু'শো টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, একবার দিল্লী বা বোম্বে থেকে ঘুরে এসো। হয়ত একটা কিছু জুটেও যেতে পারে।

প্রথমে টাকাটা নিতে বেশ সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম আমার কল্যাণই ওর কল্যাণ। সুতরাং আমার জন্য শুধু হু'শো টাকা কেন, আরো অনেক কিছু সে হাসি মুখে দিতে পারে। তাছাড়া আমার কল্যাণযজ্ঞে তার আহুতি প্রত্যাখ্যান করার সাহস আমার ছিল না। তবুও টাকাটা হাতে করে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ?

'না, কিছু না।'

'তবে এমন চুপ করে রইলে?'

'এমনি।'

মেমসাহেব আমার হাতটা টেনে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বলল, আমি বলব তুমি কি ভাবছ?

'বলো।'

'সত্যি বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার টাকা নিতে তোমার লজ্জা করছে, অপমানবোধ হচ্ছে। তাই না?'

'না, না, তা কেন হবে।' আমি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

মেয়েদের মন আমাদের চাইতে অনেক সতর্ক, অনেক হুঁশিয়ার। মেমসাহেব বলে, স্বীকার করতে লজ্জা করছে?

আমি কোন উত্তর দিই না। চুপ করেই বসে থাকি। মেমসাহেবও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

মেমসাহেব আবার শুরু করে, তুমি এখনও আমাকে ঠিক আপন বলে ভাবতে পার না, তাই না?

আমি তাড়াতাড়ি মেমসাহেবের কাছে এগিয়ে যাই। ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলি, ছি ছি, মেমসাহেব, ওকথা কেন বলছ?

একটু থামি।

আবার বলি, তোমার চাইতে আপন করে আর কাউকেই তো পাইনি।

'আপন ভাবলে আজ তোমার মনে এই দ্বিধা আসত না।'

আমি আরো কিছু সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু একটু পরে খেয়াল করলাম মেমসাহেবের চোখে জল।

তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। একটু আদরও করলাম। শেষে ওর ফোলা ফোলা গাল দুটো চেপে বললাম, পাগলী কোথাকার।

মেমসাহেব আমার কোলের মধ্যে শুয়ে রইল কিন্তু তবুও স্বাভাবিক হতে পারল না। কিছু পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, তোমার এত কাছে এসেও তোমাকে পাব না, তা কল্পনা করতে পারিনি।

'লক্ষ্মীটি মেমসাহেব আমার! তুমি দুঃখ করো না।'

মেমসাহেব উঠে বসল। একটু স্থির দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। মুহূর্তের জন্য চিন্তার সাগরে ডুব দিয়ে কোথায় যেন তলিয়ে গেল। তারপর বলল, আমাদের জীবনে সংস্কারের একটা বিরাট ভূমিকা আছে, তাই না?

'হঠাৎ একথা বলছ?'

ঠোঁটের কোণে একটু বিদ্রূপের হাসি এনে মেমসাহেব বলে, অপরিচিত দুটি ছেলে-মেয়েকে কলাতলায় বসিয়ে একটু মন্ত্র পড়ালেই তারা কত আপন হয়। ঐ সংস্কারটুকু ছাড়া যত কাছেই আসুক না কেন, দুটি ছেলেমেয়ে ঠিক আপন হতে পারে না।

তারপর আমার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করে, তাই না?

'তুমি আমাকে সন্দেহ করছ? আমাকে অপমান করছ?'

'ছি, ছি, তোমাকে অপমান করব? শুধু বলছিলাম যে আমি যদি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী হতাম তাহলে আমার গয়না বিক্রী করে তোমার মদ্যপান বা যত্রতত্র গমনের অধিকার থাকত, কিন্তু··· ।'

আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখটা চেপে ধরে বলি, আর বলো না। মন্ত্র না পড়লেও তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী।

মেমসাহেব আমার বুকের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। একটু পরে গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

চাঁদটা হঠাৎ একটু মেঘে ঢাকা পড়ল। আর সেই অন্ধকারের সুযোগে আমি—।

মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে দাবড় দিয়ে বলল, আবার অসভ্যতা!

হেস্টিংস থেকে এগিয়ে এসে আউট্রাম ঘাটের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা আবার মিশে গেলাম নগর কলকাতার জনসমুদ্রে।

কিন্তু জান দোলাবৌদি, সে রাত্রে আনন্দে আর আত্মতৃপ্তিতে ঘুমুতে পারিনি। তোমার জীবনেও তো এমনি দিন এসেছিল। এবার কলকাতা গেলে সেদিনের কাহিনী না শোনালে তোমার মুক্তি নেই।

তুমি তো জান জীবনের এক একটা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষেরও এক একটা রূপ, চরিত্র দেখা দেয়। যে ছেলেমেয়েরা রাত ন'টার পর ঘুমে ঢুলতে থাকে, পরীক্ষার আগে তারাই নির্বিবাদ রাত দেড়টা-দুটো অবধি পড়াশুনা করে। বিয়ের আগে যে মেয়েরা রাত জাগতে পারে না, শুনেছি বিয়ের পর তারা নাকি ঘুমুতেই চায় না। তাই না? কেন সন্তানের মা হবার পর? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও মায়ের দল জেগে থাকেন। দেহটা ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু মন? অতন্দ্র প্রহরীর মত সারা রাত সে সন্তানকে পাহারা দেয়। সামান্য কটি মাসের ব্যবধানে কিভাবে একটা প্রমত্তা কুমারী শান্ত, স্নিগ্ধা কল্যাণী জননী হয় সে কথা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে।

মানুষের চরিত্রের আরো কত বিচিত্র পরিবর্তন হয়। সে পরিবর্তনের ফিরিস্তি দিতে গেলে মানব-সভ্যতার একটা ছোটখাটো ইতিহাস লিখতে হবে। তাছাড়া মনুষ্য-চরিত্রের এসব মামুলি কথা তোমাকে লেখার কোন প্রয়োজনও নেই। সেদিন গঙ্গার ধারে মেমসাহেবের কথা শুনে আর চোখের জল দেখে আমারও এক আশ্চর্য পরিবর্তন হলো। ঘর-কুনো মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছেলে হয়ে কলকাতার ঐ গণ্ডিবদ্ধ জীবনের মধ্যে বেশ ছিলাম। মেমসাহেবের প্রেমের নেশায় নিজের কর্মজীবন সম্পর্কে বেশ উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম।

সেদিন অকস্মাৎ মেমসাহেবের ভালবাসার চাবুক খেয়ে আমি চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। ধুতি-পাঞ্জাবি আর কোলাপুরী চটি পরে জামাই সেজে মেমসাহেবের সঙ্গে প্রেম করলেই যে জীবনের সব কিছু প্রয়োজন মিটবে না, মিটতে পারে না সে কথা বোধ হয়

সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম। তাছাড়া আর একটা উপলব্ধি হলো আমার। মেমসাহেব আমাকে ভালবাসে, আমাকে প্রাণমন দিয়ে কামনা করে। সে জানে একদিন আমারই হাতে তার সিঁথিতে সীমন্তিনী সিঁদুর উঠবে, আমার দীর্ঘায়ু কামনায় হাতে শাঁখা পরবে ; সে জানত আরো অনেক কিছু। জানত, সে একদিন আমার সন্তানের জননী হয়ে সগর্বে পৃথিবীর সামনে দাঁড়াবে।

সারা দুনিয়ার সমস্ত মেয়ের মত সেও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল তার স্বামীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যৌবনের কালবৈশাখীর ধূলি ঝড়ে মেমসাহেবের স্বচ্ছ দৃষ্টি হারিয়ে যায় নি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবের মাটি ছেড়ে আরব্য উপন্যাসের অলীক অরণ্যে পালিয়ে যায় নি। তাইতো সে চেয়েছিল তার ভালবাসায় আমার জীবন ভরে উঠুক। সে চায় নি পৃথিবীর অসংখ্য কোটি কোটি স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ তালিকায় শুধুমাত্র আর দুটি নামের সংযোজন।

তাইতো সেদিন ফেরার পথে মেমসাহেব আমাকে অন্যমনস্ক দেখে ডাকল, শোন।

আমি নিরুত্তর রইলাম। মেমসাহেব আমার পাশে এসে হাতটা ধরে ডাকল, শোন।

'বল।'

'রাগ করেছ ?'

'রাগ করব কেন ?'

'আমাকে ছেড়ে তোমাকে বাইরে যেতে বললাম বলে।'

'না, না।'

আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম।

মেমসাহেব আবার শুরু করে, 'আমার সর্বস্ব কিছু দিয়েও যদি তোমার সত্যকার কল্যাণ করতে না পারি, তাহলে আমি কি করলাম বল।'

একটু থামে। আবার বলে, তুমি শুধু আমার স্বামী হবে,

শুধু আমিই তোমাকে মর্যাদা দেব, ভালবাসব, তা আমি চাই না। আমি চাই তুমি আমাদের দুজনের গণ্ডির বাইরেও অসংখ্য মানুষের ভালবাসা পাও, তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা পাও, তাঁদের আশীর্বাদ পাও।

আবার একটু থামে, একটু হাসে। তারপর ফিস ফিস করে বলে, কত মেয়ে তোমাকে চাইবে অথচ শুধু আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে পাবে না।

হাত দিয়ে আমার মুখটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাবতে পার, তখন আমার কি গর্ব, কি আনন্দ, কি আত্মতৃপ্তি হবে ?

কি উত্তর দেব ? আমি শুধু হাসি।

বাসায় ফিরে অনেক রাত অবধি অনেক কিছু ভাবলাম। পরের ক'টা দিন নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে নিজেও কিছু টাকা যোগাড় করলাম। বাইরের খবরের কাগজ সম্পর্কে কিছু কিছু খবরও জেনে নিলাম।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই আমি মাদ্রাজ মেলে চড়লাম। মেমসাহেব আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিল। বলল, আমার মনে হয় তোমার নিশ্চয়ই কিছু হবে। তবে না হলেও ঘাবড়ে যেও না। সারা দেশে তো কম কাগজ নেই। আরো দু-চার জায়গায় ঘোরাঘুরি করলে কোথাও না কোথাও চান্স পাবেই।

আমি নিরুত্তর রইলাম। সামনের লাল আলো, সবুজ হলো, গার্ড সাহেবের বাঁশি বেজে উঠল।

মেমসাহেব বলল, সাবধানে থেকো। যেখানে সেখানে যা তা খেও না।...চিঠি দিও।

আমি মুখে কিছু বললাম না। শুধু মেমসাহেবের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলাম।

মাদ্রাজ মেলের কামরায় বসে হঠাৎ পুরানো দিনের কথা মনে হলো।...

রবিবার সকাল। আটটা কি সাড়ে আটটা বাজে। ঘুম ভেঙে গেলেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে তখনো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। আমাদের সিনিয়র সাব-এডিটর শিবুদা এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই নির্বিবাদে চাদরটা টান মেরে বললেন, ছি, ছি, এখনও ঘুমুচ্ছিস ?

আমি বললাম, না, না, ঘুমুচ্ছি কোথায়। এমনি শুয়ে আছি।

শিবুদা উপদেশ দেন, এত বেলা অবধি ঘুমোলে কি জীবনে কিছু করা যায়।

তবে রে! আমি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ি। বলি, আচ্ছা শিবুদা, কর্পোরেশনের যেসব কর্মচারীরা শেষ রাত্তিতে উঠে গ্যাস-পোস্টের আলো নিবিয়ে বেড়ায় আর রাস্তায় জল দেয়, তাদের ভবিষ্যৎ কি খুব উজ্জ্বল ?

শিবুদা দাবড় দেয়, তুই বড্ড বাজে বকিস। এই জন্যই তোর কিছু হচ্ছে না।

'একটু আগে বললে, বেলা করে ঘুমুবার জন্য, এখন বলছ বেশী কথা বলার জন্য আমার কিছু···'

'আঃ তুই থামবি না শুধু শুধু তর্ক করবি ?'

উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে খোকার দোকান থেকে দু'কাপ চা নিয়ে শিবুদার সম্মুখে হাজির হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর শিবুদা, কি ব্যাপার ? হঠাৎ এই সাত-সকালে ?

শিবুদা নীল সুতোর লম্বা বিড়িটায় একটা টান মেরে সারা ঘরটা দুর্গন্ধে ভরিয়ে দিল। বলল, চল, 'একটা ইন্টারেস্টিং লোকের কাছে যাব।'

'কার কাছে ?'

'আগে চল না, তারপর দেখবি।'

শিবুদার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সুতরাং অযথা সময় নষ্ট না করে শিবুদার অনুসরণ করলাম। ট্রাম-বাসে উঠলাম, নামলাম। কবার মনে নেই, তবে দু-তিনবার তো হবেই। তারও পরে পদব্রজে

অলি-গলি দিয়ে বেশ খানিকটা। আর একটু এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই মহাপ্রস্থানের পথ পেতাম কিন্তু সেই মুহূর্তে শিবুদা বলল, দাঁড়া, দাঁড়া, আর এগিয়ে যাস না।

একটা ভাঙা পোড়োবাড়ির মধ্যে ঢুকেই শিবুদা হাঁক দিল, মধুদা!

উপরের বারান্দা থেকে একটা ছোট্ট মেয়ে জবাব দিল, শিবু-কাকু! বাবা উপরে।

আমরা সোজা তিনতলার চিলেকোঠায় উঠে গেলাম। মধুদাকে দেখেই বুঝলাম, তিনি জ্যোতিষী কিন্তু পেশায় ঠিক সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

মধুদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন শিবুদা।

মধুদা কাগজপত্র সরাতে সরাতে বললেন, এর মধ্যেই একটু কষ্ট করে বসুন ভাই।

বসলাম। শিবুদা-মধুদা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে শনি-মঙ্গল-রাহু-কেতু নিয়ে এমন আলোচনা করলেন যে, আমি তার এক বর্ণও বুঝলাম না।

ঘণ্টাখানেক পরে শিবুদার অনুরোধে মধুদা আমার জন্ম সন-তারিখ ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে নিয়ে চটপট একটা ছক তৈরি করে ফেললেন। একটু ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, বেশ ভাল।

শিবুদা প্রশ্ন করেন, ভাল মানে?

মধুদা মনে মনে হিসাব-নিকাশ করতে করতেই জবাব দেন, ভাল মানে ভাল; তবে বেশ কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

নাকে একটু নস্য দিয়ে কর গুনতে গুনতে বলেন, তাছাড়া একটু বিলম্বে উন্নতির যোগ।

শিবুদা ছকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলেন, হ্যাঁগো মধুদা, এর যে ত্রিকোণে মঙ্গল।

'তবে নবমে নয়, পঞ্চমে। তবুও বেশ ভাল ফল দেবে।'

মধুদা সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন। আজ সবকিছু মনে নেই। তবে ভুলিনি একটি কথা। বলেছিলেন, শুক্র স্থানটি বড় ভাল। কোন মহিলার সহায়তায় জীবনে উন্নতি হবে।

সেদিন কথাটি বিশ্বাস করিনি কিন্তু আজ মাদ্রাজ মেলের কামরায় বসে কথাটা মনে না করে পারলাম না। আগে কোন-দিন কল্পনা করতে পারিনি আমার জীবনের রুক্ষ প্রান্তর মেমসাহেবের স্রোতস্বিনী ধারায় ধন্য হবে। নাটক-নভেলে এসব সম্ভব হতে পারে কিন্তু আমার জীবনে ? নৈব নৈব চ।

মাদ্রাজ মেলের কামরায় বসে মনে হলো মেমসাহেবের স্বপ্ন, সাধনা, ভালবাসা নিশ্চয়ই একেবারে ব্যর্থ হতে পারে না। সত্যি আমার মাদ্রাজ যাওয়া ব্যর্থ হলো না। সাদার্ন একস্‌প্রেসের এডিটর বললেন, কাগজে স্পেসের বড় অভাব। কলকাতার স্পেশ্যাল স্টোরি ছাড়া কিছু ছাপার স্পেস পাওয়াই মুস্কিল। তাইতো কলকাতায় ঠিক ফুলটাইম লোকের দরকার নেই।

আমি মনে মনে দশ হাত তুলে ভগবানকে শতকোটি প্রণাম জানালাম। মাসে মাসে দেড়শ' টাকা। আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়লাম। দৌড়ে মাউন্ট রোড টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে মেমসাহেবকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করলাম, মিশন সাকসেস্‌ফুল রিমেমবারিং ইউ স্টপ স্টার্টিং টুমরো মাদ্রাজ-মেল।

হাওড়া স্টেশনে মেমসাহেব আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আর বেশী আড্ডা দেবে না। মন দিয়ে কাজ করবে।

'নিশ্চয়ই, তবে—'

বাঁকা চোখে মেমসাহেব বলে, তবে মানে ?

'সাত দিন পরে কলকাতা ফিরেই কাজ শুরু করবো ?'

'তবে কি করবে ?'

'একটা দিন অন্তত তোমাকে···'

মেমসাহেব হাসতে হাসতে বলে, এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা···

শুধু আমার নয়, মেমসাহেবেরও তো ইচ্ছা করে আমার কাছে আসতে, প্রাণভরে আমাকে আদর করতে। তাছাড়া এই কদিনের অদর্শনের জন্য তার মনের মধ্যে অনেক ভাব, ভাষা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। কলকাতার এই জেলখানার বাইরে একটু মুক্ত আকাশের তলায় আমাকে নিবিড় করে কাছে পাবার জন্য ওর মনটাও আনচান করছিল। ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল আমার নতুন জীবনের দ্বারদেশে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। তাইতো আমার কাছ থেকে একটু ইঙ্গিত পেয়েই বিনা প্রতিবাদে প্রস্তাবটি মেনে নিল।

'জানি তোমার মাথায় যখন একবার ভূত চেপেছে তখন কিছুতেই ছাড়বার পাত্র তুমি নও', মেমসাহেব মন্তব্য করে।

'তাই বুঝি,' আমি বলি। 'তোমার যেন কোন কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কোন কিছু নেই।'

একটি দিনের জন্য আমরা দুজনে আবার হারিয়ে গেলাম। কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের কেউ জানল না গঙ্গা যেখানে সাগরের দিকে উদ্দামবেগে ছুটে চলেছে, যেখানে সমস্ত সীমা অসীম হয়ে গেছে, বন্ধন যেখানে মুক্তি পেয়েছে, সেই কাকদ্বীপের অন্তবিহীন মহাশূন্যে আমাদের দুটি প্রাণবিন্দু বিলীন হয়ে গেল।

মেমসাহেব আমার বুকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে বলল, আমি জানি তুমি এমনি করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে।

'তুমি জান?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন করে জানলে?'

'খবরের কাগজ বলতে তুমি যে পাগল সে কথাটা কি আমি জানি না?' তারপর বেশ গর্ব করে মেমসাহেব বলল, খবরের কাগজকে না ভালবাসলে এমন পাগল কেউ হতে পারে না।

'তাতে কি হলো?'

'কিছু হয় নি', মেমসাহেব বোধ করি আর আমার প্রশংসা করা সমীচীন মনে করে না।

একটা দমকা ঝড়ো হাওয়া এলো। সামনের সমুদ্রমুখী ভাগীরথীর অনন্ত জলরাশি ফুলে ফুলে নাচানাচি শুরু করে। ভাগীরথী যেন আরো তেজে, আরো আনন্দে সমুদ্রের দিকে দৌড়াতে লাগল।

মেমসাহেব উঠে বসে বলে, এই শান্ত গঙ্গা হিমালয়ের কোল থেকে প্রায় হাজার দেড়েক মাইল চলবার পর সমুদ্রের কাছাকাছি এসে কত বিরাট, কত বেশী প্রাণচঞ্চল। মানুষও ঠিক এমনি। সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে বৃহত্তর জীবনের কাছে এলে মানুষ অনেক উদার, অনেক প্রাণচঞ্চল হয়। তাই না?

আমি চুপ করে থাকি। কোন কথা না বলে মেমসাহেবের উদার গভীর চোখ দুটোকে দেখি।

মেমসাহেব খোঁপাটা খুলে আমার কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে দেয়। সামনে বুকের পর দিয়ে তার দীর্ঘ অবিন্যস্ত বিনুনি লুটিয়ে পড়ে নীচে।

আমি বলি, আচ্ছা মেমসাহেব, তুমি তো আমার উন্নতির জন্য এত ভাবছ, এত করছ কিন্তু আমি তো তোমার জন্য কিছু করছি না।

'আমার জন্য আবার কি করবে? আমার জন্যই তো তুমি তোমাকে তৈরি করছ।'

'কিন্তু তবুও—'

'এতে কোন কিন্তু নেই। হাজার হোক আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীঘরের মেয়ে। যতই লেখাপড়া শিখি না কেন, স্বামী-পুত্র নিয়েই তো আমার ভবিষ্যৎ।'

মেমসাহেব থামে। দৃষ্টিটা তার চলে যায় দিগন্তের অন্তিম সীমানায়। মনটাও বোধহয় হারিয়ে যায় ভবিষ্যতের অজানা পথে। আমি বেশ বুঝতে পারি বর্তমান নিয়ে মেমসাহেব একটুও চিন্তা করে

না। তার সব চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা আগামী দিনগুলিকে নিয়ে।···সে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন ? না, না, স্বপ্ন কেন হবে ? সে স্থির ধারণা করে নিয়েছে চাকরি-বাকরি ছেড়েছুড়ে দিয়ে সে মনপ্রাণ দিয়ে শুধু সংসার করবে, আমাকে সুখী করবে, আমার কাজে সাহায্য করবে। তারপর ? তারপর, সে মা হবে।

ইদানীংকালে মেমসাহেব একবার নয়, বহুবার স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করার কথা বলল। ওর ছেলে কি করবে, মেয়ে কেমন হবে, সে-কথাও বলেছে বেশ কয়েকবার। শুনতে ভালই লাগে। প্রথমে সারা মন আনন্দে, আত্মতৃপ্তিতে ভরে যায়, কিন্তু একটু পরে কেমন যেন খটকা লাগে। হাজার হোক মানুষের জীবন তো! কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, কে বলতে পারে ? আমি বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছি, দেখেছি অনেক মানুষ অনেক রকম স্বপ্ন দেখে কিন্তু ক'জনের জীবনে সে স্বপ্ন সার্থক হয় ? তাইতো মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে পেয়ে আনন্দ পাই কিন্তু তার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনলে আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে।

সেদিন সমুদ্রগামী চঞ্চলা আত্মহারা ভাগীরথীর পাড়ে বসে মেমসাহেবের কাছে আবার স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার করার কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে ওর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললাম, তুমি কি জান তুমি স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখী হবেই ?

ঐ লম্বা ভ্রূ দুটো টান করে চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, নিশ্চয়ই।

'নিশ্চয়ই ?'

মেমসাহেবের ঠোঁটের কোণায় একটু বিদ্রূপের হাসি দেখা দেয়। বলে, কেন, তুমি কি আর কাউকে নিয়ে সুখী হবার কথা ভাবছ ?

'মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে কিন্তু তুমি কি ঘাড় থেকে নামবে ?'

'আমি তোমার ঘাড়ে চেপেছি, না তুমি আমার ঘাড়ে চেপেছ ?' একটু থামে, আবার বলে, 'আর কেউ এসে দেখুক না! মজা দেখিয়ে দেব।'

'তাই বুঝি ?'

'তবে কি ? তোমাকে পূজা করব ?'

'আগেকার দিনে পতিব্রতা স্ত্রীরা স্বামীকে সুখী করার জন্য বহু-বিবাহে কোন দিন আপত্তি করতেন না, তা জান ?'

'শুধু আগেকার দিনের কথা কেন বলছ ? আরও একটু এগিয়ে প্রাগৈতিহাসিক দিনে, যখন জঙ্গলে বাস করতে তখন তো তোমরা পুরুষেরা আরো অনেক কাণ্ড করতে। সুতরাং এখনও তাই কর না!'

একটু ঠাণ্ডা মিঠে হাওয়া বয়ে যায়। মেমসাহেব এক মুহূর্তে বদলে যায়। ছ'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বলে, আমি জানি তুমি আর কাউকে কোনদিন ভালবাসতে পারবে না।

'জান ?'

'একশ'বার, হাজার বার জানি।'

'কেমন করে জানলে ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'বুঝব না ?'

'তুমি যদি মেয়ে হতে তাহলে বুঝতে।'

'তার মানে ?'

'সন্তানের মনের কথা যেমন আমরা বুঝতে পারি, তেমনি স্বামীদের মনের কথাও আমরা জানতে পারি।'

দোলাবৌদি তুমি তো মেয়ে। তাই বুঝবে কত গভীরভাবে সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসলে এসব কথা বলা যায়।

সাদার্ন একস্‌প্রেসের কাজ শুরু করে দিলাম বেশ মন দিয়ে। মাঝে মাঝে মন চাইত ফাঁকি দিই, মেমসাহেবকে নিয়ে আড্ডা দিই,

স্ফূর্তি করি কিন্তু পারতাম না। ওকে ঠকাতে বড় কষ্ট হতো। যার সমস্ত জীবন-সাধনা আমাকে কেন্দ্র করে, যে আমার মঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিজের কল্যাণ দেখতে পায়, তাকে মুহূর্তের জন্যও বঞ্চনা করতে আমার সাহস বা সামর্থ্য হয় নি।

ঝড়ের বেগে না হলেও আমি বেশ নির্দিষ্টভাবে এগিয়ে চলেছিলাম। মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে পেয়ে আমি আমার জীবন-নদীর মোহনার কলরব শুনতে পেতাম।

মাস কয়েক পরে আমি আবার বাইরে বেরুলাম। এবার লক্ষ্ণৌ। কিছুকাল আগে ক্রনিকেলের এডিটরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং সে পরিচয়ের সূত্র ধরেই তার কাছে হাজির হলাম। বললেন, কলকাতার করসপণ্ডেন্টের দরকার নেই তবে সপ্তাহে একটা করে ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ লেটার ছাপতে পারি।

এডিটর মিঃ শ্রীবাস্তব খোলাখুলিভাবে জানালেন, বাট আই কাণ্ট পে ইউ মোর দ্যান ওয়ান হানড্রেড।

আমি বললাম, দ্যাটস অল রাইট। লেট আস মেক এ বিগিনিং।

আমার জীবনে এই পরম দিনগুলিতে মেমসাহেবকে স্মরণ না করে পারিনি। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে যেত। আকাশে কালো মেঘ দেখা দিলেই বৃষ্টিপাত হয় না। সে কালো মেঘে জলীয়বাষ্প থাকা প্রয়োজন। একটি ছেলের জীবনে একটি মেয়ের উদয় নতুন কিছু নয়। আমার জীবনেও হয়ত আরো কেউ আসত কিন্তু আমি স্থির জানি পৃথিবীর অন্য কোন মেয়েকে দিয়ে আমার কর্মজীবনের অচলায়তনকে বদলান সম্ভব হতো না।

তাছাড়া মেয়েরা একটু আদর পেতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়। একটু সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, একটু বৈশিষ্ট্য প্রায় সব মেয়েরাই কামনা করে। সেই সুখ, সেই স্বাচ্ছন্দ্য পাবার জন্য অপ্রয়োজন হলে কোন মেয়ে আত্মত্যাগ করবে? খুব সহজ সরল চিরাচরিত প্রথায়

মেমসাহেবের জীবনে এসব কিছুই আসতে পারত কিন্তু সে তা চায় নি। সে চেয়েছিল, নিজের প্রেম-ভালবাসা, দরদ-মাধুর্য-অনুপ্রেরণা দিয়ে নিম্নবিত্ত বাঙালীঘরের একটি পরাজিত যোদ্ধাকে আবার নূতন উদ্দীপনায় আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে তুলতে।

আমি জানতাম, আমার কর্মজীবনের এই সাময়িক সাফল্যের কোন স্থায়ী মূল্য নেই, নেই কোন ভবিষ্যৎ। কিন্তু তা হোক। এইসব ছোটখাটো অস্থায়ী সাফল্যের দ্বারা আমার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস আমি ফিরে পেলাম। নিজের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে একটু আস্থা এলো আমার মনে।

সর্বোপরি এ কথা আমি উপলব্ধি করলাম যে, শুধু কলকাতাকে কেন্দ্র না করেও আমার ভবিষ্যৎ সাংবাদিক জীবন এগিয়ে যেতে পারবে। বরং একবার মাতৃনাম স্মরণ করে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ রঙ্গমঞ্চে বেরিয়ে পড়লে ফল আরো ভাল হবে।

তুমি বেশ বুঝতে পারছ আমি কেন ও কার জন্য একদিন অকস্মাৎ কলকাতা ত্যাগ করে দিল্লী চলে এলাম। আজ আমার জীবন কত ব্যস্ত, কত বিস্তৃত। সাংবাদিক হয়েও সেই উত্তরে দার্জিলিং, পূর্বে গৌহাটি, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর ও পশ্চিমে চিত্তরঞ্জন-সিন্ধ্রীর মধ্যে আজ আমি বন্দী নই। বাংলাদেশকে আমি ভালবাসি। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আপনজন মনে করি কিন্তু সমস্যা-সঙ্কুল ও নিত্য নতুন চিন্তায় জর্জরিত হয়ে বাঁচবার কথা ভাবতে গেলে ভয় হয়। যদি আনন্দ করে বাঁচতে না পারলাম, যদি এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-মাধুর্য উপভোগ করতে না পারলাম, তবে শুধু পিতৃপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত মিউজিয়ামে জীবন কাটাবার মধ্যে মানসিক শান্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু স্বস্তি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না।

আজ যত সহজে এসব কথা লিখছি ব্যাপারটি তত সহজ নয়। যে পরিবারে জন্মেছি, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, কর্মজীবন শুরু

করেছি, সেখানকার সবকিছু সীমিত ছিল। আজ জীবিকার তাগিদে বহুজনকে বহুদিকে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে, কিন্তু সেদিন জীবিকার জন্য, জীবনধারণের জন্য আমার পক্ষে সোনার বাংলা ত্যাগ করা অত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন হাসিমুখেই হাওড়া স্টেশনে দিল্লী মেলে চড়েছিলাম।

এগারো

তুমিও জান, আমিও জানি, সবাই জানে মানুষের জীবনের গতিপথ ও গতিবেগের পরিবর্তন হয় মাঝে মাঝেই। আমার জীবনেও হয়েছে, হয়ত বা ভবিষ্যতেও হবে। আমার জীবনে মেমসাহেবের উদয় হবার আগে আমার জীবন এমন বিশ্রী ঢিমেতালে চলছিল যে, তা উল্লেখ করারই প্রয়োজন নেই। মেমসাহেবকে পাবার পর বেশ কিছুকাল এমন একটা অদ্ভুত নেশায় মশগুল ছিলাম যে, নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ বা প্রয়োজন বোধ করিনি।

কিন্তু তারপর মনের আকাশ থেকে অনিশ্চিয়তার মেঘ কেটে যাবার পর আমার জীবনে এক আশ্চর্য জোয়ার এলো। প্রথম প্রথম মুহূর্তের অদর্শন অসহ্য, অসম্ভব মনে হতো। মনে হতো বুঝিবা হারিয়ে গেল, বুঝিবা কিছু ঘটে গেল। আমার মত মেমসাহেবের মনেও এমনি অনেক অজানা আশঙ্কা আসত। পরে দু'জনে যখন দু'জনকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে পেলাম এবং সে পাওয়ার আনন্দে যখন সমস্ত মনটা মদির হয়ে গেল, তখন আস্তে আস্তে আজে-বাজে দুশ্চিন্তা বিদায় নিল।

মেমসাহেবের ঐ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে না পেলে, মেমসাহেবের বুকে কান পেতে ঐ পরিচিত স্পন্দন না শুনলে প্রথম

প্রথম মনে মনে বড়ই অস্বস্তি পেতাম। পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে ভালবাসার সেই প্রথম অধ্যায়ে মনটা বড়ই সংকীর্ণ হয়েছিল। শুধু মেমসাহেবকে কাছে পাওয়া ছাড়া যেন আর কোন চিন্তাই মনের মধ্যে স্থান পেত না। বিশ্ব-সংসারের আনন্দমেলায় আমাদের দু'জনকে ছাড়া আর কাউকে কল্পনা করতে পারতাম না। দুনিয়ার আর সবাইকে কেমন যেন ফালতু অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। জীবনের শুধু একটি দিক, একটি অঙ্গকেই সমগ্র জীবন ভেবেছিলাম। ধীরে ধীরে আমরা যত আপন হলাম, সঙ্গে সঙ্গে এইসব ভুল ধারণাও বিদায় নিল। তাছাড়া মেমসাহেবের ভালবাসা ক্রমে ক্রমে আমার সমগ্র জীবনকে, জীবনসত্তাকে আলিঙ্গন করল। শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত প্রিয়সঙ্গিনী নয়, শুধু যৌবনের আনন্দমেলার পার্শ্ববর্তিনী নয়, মেমসাহেব আমার সামগ্রিক জীবনের অংশীদার হলো।

তুমি তো জান আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধু জানতেন 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। আমাদের দেব-দেবীদের ইতিহাস পড়লে এক-একজনের শত শত সহস্র সহস্র সন্তানের জননী হবার কাহিনী জানা যায়। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র বা শত সন্তানের জননী হওয়ার কাহিনী অতীতের ইতিহাসের পাতায় বন্দী হয়েছে। কিন্তু তবুও স্বামীর শয্যা আর রান্নাঘরের মধ্যেই আমাদের নিরানব্বুই ভাগ নারীর জীবন সীমিত।

এই ত ইদানীংকালে কত ছেলেমেয়েকে ভালবাসতে দেখলাম, দেখলাম স্বপ্ন দেখতে। ভালবাসা পেয়ে অনেক মানুষের জীবনধারাই পাল্টে যায় সত্য কিন্তু আমার মেমসাহেব আমাকে শুধু পাল্টে দেয় নি, সে আমাকে নতুন জীবন দিল। আমাকে ভালবেসে সে অন্ধ হয় নি। রাত্রির অন্ধকারে আমার তপ্ত শয্যায় পলাতকার মত সে আশ্রয় চায় নি, চেয়েছিল আমার সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে কিছু-না-কিছু ভূমিকা গ্রহণ করতে।

পুরুষের জীবনে কর্মজীবনের চাইতে বড় কিছু আর হতে পারে না। কর্মজীবনে ব্যর্থতা, কর্মক্ষেত্রে পরাজয়, পুরুষের মৃত্যু সমান। কর্মজীবনে ব্যর্থ, পরাজিত, অপদস্থ পুরুষের জীবনে নারীর ভালবাসার কি মূল্য? কোথায় স্বীকৃতি? মেমসাহেব এই চরম বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেছিল। আমি কিন্তু প্রেমের ঘোরে মশগুল ছিলাম। অত শত ভাবনা-চিন্তা আমার ছিল না। মাদ্রাজ থেকে ঘুরে এসে নতুন কাজ বেশ মন দিয়ে করছি, কিছু টাকা-পয়সারও আমদানি হচ্ছে। আমার মনটা খুশীতে ভরে গেল। তাছাড়া কলকাতায় কল্কে না পেলেও সুদূর মাদ্রাজের একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় কাজ পাবার জন্য সরকারী ও সাংবাদিক মহলে আমার কিছুটা মর্যাদা বেড়ে গেল। মনে মনে বোধহয় আমি একটু অহঙ্কারীও হলাম। আবার একদিন মেমসাহেব আমার চৈতন্যে কষাঘাত করল, এবার আর কিছু ভাবছ?

'তোমার কথা—না, আমার কথা?'

মেমসাহেব চীৎকার করে ওঠে, আঃ! বাজে বকো না।

আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। 'তুমি রাগছ কেন?'

মেমসাহেব দুই হাঁটুর ওপর মুখখানা রেখে কি যেন ভাবছিল। আমার প্রশ্ন শোনা মাত্রই রাগ করে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

আমি ডাক দিলাম, মেমসাহেব।

জবাব এলো না।

আবার ডাকলাম, মেমসাহেব শোন না!

তবুও কোন জবাব এলো না। একটু চিন্তিত হলাম। একটু কাছে এগিয়ে গেলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, রাগ করছ কেন?

উত্তর এলো, একটু সরে বস। এটা তোমার নিজের ফ্ল্যাটের ড্রইংরুম নয়, কলকাতার ময়দান!

বুঝলাম আবহাওয়া খারাপ। ফোর্সল্যাণ্ড করলে আমার

প্লেনটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কোন মঙ্গল হবে না। তাই আবহাওয়ার উন্নতির আশায় আমি উপরে ঘুরপাক খেতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মেমসাহেব বলল, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন মানুষ যে এত নির্বিকার হতে পারে, তা তোমাকে দেখার আগে কল্পনা করতে পারিনি।

'হঠাৎ এ-কথা বলছ?'

'সে-কথা বুঝলে কি আমার কপালে কোন দুঃখ থাকত!'

'আজ তোমার মুড-টা খারাপ।'

'হ্যাঁ।' এবার আমার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বলে, বলব, কেন?

'বল না?'

'অপ্রিয় সত্য বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'সহ্য করতে পারবে?'

আমি বীরের মত উত্তর দিলাম, ও-ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়!

একটু ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হাসল মেমসাহেব। বললো, আজেবাজে বকতে লজ্জা করে না? কোথায় নিজেকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে—তা নয় শুধু······

'এইত সবে নতুন একটা কাজ শুরু করেছি। আবার নতুন কি করব?'

'তুমি কি করবে তুমি তা জান না?'

আমি সত্যি সত্যিই ভাবনায় পড়ি। ভেবে পাই না কি বলতে চায় ও। আমি ওর হাতটা চেপে ধরে বলি, লক্ষ্মী মেমসাহেব, ফ্রাঙ্কলি বল না কি বলতে চাইছ। রাগারাগি করে কি লাভ আছে?

মেমসাহেব বলে, এই নতুন কাজটা পাবার পর মনে হয় তুমি যেন আর কিছু চাও না। তাই না?

'নিশ্চয়ই চাই কিন্তু চাইলেই যে পাওয়া যায় না, সে-কথা তো তুমি জান।'

'শুধু মেমসাহেবের কথা ভাবলে জীবনে আর কোনদিন কোন কিছুই পেতে হবে না। নতুন কিছু পেতে হলে ঘুরতে হয়, লোক-জনের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়।'

ও-কথাটা ঠিকই বলেছিল। দৈনন্দিন কাজকর্ম করে বাকি সময়টুকু মেমসাহেবের জন্য গচ্ছিত ছিল।

মেমসাহেব আবার বলে, আমাকে তো অনেক পেয়েছ, প্রাণভরে পেয়েছ। এখন তো আমার পক্ষে আর কোন চুলোয় যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি চাইলেও কেউ আমাকে নেবে না। সুতরাং তুমি তো নিশ্চিন্ত। এবার তাই বলছিলাম, তুমি নির্ভয়ে নিজের কাজ করতে পার।

আমি নতুন কাজটা পেয়ে একটা ধাপ এগিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে থমকেও দাঁড়িয়েছিলাম। অন্ততঃ কিছুদিন নিশ্চিন্তে থাকবার বাসনা ছিল। মেমসাহেবের তা সহ্য হলো না। মেমসাহেব চাইল কর্মজীবনে যতদিন স্থিতি, মর্যাদা না আসবে, ততদিন বিশ্রাম করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

'কাগজে তো কত লোক কত আর্টিকেল, কত ফিচার, কত গল্প লেখে, তুমিও তো লিখলে পার।'

'কোনদিন তো ওসব লিখিনি। রিপোর্ট লেখা ছাড়া আর কিছুই তো লেখার সুযোগ আসে নি।'

'সুযোগ আসে না, সুযোগ করে নিতে হয়।'

তোমাকে তো আগেই লিখেছি ও আমার মত বেশী বক বক করত না। অল্প অল্প কথা দিয়েই মেমসাহেবের মনের ভাব বেরিয়ে আসত।

দোলাবৌদি, আজকাল একদল ডাক্তার যেমন পেটেণ্ট ওষুধ, ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, ইনজেকশন দিয়েই সমস্ত চিকিৎসা করে, তেমনি খবরের কাগজের প্রায় সব রিপোর্টাররাই বাঁধাধরা গদে রিপোর্ট লিখতে পারে। রোগীর জন্য একটা মিক্শচারের প্রেস্ক্রিপশন

করতে হলে ডাক্তারবাবুর মস্তিষ্কের ব্যায়াম করতে হয়। মামুলি খবরের কাগজের রিপোর্ট লেখার বাইরে কিছু লিখতে গেলেও রিপোর্টারবাবুদের কিছু কেরামতি থাকা দরকার। আমার সে কেরামতি কোনকালেই ছিল না, আজও নেই। কিন্তু ঠেলার নাম বাবাজী। মেমসাহেবের চোখের জল, দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ্য করা অসম্ভব বলেই আমি বাধ্য হয়ে কলম নিয়ে কেরামতি শুরু করলাম।

আমার সে কি ছুর্দিন, তুমি তা কল্পনা করতে পারবে না। কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই বুক ফেটে কান্না আসত; তবুও থামতে পারতাম না। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি সবকিছু সম্ভব? আমার পক্ষেও সম্ভব হলো না।

শেষকালে কি করলাম জান? প্রবন্ধ লেখা শুরু করলাম। কিছু বইপত্তর আর ম্যাগাজিন পড়ে প্রবন্ধ লেখা চালু করলাম। এ-কাজে নিজের বিছার প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল কিছুটা বুদ্ধির। আস্তে আস্তে সেগুলো ছাপা হতে লাগল, কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তিও ঘটত।

একদিন মেমসাহেবকে বললাম, দেখছ কেমন সুন্দর ঠকিয়ে রোজগার করছি।

'নিজের বিছা-বুদ্ধি দিয়ে রোজগার করাকে ঠকান বলে না।'

'তাই বুঝি?'

মেম সাহেব সেদিন বলেছিল, রাম নাম জপ করে যাও। অতশত ভাবতে হবে না, হয়ত একদিন ডাকতে ডাকতেই ভগবানের দেখা পেয়ে যাবে।

মেমসাহেবের পাল্লায় পড়ে সেই যে আমি কলম নিয়ে রাম নাম জপ শুরু করেছি, আজও তা থামাতে পারিনি। বিধাতার বিচিত্র খেয়ালে মেমসাহেব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। জানি ও হয়ত আমার লেখা পড়তে পায় না বা পারে না। মাঝে মাঝেই মনে হয় কার জন্য লিখব? কিসের জন্য লিখব? ভগবানের কৃপা হলে

পঙ্গুও উত্তুঙ্গ গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। আমি ভগবানের কৃপা লাভ করিনি, ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই করব না। জীবনে যা-কিছু পেয়েছি, যা-কিছু করেছি, তা সবই ঐ পোড়াকপালীর জন্য। ভালবাসা দিয়ে মেয়েটা আমাকে পাগল করে দিয়েছে এবং সেই পাগলামি করতে করতে আমি আমার জীবনটাকে নিয়ে জুয়া খেলেছি। স্বাভাবিক অবস্থায়, সুস্থ মস্তিষ্কে কোন মানুষ আমার মত জীবনটাকে নিয়ে এমন খেলা করতে সাহস পাবে না। আমি পেরেছি, আজও কিছু কিছু পারছি কিন্তু আগামীকাল থেকে আর পারব না। পারব কেমন করে বল? ঐ পোড়াকপালী আমাকে গাছে চড়িয়ে দিয়ে মইটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ডালে ডালে, পাতায় পাতায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কত কাল? সব-কিছুরই তো একটা সীমা আছে।···

কি লিখতে গিয়ে কি লিখে ফেললাম। মেমসাহেবের কথা লিখতে গেলে আমার মাথাটা ঘুরে উঠে, বুদ্ধিভ্রংশ হয়। উচিত-অনুচিত বিচার করতে পারি না। জীবনে কোনদিন ভাবিনি মেমসাহেবের কথা লিখব। কিন্তু অবস্থার দুর্বিপাকে তোমাকে বাধ্য হয়েই লিখছি। আর কাউকে এসব নিশ্চয়ই লিখতাম না। তবে কি জান, চিঠিগুলো লিখে মনটা অনেক হাল্কা হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে। ডাক্তারবাবুরা যেমন নিজেদের প্রিয় স্ত্রী-পুত্রের চিকিৎসা করতে সঙ্কোচবোধ করেন, আমিও তেমনি আমার মেমসাহেবের কথা লিখতে ভয় পাচ্ছি। ভাব দিয়ে ভাষা দিয়ে, মেমসাহেবের প্রতি সুবিচার করা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। রাগ, অভিমান, ভালবাসার মধ্য দিয়ে ও যে কি আশ্চর্যভাবে আমার জীবন-নৌকায় পাল তুলে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তা ঠিক করে বলা বা লেখার ক্ষমতা আমার নেই।

খবরের কাগজের রিপোর্টারি করার একটা নেশা আছে। সে নেশা প্রতিদিনের। একদিনের উত্তেজনা, নেশা কাটতে না কাটতেই

নতুন উত্তেজনার জোয়ার আসে রিপোর্টারদের জীবনে। তাছাড়া সে উত্তেজনার বৈচিত্র্য রিপোর্টারদের আরো বেশী মাতাল করে তোলে। সেই উত্তেজনার ঘোরেই অধিকাংশ রিপোর্টারদের জীবন কেটে যায়। ইচ্ছা বা ক্ষমতা থাকলেও বিশেষ কিছু করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয় না। মেমসাহেব চায় নি আমার জীবনটা শুধু এমনি অহেতুক উত্তেজনায় ভরে থাকুক। সে চেয়েছিল আমার কর্মক্ষেত্রকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করতে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মেমসাহেব আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বললে, অত দূরে দূরে যাচ্ছ কেন?

'এটা তো তোমার ড্রইংরুম নয়...'

মেমসাহেব প্রায় বিদ্যুৎবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা গাছের আড়ালে নিয়ে গেল। দু' হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি রাগ করেছ?

'পাগল! রাগ করব কেন?'

'খুব বেশী রাগ করেছ, তাই না?'

'বিন্দুমাত্র রাগ করিনি। ভাল চাকরি পেতে হলে ইউ. পি. এস. সি'র পরীক্ষা দিতে হয়, পাশ করতে হয়; তেমনি তোমাকে পেতে হলেও তো আমাকে কিছু কিছু পরীক্ষা দিতে হবে, পাশ করতে হবে...'

ও হাত ধরে আমার মুখটা চেপে ধরে বলে, বাজে কথা বলো না।

'বাজে না মেমসাহেব। ইচ্ছা করলে আমার চাইতে অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত কাউকে তুমি তোমার জীবনে পেতে পারতে কিন্তু একবার যখন আমার খেয়াঘাটে পিছলে পড়ে গেছ, তখন আমাকেই তৈরি করার চেষ্টা করছ।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মেমসাহেব বললো, তোমার মনটা আজ বিক্ষিপ্ত। তাই আজ বলব না, দু'চারদিন পরে বলব।

'পরে কেন ? আজই বল।'

'আজ বললে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'তোমার ওপর রাগ করতে পারি কিন্তু অবিশ্বাস কোনদিন করব না।'

'ঠিক ?'

'ঠিক।'

মেমসাহেব আমার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের মাথার উপর দিয়ে বলে, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল তুমি অবিশ্বাস করবে না।

অত রাগ, অত দুঃখ, অত অভিমানের মধ্যেও আমার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, সত্যি বলছি তোমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করব না।

দুজনে একটু এগিয়ে একটু ছায়ায় বসলাম। মেমসাহেব বললো, কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত অন্য কোন ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারত, হয়ত সে তোমার চেয়ে ঢের ঢের বেশী রোজগার করত কিন্তু আমার মনে হয় অত সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের হৃদয়ে স্ত্রীর প্রতিষ্ঠা পাওয়া খুব দুর্লভ।

একটু থামে। আবার বলে, দ্যাখ, ঠিক পয়সাকড়ির প্রতি আমার খুব বেশী মোহ নেই। একটু সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে ইচ্ছা করে ঠিকই কিন্তু তাই বলে বেশী পয়সাকড়ি হলে মনটা নষ্ট হয়ে যায়। আমি তা চাই না।

আমি বললাম, তুমি যে প্রায় উদয়ের পথের ডায়ালগ বলা শুরু করলে।

মেমসাহেব আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, তুমি আমাকে অমন করে অপমান করো না। ইচ্ছা করলে শাসন করতে পার, বকতে পার কিন্তু আমার ভালবাসা নিয়ে তুমি ঠাট্টা করো না।

মেমসাহেবের গলার স্বরটা বেশ ভারী হয়ে এসেছিল। আমি বেশ বুঝলাম, এর পরের ধাপেই ঝরঝর করে নেমে আসবে

শ্রাবণধারা। ওর ঐ চোখে জল আমি ঠিক সহ্য করতে পারব না বলে তাড়াতাড়ি ওর গাল টিপে বললাম, তুমি কি পাগল হয়েছো? তোমার ভালবাসা নিয়ে আমি ঠাট্টা করব?

মেমসাহেব একটু শান্তি পায়, স্বস্তি পায়। আমার কাঁধের 'পর মাথাটা রাখে। আমি ওর মুখে মাথায় হাত দিয়ে আদর করি। মেমসাহেব আরো আমার কাছে আসে। বলে, কেন যে তোমাকে ভালবেসেছি তা জানি না। হয়ত তুমি আমাকে অমন করে চেয়েছিলে বলেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনি। অনেক-দিন রাত্রে একলা একলা চুপচাপ তোমার কথা ভেবেছি।

'তাই নাকি?'

'তবে কি! ভাবিয়ে ভাবিয়ে তো তুমি আমাকে শেষ করলে!'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার কাজকর্ম নিয়ে অত খিটখিট কর কেন?'

মাথাটা নাড়িয়ে মেমসাহেব বলে, খিটখিট করব না? তোমার মত ফাঁকিবাজ, আড্ডাবাজ, স্ত্রৈণ লোককে খিটখিট না করলে কাজ করান সম্ভব?

'যার স্ত্রী নেই, সে আবার স্ত্রৈণ হবে কেমন করে?'

'বাজে বকো না। বিয়ে না করেই যা করছ সে আর বলার নয়। না জানি বিয়ে করলে কি করবে?'

জান দোলাবৌদি, মেমসাহেব ভীষণ দুষ্টুমি করত। আমি আদর করলে গলে পড়ত, ভালবাসলে মুগ্ধ হতো, দুষ্টুমি করলে উপভোগ করত। কিন্তু পরে আমাকে টিপ্পনী কাটার বেলায় এমন একটা ভাব দেখাত যে ওর যেন কোন তাগিদ নেই, প্রয়োজন নেই; সব কিছুই যেন আমার প্রয়োজন।

যাই হোক সেদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে বসে বসে কি বলেছিল জান? বলেছিল, আমি চাই তুমি অনেক অনেক বড় হও। কেউ যেন বলতে না পারে আমি আসায় তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

এইত নিজেকে গড়ে তোলার সময়। এর পরে সংসারধর্মে জড়িয়ে পড়লে আর কি এত অবসর পাবে? পাবে না। এখন তুমি একটি মুহূর্তও নষ্ট করবে না, আমি নষ্ট করতে দেব না। আমার সমস্ত স্বপ্ন, সাধনা, শক্তি দিয়ে তোমাকে আমি বড় করবই।

আমি বলি, তুমি নিজেও তো এগিয়ে যাবে। বিদেশ যেতে পার, রিসার্চ করতে পার...

মেমসাহেব অবাক হয়ে বলে, আমি? বিয়ের পর আমি কিচ্ছু করব না। চাকরি-বাকরি সব ছেড়ে দেব।

'তবে কি করবে?'

'কি আবার করব? ঘর-সংসার করব।'

'তাই বলে চাকরি ছাড়বে কেন?'

'চাকরি করলে আর ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় না। তাছাড়া তোমার যা অদ্ভুত কাজ। কাজের তো কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই। সুতরাং দুজনেই বাইরে বাইরে থাকলে চলবে কেন?'

আবার পরে বলল, ঘর-সংসারের কাজকর্ম করে তোমার কাজকর্মে একটু সাহায্য করার চেষ্টা করব। তোমার মত জার্নালিস্ট না হতে পারি অন্তত তোমার সেক্রেটারী ত হতে পারব।

এমনি করে একদিন অকস্মাৎ পিছন ফিরে দেখি আমার কর্ম-জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। দৈনন্দিন রিপোর্ট করা ছাড়াও নিত্য নতুন লেখার কাজে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ক্লিপিং করা, ফাইল করা, লাইব্রেরীতে গিয়ে নোটস্ নেওয়া, বইপত্তর পড়া, তারপর লেখা এবং সে লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা করা নিয়ে সারাটা দিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। রোজ রোজ মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করারও সময় হয় না।

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে সর্বনাশা বন্যা দেখা দিল। ঘরবাড়ি রেললাইন ভেসে গেল, জমিজমা ডুবে গেল, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক হাহাকার করে উঠল। নিউজ এডিটরের নির্দেশে আমাকে

ছুটতে হলো সেই বিধ্বংসী বন্যার রিপোর্ট করতে। মেমসাহেবকে কলেজে টেলিফোন করে খবরটা দিলাম। স্টেশনে এসে আমার হাতে নির্মাল্য দিয়ে বলেছিল, কালীঘাটের মা'র নির্মাল্য। কাছে রেখো, কোন বিপদ হবে না।

শুধু নির্মাল্য দিয়েই শান্তি পায় নি। বিস্কুট-জ্যাম-জেলীর একটা বিরাট প্যাকেট দিয়ে বলেছিল, ফ্লাড এরিয়ায় নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়ার মুশকিল হবে। এগুলো রেখে দাও।

দিন পনের বাদে আমি ঘুরে এলাম। মেমসাহেব তো আমাকে দেখে চম্‌কে উঠল, তোমার এ কি অবস্থা?

'কি আবার অবস্থা?'

'কি হয়েছে তোমার শরীর!'

'অনিয়ম-অত্যাচার হলে শরীর খারাপ হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? কদিন পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সেদিন ও আর বিশেষ কিছু বলল না। পরের দিন এক বোতল টনিক নিয়ে হাজির। হুকুম হলো, দু'বেলা দু' চামচ করে খাবে। ভুল হয় না যেন। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাওয়াটা বন্ধ কর তো।

'চা খাওয়া বন্ধ করব?'

'কথাটা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লে বলে মনে হচ্ছে।'

'প্রায় তাই। সাকসেসফুল জার্নালিস্টরা হুইস্কি আর আন-সাকসেসফুল জার্নালিস্টরা চা খেয়েই তো বেঁচে থাকে। সেই চা ছাড়লে কি এবার হুইস্কি ধরব?'

'নিশ্চয়ই! তা না হলে আমার কপাল পোড়াবে কেমন করে?'

আমি নিয়ম-কানুন ছাড়া, বন্ধনহীন উন্মত্ত পদ্মার মত বেশ জীবনটা কাটাচ্ছিলাম। ছন্নছাড়া জীবনটা বেশ লাগত। কিন্তু এই মেয়েটা এসে সব ওলটপালট করে দিল। আমাকে প্রায় ভদ্দরলোক করে তুলল। সর্বোপরি আমার চোখে, আমার প্রাণে একটা সুন্দর শান্ত সংসার-জীবনের স্বপ্ন এঁকে দিল।

বার

বহুজনকে দীর্ঘদিন তৈলমর্দন করেও কলকাতার কোন পত্র-পত্রিকায় যখন কোন চাকরি জোটাতে পারলাম না, তখন এক্সপ্রেস আর ক্রনিকেলের ঐ সামান্য অস্থায়ী কাজও বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু কতকাল? মেমসাহেবকে নিয়ে আমার জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। কর্মজীবনে সে অনিশ্চয়তা আমাকে এবার ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন করতে লাগল।

দৈনন্দিন রিপোর্টিং ছাড়া প্রবন্ধ ফিচার ইত্যাদি লেখা ঠিকই চলছিল। কখনও এ কাগজে, কখনও সে কাগজে এসব লেখা ছাপাও হচ্ছিল। কোন কোন লেখা অমনোনীতও হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দশ-পনের-বিশ টাকার মনিঅর্ডার বা চেকও পাচ্ছিলাম। মন্দ লাগছিল না। কিন্তু সাংবাদিক ফেরিওয়ালা হয়ে তো জীবন কাটাতে পারি না! এই অনিশ্চয়তার মধ্যে মেমসাহেবকে তো টেনে আনতে পারি না! তাছাড়া আমাকে পাশ কাটিয়ে অনেক পরিচিত নতুন ছেলেছোকরার দল অলিগলি দিয়ে কর্মজীবনের রেড রোড ধরে ফেলল। নিজেকে বড়ই অপদার্থ, অকর্মণ্য মনে হল।

মেমসাহেবকে আমি কিছু বলতাম না। নিজের মনে মনেই অনেক কথাই চিন্তা করতাম। একবার ভাবলাম চুলোয় যাক্ জার্নালিজম! যদি খেতে পরতে না পেলাম তবে আবার জার্নালিজম-এর শখ কেন? দুর্বল মুহূর্তে অন্য চাকরি-বাকরি নেবার কথাও ভাবলাম। কিন্তু পরের মুহূর্তে নিজের মনকে শাসন করেছি। বুঝিয়েছি, না তা হয় না। এতবড় পরাজয় আমি মেনে নিতে পারব না। যৌবনেই যদি কর্মজীবনের এত বড় পরাজয় মেনে নিই, তবে ভবিষ্যতে কি করব? কি নিয়ে লড়ব?

আবার ভেবেছি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাই। দিল্লী, বোম্বে বা লণ্ডন চলে যাই। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া বললেই তো আর পালিয়ে যাওয়া যায় না। বিলেতে যেতে অনেক টাকার প্রয়োজন। সে টাকা আমার ছিল না। তাছাড়া বিলেত গিয়ে কি করতাম। বিলেত গিয়ে কেরানীগিরি বা বাস কণ্ডাকটর হয়ে এ্যান্টনি সাহেব হবার শখ কোনদিনই আমার ছিল না। কয়েকটা দেশী কাগজের কাজ নিয়ে বিলেতে যাবার পরিকল্পনা অনেক দিন মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল কিন্তু তার জন্যও দেশের মধ্যে অনেক ঘোরাঘুরি প্রয়োজন ছিল। আমার পক্ষে তাও সম্ভব হয় নি। রাসবিহারী এভিন্যুর পোস্টাফিসে মেমসাহেবের কিছু টাকা ছিল। আমার কল্যাণে ইতিমধ্যেই তাতে দু'একবার হাত পড়েছিল। সুতরাং ওদিকে হাত বাড়ানোর কথা আর ভাবতে পারলাম না।

দু'একবার অত্যন্ত আজেবাজে চিন্তাও মাথায় এসেছে। ভেবেছি মেমসাহেবকে কিছু না জানিয়ে অকস্মাৎ একদিন যেখানে হোক উধাও হয়ে যাই। যৌবনে প্রাণবন্ত সব ছেলেমেয়েরাই প্রেমে পড়ে। ক'জন সে প্রেম আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে?

আমিও না হয় পারলাম না। কি হয়েছে তাতে? মেমসাহেব দু-চারদিন কান্নাকাটি করবে, দু'এক বেলা হয়ত উপবাস করবে। কেউ কেউ হয়ত কয়েকদিন উপহাস করবে, কেউ বা হয়ত কিছু কিছু অপ্রিয় মন্তব্য করবে। কিন্তু তার পর? নিশ্চয়ই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ডেভেলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের আমেরিকা ফেরত ফিসারি এক্সপার্ট সুবোধবাবু নিশ্চয়ই মেমসাহেবকে অপছন্দ করবেন না। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে বুড়ো সাজ্জাদ হোসেনের সানাই বেজে উঠলে সুবোধবাবু জামাই বেশে হাজির হবেন। কিছু পরে মেমসাহেব বধূ বেশে কলাতলায় সুবোধকে মালা পরাবে, পুরোহিত মন্ত্র পড়ে সম্পত্তি ট্রান্সফার পাকাপাকি করবেন। তারপর বাসর। একটু হাসি, একটু ঠাট্টা, একটু তামাশা। লোকচক্ষুর

আড়ালে হয়ত একটু স্পর্শ, একটু অনুভূতি। দেহমনে হয়ত বা একটু বিদ্যুৎ প্রবাহ!

আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করল। তবে সামলে নিলাম। পরের দিনটার জন্য খুব বেশী চিন্তা হয় না। কিন্তু তার পরের দিন। ফুলশয্যার কথা ভাবতে গিয়েই মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। রজনীগন্ধা দিয়ে সাজান ঐ ফোমড্ রবারের শয্যায় মেমসাহেবের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে সুবোধ। তিলে তিলে ধীরে ধীরে যে মুকুল চব্বিশ-পঁচিশ বসন্তে পল্লবিত হয়ে আমার মানস-প্রতিমা মেমসাহেব হয়েছে, যার মনের কথা, দেহের উত্তাপ, বুকের স্পন্দন শুধু আমি জেনেছি, পেয়েছি ও অনুভব করেছি, সেই মেমসাহেবের অঙ্গে সুবোধের স্পর্শ! অসম্ভব। তাছাড়া যে মেমসাহেব তার জীবনসর্বস্ব দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে আমাকে সুখী, সার্থক করতে চেয়েছে, তাকে এভাবে বঞ্চিতা করে পালিয়ে যাব? না, না, তা হয় না।

তবে?

তবে কি করব, তা ভেবে কোন কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। মনে মনে অবশ্য ঠিক করেছিলাম কলকাতায় আর বেশীদিন থাকব না। খবরের কাগজের রিপোর্টার হবার দৌলতে বাংলাদেশের বহু প্রথিতযশা লব্ধপ্রতিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল।

দুর্ভাগ্য!

হ্যাঁ, দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্য নয়ত কি বলব বল? কলকাতার ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে লক্ষ লক্ষ মানুষ এঁদের বক্তৃতা শোনে, হাততালি দেয়, গলায় মালা পরায়। প্রথম প্রথম এঁদের কাছে এসে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম। শিক্ষা-সংস্কৃতির ধ্বজা উড়িয়ে যাঁরা সিনেট হল—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট—মহাবোধি সোসাইটি হল গরম করে তুলতেন, তাঁদের সবাইকেও ঠিক শ্রদ্ধা করে উঠতে পারলাম

না। সাড়ে তিন কোটি বাঙালী নারী-পুরুষ-শিশুর দল যাঁদের মুখ চেয়ে বসে আছে, যাঁদের বক্তৃতা আমরা নিত্য খবরের কাগজের পাতায় ছাপছি, তাঁদের স্বরূপটা প্রকাশ হওয়ায় আমি যে কি দুঃখ, কি আঘাত পেয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কি কি কারণে এঁদের আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনি, সে-কথা লেখার অযোগ্য। বিদ্যাসাগরের বাংলাভাষা দিয়ে এঁদের কাহিনী লিখলে বিদ্যাসাগরের স্মৃতির অবমাননা করা হবে, বাংলাভাষার অপব্যবহার করা হবে। তবে যদি এইসব মহাপুরুষের কথা লিখতে পারতাম, যদি সে-ক্ষমতা আমার থাকত, তবে বাংলাদেশের কিছু মানুষ নিশ্চয়ই বাঁচতে পারত।

তুমি ভাবছ আমি বাচালতা করছি। তাই না? সত্যি বলছি দোলাবৌদি, আমি একটুও বাচালতা করছি না। ইংরেজীতে যাকে বলে ট্রাডিশন, তা তো বাঙালীর আছে। শিক্ষা-দিক্ষা-আদর্শ ও দেশপ্রেমের অভাব তো বাংলাদেশে নেই। গ্রামে গ্রামে দরিদ্র গৃহিণীরা আজও ক্ষুধার অন্ন দিয়ে অতিথির সেবা করতে কার্পণ্য করেন না। উদার বাংলা বুক পেতে সারাদেশের মানুষকে আসন বিছিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্তর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছেন বাংলাদেশে। কিন্তু কই আর কোন প্রদেশের মানুষ তো এমনি করে সারাদেশের মানুষকে নিয়ে সংসার করবার উদারতা দেখাতে পারে নি। রাজনীতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্পে-সংগীতে বাঙালীর ঔদার্য অতুলনীয়। অতীতের ইতিহাস ওল্টাবার কোন প্রয়োজন নেই। ইদানীং কালের ইতিহাসই ধরা যাক। প্রমথেশ বড়ুয়া, কুন্দনলাল সায়গল, লীলা দেশাই বাঙালী নন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে এঁদের অকলঙ্কিত আসন চিরকালের জন্য রইবে। বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র গান শোনার জন্য একমাত্র বাংলাদেশের অতিসাধারণ মানুষই সারা রাত্তির রাস্তার ফুটপাথে বসে থাকে। টি আও, আপ্পা রাও,

মেওয়ালাল বা লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলিকে বাঙালীর ছেলেরা যা ভালবাসা দিয়েছে, তার কি কোন তুলনা হয়? হয় না দোলাবৌদি। হবেও না।

শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শ ও সর্বোপরি হৃদয়বত্তা সত্ত্বেও বাঙালী কেন মরতে চলেছে? বাঙালীর ঘরে ঘরে কেন হাহাকার? কান্না? সারাদেশের মানুষ যখন নতুন প্রাণস্পন্দনে মাতোয়ারা, তখন বাঙালীর এ-দুরবস্থা কেন? সাড়ে তিন কোটি বাঙালীর মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিল কে? কেন সারা জাতটা সর্বহারা হলো?

আগে সবকিছুর জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতাম। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আশা করতাম ময়দানে মনুমেণ্টের তলায় নেতাদের গলায় মালা পরালে, তাঁদের বক্তৃতা শুনলে হাতে তালি দিলে বাঙালীর সর্বরোগের মহৌষধ পাওয়া যাবে। রিপোর্টারী করতে গিয়ে বড় আশা নিয়ে এঁদের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু হা ভগবান! মনে মনে এমন ধাক্কাই খেলাম যে তা বলবার নয়।

ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা নিশ্চয়ই খুব জরুরী ব্যাপার। কিন্তু সাংবাদিকতা করতে গিয়ে সমাজ-জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা অসম্ভব। তাই তো সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ক্ষয়রোগ দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। তাই তো কলকাতার জীবন আমার কাছে আরো তেতো মনে হতে লাগল।

এইসব নানা অশান্তি মনকে তোলপাড় করে তুলেছিল। মুখে কিছুই প্রকাশ করছিলাম না। বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের কেউই কিছু জানতে পারছিল না। আমার মনের মধ্যে কত চিন্তা-ভাবনার যে কি বিচিত্র লড়াই চলছিল, সে-খবর কেউ জানতে পারল না। তবে মেমসাহেবকে ফাঁকি দিতে পারিনি।

সেদিন দুজনে ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। নোটস্ নেওয়ার কাজ শেষ করে একটা গাছতলায় এসে বসলাম দুজনে।

আমি বোধহয় দৃষ্টিটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে কি যেন দেখছিলাম। মেমসাহেব বললো, ওগো, চিনেবাদাম কিনে আনবে ?

আমি গেটের বাইরে থেকে দু' আনার চিনেবাদাম আর দুটো ম্যাগনোলিয়া আইসক্রীম কিনে আনলাম। আইসক্রীম, চিনেবাদাম খাওয়া শেষ হয়েছে। মেমসাহেব তখনও একটু একটু ঝাল-নুন খাচ্ছে আর জিভ দিয়ে রসাস্বাদনের আওয়াজ করছে। ওর কখন ঝাল-নুন খাওয়া শেষ হয়েছে, কখন আমার কাছে রুমাল চেয়েছে, তা আমি খেয়াল করিনি।

মেমসাহেব হঠাৎ আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, ওগো, রুমালটা দাও না!

আমি রুমাল দিলাম। রুমাল দিয়ে হাতটা মুখটা মুছে আবার আমাকে ফেরত দিল, এই নাও।

রুমালটা পকেটে রাখতে রাখতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার রুমাল কি হলো ?

'সর্বমঙ্গলার নির্মাল্য বেঁধে তোমাকে দিলাম না!'

'ও! তাইতো!'

মেমসাহেব প্রশ্ন করল, 'একটা কথা বলবে ?'

'কেন বলব না ?'

'কি এত ভাবছ আজকাল ?'

'কই ? কিছু না তো।'

ও একটু হাসল। বললো, আমাকে ছুঁয়ে বলতে পার তুমি কিছু ভাবছ না ?

কথা শেষ হতে না হতেই ও আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকের ওপর রেখে বলে, বল।

আমি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলি, কি ছেলেমানুষি করছ!

মেমসাহেব একটু হাসে, একটু ভাবে। বোধহয় আমার কথায়

একটু দুঃখ পায়। ঐ ঘন কালো দুটো চোখ যেন শ্রাবণের মেঘের মত ভারী হয়ে ওঠে। আমি এক ঝলক দেখে নিয়ে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিই।

মেমসাহেবের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। আমি দৃষ্টিটা আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। জানতে চাই, 'কি এত ভাবছ ?'

'জেনে তোমার লাভ ?'

আমি ভেবেছিলাম সহজ সরলভাবে মেমসাহেবকে এড়িয়ে যাব। কিছু বলব না। কিন্তু গভীর ভালবাসায় ওর দৃষ্টিটা এত স্বচ্ছ হয়েছিল যে, আমার মনের গভীর প্রদেশেরও কোন কিছু লুকান সম্ভব ছিল না। ও স্থির জেনেছিল আমার মনটা একটু বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু কি কারণে মনটা বিক্ষিপ্ত তা জানতে না পারায় মেমসাহেবের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। সে-কথা উপলব্ধি করেও ওকে ঠিক সত্য কথাটা বলতে আমার বেশ কুণ্ঠা হলো।

দু'চার মিনিট দুজনেই চুপচাপ রইলাম।

তারপর মেমসাহেব ডাকে, শোন।

'বল'।

'তুমি কি আজকাল এমন কিছু ভাবছ যা আমাকে বলা যায় না।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ !'

'তবে বলছ না কেন ?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বললাম, 'কি বলব মেমসাহেব ! নতুন কিছুই ভাবছি না। ভাবছি নিজের কর্মজীবনের কথা। আর কতকাল এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকব তাই খালি ভাবছি।'

মেমসাহেব উড়িয়েই দিল আমার কথাটা। বললো, তা এত ভাববার কি আছে ? কেউ একটু আগে, কেউ বা একটু পরে জীবনে দাঁড়ায়। তুমি না হয় দু'বছর পরেই জীবনে দাঁড়াবে, তাতে কি ক্ষতি হলো ?

'ভাবব না? হকারের মত ফিরি করে রোজগার করতে আর ভাল লাগে না। হাজার হোক বয়স তো হচ্ছে!'

মেমসাহেব তাড়াতাড়ি আমাকে কাছে টেনে নেয়। দু' হাত দিয়ে আমার মুখটা তুলে ধরে বলে, ছি ছি, নিজেকে এত ছোট ভাবছ কেন?

'ছোট ভাবতাম না তবুও যদি ভদ্দরলোকের মত রোজগার করতে পারতাম।'

'তোমার কি টাকার দরকার?'

'না, না, টাকার আবার কি দরকার!'

'বল না! আমি তো মরে যাইনি।'

মেমসাহেব বড়ই উতলা হলো আমার কথায়। জানতে চাইল, আর কি ভাবছ?

'বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'ভাবছি আমার এই অনিশ্চয়তার জীবনে তোমাকে কেন টেনে আনলাম। একটা আধাবেকার জার্নালিস্টের সংসারে তোমাকে এনে কেন তোমার জীবনটা নষ্ট করব, তাই ভাবছি।'

মেমসাহেব রেগে ওঠে, চমৎকার! হাততালি দেব?

'কেন ঠাট্টা করছ?'

'তোমার কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারছি না। তোমার টাকা না থাকলে আমি তোমার কাছে ঠাঁই পাব না? তুমি আমাকে এত ছোট, এত নীচ ভাব?'

পাগল কোথাকার! তোমাকে আমার সংসারে এনে যদি সুখ, শান্তি, মর্যাদা দিতে না পারি তবে......

ও আর এগুতে দিল না, 'তুমি দু'পাঁচশ' টাকা রোজগার করলেই আমার শান্তি? টাকা হলেই বুঝি সবাই সুখী হয়?'

'না তা হবে কেন? তবুও ভদ্রভাবে বাঁচবার জন্য কিছু তো চাই।'

'আমার বা আমার সংসারের চিন্তা তোমার করতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যাও তো।'

কথায় কথায় বেলা যায়। সূর্যটা আস্তে আস্তে নীচে নামতে থাকে, গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়। বেলভিডিয়ারের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ সূর্যরশ্মির বিদায়বেলায় মিষ্টি আলোয় ভরে যায়।

মেমসাহেব আমার কাঁধে মাথা রাখে। 'ওগো', বল তুমি এসব আজেবাজে কথা ভাববে না। আজ না হয় ভগবান নাই দিলেন কিন্তু একদিন তিনি নিশ্চয়ই ভরিয়ে দেবেন তোমাকে।'

'তুমি বুঝি সবকিছু জান?'

'একশ'বার! ওয়েলিংটন স্কোয়ার আর মনুমেন্টের মিটিং কভার করেই তোমার জীবন কাটাতে হবে না।'

'তবে কি করব?'

'কি না করবে তাই বল। তুমি দেশদেশান্তরে ঘুরবে, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে, তুমি কত কি লিখবে···

'তারপর?'

মেমসাহেব আমার গাল টিপে বলে, তারপর আর বলব না। তোমার অহঙ্কার হবে।

আমার হাসি পায় মেমসাহেবের প্রলাপ শুনে। 'তুমি কি বোম্বে যাচ্ছ?'

ও অবাক হয়ে বলে, আমি কেন বোম্বে যাব?

'হিন্দী ফিল্মের স্টোরি লেখার জন্য।'

'অসভ্য কোথাকার।'

সেদিন আমি শুধু একটা মোটামুটি ভাল চাকরির স্বপ্ন দেখতাম। আর? আর ভাবতাম অফিস থেকে আমাকে একটা টেলিফোন দেবে। আমি অফিসের গাড়ি করে রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার যাব, পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর অফিসে ঘুরে বেড়াব। চীফ মিনিস্টারের সঙ্গে দার্জিলিং যাব। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সেক্রেটারী

ডেপুটি সেক্রেটারীরা আমাকে উইস করবেন, পুলিস কমিশনার ভিড়ের মধ্যেও আমাকে চিনতে পারবেন, শ্যামপুকুর থানার ও-সি আমাকে কাটলেট খাওয়াবেন।

স্বপ্ন দেখারও একটা সীমা আছে। তাইতো আমি আর এগুতে পারতাম না। আজ সেসব দিনের কথা ভেবে হাসি পায়। কোনদিন কি ভেবেছি আমি নেহেরু-শাস্ত্রী-ইন্দিরার সঙ্গে পৃথিবীর পঞ্চ মহাদেশ ঘুরে বেড়াব? কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছি বছর বছর বিলেত যাব? কোনদিন কি ভাবতে পেরেছি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে এয়ার ফোর্সের স্পেশ্যাল প্লেনে দমদমে নামব? রাজভবনে থাকব? আরো অনেক কিছু ভাবিনি। ভাবিনি ভারতবর্ষের টপ লীডরেরা আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে গোপন আলোচনা করবেন, হুইস্কি খেতে খেতে অ্যাম্বাসেডরদের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স ডিসকাস্ করব।

মেমসাহেব বোধহয় এসব ভাবত। কোথা থেকে, কেমন করে এসব ভাবনার সাহস সে পেত, তা আমি জানি না। তবে আমার কর্মজীবনের কৃষ্ণপক্ষেও সে-আশা হারায় নি। তাইতো যতবার আমি নিরাশায় ভেঙে পড়েছি, যতবার আমি পরাজয় মেনে নিয়ে কর্মজীবনের পথ পাল্টাতে চেয়েছি, ও ততবার আমাকে তুলে ধরেছে। আশা দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে, ভালবাসা দিয়েছে। কখনও কখনও শাসনও করেছে।

'সবই বুঝি মেমসাহেব। কিন্তু এই কলকাতায় পরিচিত মানুষের দ্বারে দ্বারে আর কৃপাপ্রার্থী হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারছি না।'

মেমসাহেব স্পষ্ট বললো, কলকাতাতেই যে তোমার থাকতে হবে, এমন কি কথা আছে। যেখানে গিয়ে তুমি কাজ করে শান্তি পাবে, সেইখানেই যাও।

এক মুহূর্ত চুপ করে ও আবার বললো, আমি তো তোমাকে আমার আঁচলের মধ্যে থাকতে বলি না।

মেমসাহেব জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করেছিল। সে-লক্ষ্য ছিল আমার কল্যাণ, আমার প্রতিষ্ঠা। আর চেয়েছিল প্রাণভরে ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে।

মধ্যবিত্ত সংসারের কুমারী যুবতীর পক্ষে এমন অদ্ভুত লক্ষ্য স্থির করে অগিয়ে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। মেমসাহেবের পক্ষেও সহজ হয় নি। বাধা এসেছে, বিপত্তি এসেছে, এসেছে প্রলোভন। এইত সুবোধবাবু আমেরিকা ফেরার পর যখন ইঙ্গিত করলেন মেমসাহেবকে তাঁর বেশ পছন্দ, তখন বাড়ির অনেকই অনেক দূর এগিয়েছিলেন।

মেমসাহেব কি বলেছিল জান? বলেছিল মেজদি, মা-কে একটু বুঝিয়ে বলিস রেডিমেড জামা-কাপড় দেখতে একটু চক্‌চক্ করে কিন্তু বেশীদিন টেঁকে না, তার চাইতে ছিট কিনে মাপমত নিজের হাতে তৈরি করা জিনিস অনেক ভাল হয়, অনেক বেশী সুন্দর হয়।

মেজদি ইঙ্গিত বুঝেছিল। তবে আমার সঙ্গে ঘুরেফিরে বেড়ান নিয়ে মেমসাহেবের আত্মীয় মহলেও গুঞ্জন উঠেছিল। অপ্রিয় অসংযত আলোচনাও হতো মাঝে মাঝে। ও সেসব গ্রাহ্য করত না। 'দেখ খোকনদা, আমি কচি মেয়ে নই। একটু-আধটু বুদ্ধিসুদ্ধি আমার হয়েছে। কিছু কিছু ভালমন্দও বুঝতে শিখেছি।'

সব মিলিয়ে কলকাতার আকাশটা বেশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মেমসাহেবও ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল আর বেশীদিন কলকাতায় থাকলে দুজনেরই মাথাটা খারাপ হয়ে উঠবে।

'ওগো, সত্যি তুমি এবার কোথাও যাবার ব্যবস্থা কর। আশপাশের কতকগুলো অপদার্থ মানুষের ভালবাসার ঠেলায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

'আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?'

'পারব। তবে যখন যেদিন দু'জনে মিলবো, সেদিন তো আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না।'

আত্মীয়বন্ধুর দল কেউ জানতে পারলেন না। ধীরে ধীরে আমি দিল্লী যাবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। গোপনে গোপনে কিছু কিছু কাগজপত্রের অফিসে গিয়ে আলোচনা করলাম। শেষে একদিন অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত মহল থেকে এক নগণ্য সাপ্তাহিকের সম্পাদক বললেন, দিল্লীতে আমার একজন করস্-পনডেন্টের দরকার। তবে এখন তো একশ' টাকার বেশী দিতে পারব না।

কুচপরোয়া নেই। একশ' টাকাই যথেষ্ট।

কথা দিলাম, ঠিক আছে আমি যাব।

'কবে থেকে কাজ শুরু করবেন?'

'আপনি যেদিন বলেন।'

'অ্যাজ আর্লি অ্যাজ ইউ ক্যান গো।'

মেমসাহেব পরের শনিবার ভোরবেলায় আমাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে পূজা দিল, প্রসাদ দিল, নির্মাল্য দিল। 'এই নির্মাল্যটা সব সময় কাছে রেখো।'

সন্ধ্যেবেলায় দুজনে মিলে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে গেলাম। বেশী কথা বলতে পারলাম না কেউই।

মেমসাহেব বললো, আমার মন বলছে তোমার ভাল হবেই। আমার যদি ভালবাসার জোর থাকে, তাহলে তোমার অমঙ্গল হতে পারে না।

আমি শুধু বললাম, তোমার দেওয়া নির্মাল্য আর তোমার ভালবাসা নিয়েই তো যাচ্ছি। আমার আর কি আছে বল?

সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকার নামতে শুরু করেছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল এবার যাই।

ও উঠল না। বসে রইল। ডাকল, শোন।

'বল।'

'কাছে এস। কানে কানে বলব।'

কানে কানে কি বললো জান? বললো, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরে আদর করবে?

আব্‌ছা অন্ধকার আরো একটু গাঢ় হলো। আমি দু'হাত দিয়ে মেমসাহেবকে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনেক আদর করলাম।

তারপর মাথায় আঁচল দিয়ে ও আমাকে প্রণাম করল। 'আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমাকে সুখী করতে পারি।'

যুধিষ্ঠির রাজত্ব ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে পাশা খেলেছিলেন। আমার রাজত্ব ছিল না। তাই নিজের জীবন আর মেমসাহেবের ভালবাসা পণ রেখে আমি কর্মজীবনের পাশা খেলতে যুধিষ্ঠিরের স্মৃতিবিজড়িত অতীতের ইন্দ্রপ্রস্থ, বর্তমানের দিল্লী এলাম।

তেরো

বাঙালীর ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরুতে চায় না বলে একদল পেশাদার অন্ধ রাজনীতিবিদ অভিযোগ করেন। অভিযোগটি সর্বৈব মিথ্যা। মহেঞ্জোদাড়ো বা হরপ্পার যুগের কথা আমি জানি না। তবে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ও মধ্যযুগে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়েছেন। রুজি-রোজগার করতে বাঙালী কোথাও যেতে দ্বিধা করে নি। সুদূর রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, সিমলা পর্যন্ত বাঙালীরা গিয়েছেন, থেকেছেন, থিয়েটার করেছেন, কালীবাড়ী গড়েছেন।

এই যাওয়ার পিছনে একটা কারণ ছিল। প্রথমতঃ বাঙালীরাই আগে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারী অফিসে বাবু হবার বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেন। সবাই যে কুইন ভিক্টোরিয়ায় অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার হাতে করে হাওড়া স্টেশন থেকে পাঞ্জাব মেলে চাপতেন, তা নয়। তবে রাওয়ালপিণ্ডি মিলিটারী একাউন্টস অফিসে কোন না কোন মেশোমশাই পিসেমশাই-এর আমন্ত্রণে অনেকেই বাংলা ত্যাগ করেছেন।

পরে বাঙালী ছেলেছোকরারা বোমা-পটকা ছুঁড়ে ইংরেজদের ল্যাজে আগুন দেবার কাজে মেতে ওঠায় সরকারী চাকুরির বাজারে বাঙালীর দাম কমতে লাগল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের দিকে দিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হওয়ায় সরকারী অফিসের বাবু যোগাড় করতে ইংরেজকে আর শুধু বাংলার দিকে চাইবার প্রয়োজন হলো না। বাঙালীর বাংলার বাইরে যাবার বাজারে ভাঁটা পড়ল।

জীবনযুদ্ধে ধীরে ধীরে বাঙালীর পরাজয় যত বেশী প্রকাশ হতে

লাগল, মিথ্যা আত্মসম্মানবোধ বাঙালীকে তত বেশী পেয়ে বসল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর এই আত্মসম্মানবোধ তাকে প্রায় বাংলাদেশে বন্দী করে তুললো। বাংলাদেশের নব্য যুবসমাজ চক্রান্ত ভাঙতে পারত, গড়তে পারত নিজেদের ভবিষ্যৎ, অগ্রাহ্য করতে পারত অদৃষ্টের অভিশাপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা সম্ভব হলো না। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, সুচিত্রা-উত্তম, সন্ধ্যা মুখুজ্যে-শ্যামল মিত্তির, বিষ্ণু দে-সুধীন দত্ত, সত্যজিৎ-তপন সিংহ থেকে শুরু করে নানাকিছুর দৌলতে বেকার বাঙালীও চরম উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে জীবন কাটায়। এই উত্তেজনা, কর্মচাঞ্চল্যের মোহ আছে সত্য কিন্তু সার্থকতা কতটা আছে তা ঠিক জানি না।

কলকাতায় রিপোর্টারী করতে গিয়ে বাংলাদেশের বহু মনীষীর উপদেশ পেয়েছি, পরামর্শ পেয়েছি কিন্তু পাইনি অনুপ্রেরণা। নিজেদের আসন অটুট রেখে, নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখে তাঁরা শুধু রিক্ত নিঃস্ব বুভুক্ষু বাঙালী ছেলেমেয়েদের হাততালি চান। সাড়ে তিন কোটি বাঙালীকে বিকলাঙ্গ করে সাড়ে তিন ডজন নেতা আনন্দে মশগুল।

উদার মহৎ মানুষের অভাব বাংলাদেশে নেই। প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায়, গ্রামে-শহরে-নগরে বহু মহাপ্রাণ বাঙালী আজও রয়েছেন। কিন্তু অন্যায়, অবিচার, অসৎ-এর অরণ্যে তাঁরা হারিয়ে গেছেন।

কলকাতার এই বিচিত্র পরিবেশে থাকতে থাকতে আমার মনটা বেশ তেঁতো হয়েছিল। আশপাশের অসংখ্য মানুষের অবহেলা আর অপমান অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সবার অজ্ঞাতে, অলক্ষ্যে মন আমার বিদ্রোহ করত কিন্তু রাস্তা খুঁজে পেতাম না। এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যেতাম। সমাজ-সংসার-সংস্কারের জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেরুতে গিয়ে ভয় করত। ঘাবড়ে যেতাম।

নিজের মনের মধ্যে যে এইসব দ্বন্দ্ব ছিল, তা মেমসাহেবকেও বলতাম না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। তাইতো নিয়তির খেলাঘরে মেমসাহেবকে নিয়ে খেলতে গিয়ে যেদিন সত্যিসত্যিই ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিলাম, সেদিন মুহূর্তের জন্য পিছনে ফিরে তাকাইনি। মনের মধ্যে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। হয়ত প্রতিহিংসা আমাকে আরো কঠোর কঠিন করেছিল।

আর ?

মেমসাহেবকে আর দূরে রাখতে পারছিলাম না। জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত তিলে তিলে দগ্ধ হওয়ায় দিনের শেষে রাতের অন্ধকারে মেমসাহেবের একটু কোমল স্পর্শ পাবার জন্য মনটা সত্যি বড় ব্যাকুল হতো। জীবনসংগ্রাম কঠোর থেকে কঠোরতর হতে পারে, সে সংগ্রামে কখনও জিতব, কখনও হারব। তা হোক। কিন্তু দিনের শেষে সূর্যাস্তের পর কর্মজীবনের সমস্ত উত্তেজনা থেকে বহু দূরে মানসলোকের নির্জন সৈকতে বন্ধনহীন মন মুক্তি চাইত মেমসাহেবের অন্তরে।

স্বপ্ন দেখতাম আমি ঘরে ফিরেছি। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই আমি সুইচটা 'অফ' করে দিয়ে মেমসাহেবকে অকস্মাৎ একটু আদর করে তার সর্বাঙ্গে ভালবাসার ঢেউ তুলেছি। দুটি বাহুর মধ্যে তাকে বন্দিনী করে নিজের মনের সব দৈন্য দূর করেছি, সারাদিনের সমস্ত গ্লানি মুছে ফেলেছি।

মেমসাহেব আমার দুটি বাহু থেকে মুক্তি পাবার কোন চেষ্টা করে না, কিন্তু বলে, আঃ ছাড় না।

ঐ দুটি একটি মুহূর্তের অন্ধকারেই মেমসাহেবের ভালবাসার জেনারেটরে আমার মনের সব বালব্‌গুলো জ্বালিয়ে নিই।

তারপর মেমসাহেবকে টানতে টানতে ডিভানের 'পর ফেলে দিই। আমিও হুমড়ি খেয়ে পড়ি ওর উপর। অবাক বিস্ময়ে ওর

ছুটি চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মেমসাহেবও স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে। অত নিবিড় করে দুজনে দুজনকে কাছে পাওয়ায় দুজনেরই চোখে নেশা লাগে। সে নেশায় দুজনেই হয়ত একটু মাতলামি করি।

হয়ত বলি, জান মেমসাহেব, তোমার ঐ দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে যখন আমার নেশা হয়, যখন আমি সমস্ত সংযম হারিয়ে মাতলামী পাগলামি করি, তখন জিগর মুরাদাবাদীর একটা 'শের' মনে পড়ে।

পাশ ফিরে আর শোয় না মেমসাহেব। চিৎ হয়ে শুয়ে দুহাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, বল না, কোন 'শেরটা' তোমার মনে পড়ছে।

আমি এবার বলি, তেরী আঁখো কা কুছ কসুর নেহি, মুঝকো খারাব হোনা থা।···বুঝলে মেমসাহেব, তোমার চোখের কোন দোষ নেই, আমি খারাপ হতামই।

চোখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু ঢলঢল ভাবে ও বলে, তাতো একশ'বার সত্যি! আমি কেন তোমাকে খারাপ করতে যাব?

আমি কানে কানে ফিসফিস করে বলি, আমার আবার খারাপ হতে ইচ্ছে করছে।

ও তিড়িং করে একলাফে উঠে বসে আমার গালে একটা ছোট্ট মিষ্টি চড় মেরে বলে, অসভ্য কোথাকার!

আরো কত কি ভাবতাম। ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হবার উপক্রম হতাম। শত-সহস্র কাজকর্ম চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও মেমসাহেবের ছবিটা সবসময় আমার মনের পর্দায় ফুটে উঠত। তাইতো দিল্লী আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে হয়ে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কর্মজীবনে। আর? মেমসাহেবকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমার জীবনে।

দোলাবৌদি, আমি শিবনাথ শাস্ত্রী বা বিদ্যাসাগর নই যে আত্মজীবনী লিখব। তবে বিশ্বাস কর দিল্লীর মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি একেবারে পাল্টে গিয়েছিলাম। যেদিন প্রথম দিল্লী স্টেশনে নামি, সেদিন একজন নগণ্যতম মানুষও আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন না। এতবড় রাজধানীতে একটি বন্ধু বা পরিচিত মানুষ খুঁজে পাইনি। একটু আশ্রয়, একটু সাহায্যের আশা করতে পারিনি কোথাও। দিল্লীর প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ও শীতে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে আমি যে কিভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি তা আজ লিখতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। কিন্তু তবুও আমি মাথা নীচু করিনি।

একটি বছরের মধ্যে রাতকে দিন করে ফেললাম। শুধু মনের জোর আর নিষ্ঠা দিয়ে অদৃষ্টের মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। পার্লামেন্ট হাউস বা সাউথ ব্লকের এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রী থেকে বেরুবার মুখে দেখা হলে স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টার আমাকে বলতেন, হাউ আর ইউ?

আমি বলতাম, ফাইন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!

তুমি ভাবছ হয়ত গুল মারছি। কিন্তু সত্যি বলছি এমনিই হতো। একদিন আমার সেই অতীতের অখ্যাত উইকলির একটা আর্টিকেল দেখাবার জন্য তিনমূর্তি ভবনে গিয়েছিলাম। আর্টিকেলটা দেখাবার পর প্রাইম মিনিস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, আর ইউ নিউ টু দেলহি?

'ইয়েস স্যার।'

'কবে এসেছ?'

'এইত মাস চারেক।'

তারপর যখন শুনলেন আমি ঐ অখ্যাত উইকলির একশ' টাকার চাকরি নিয়ে দিল্লী এসেছি, তখন প্রশ্ন করলেন, আর ইউ টেলিং এ লাই?

'নো স্যার।'

'এই মাইনেতে দিল্লীতে টিঁকতে পারবে ?'

'সার্টেনলি স্যার।'

শেষে প্রাইম মিনিস্টার বলেছিলেন, গুড লাক টু ইউ। সী মী ফ্রম টাইম টু টাইম।

দেখতে দেখতে কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো, ঘনিষ্ঠতা হলো। কত মানুষের ভালবাসা পেলাম। কত অফিসার, কত এম-পি, কত মিনিস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। নিত্য-নতুন নিউজ পেতে শুরু করলাম। উইকলি থেকে ডেইলীতে চাকরি পেলাম।

আমি দিল্লীতে আসার মাসকয়েকের মধ্যেই মেমসাহেব একবার দিল্লী আসতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, না এখন নয়। একটি মুহূর্ত নষ্ট করাও এখন ঠিক হবে না। আমাকে একটু দাঁড়াতে দাও, একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দাও। তারপর এসো।

ভাবতে পার মুহূর্তের জন্য যে মেমসাহেবের স্পর্শ পাবার আশায় প্রায় কাঙালের মত ঘুরেছি, সেই মেমসাহেবকে আমি দিল্লী আসতে দিইনি। মেমসাহেব রাগ করে নি। সে উপলব্ধি করেছিল আমার কথা। চিঠি পেলাম—

ওগো, কি আশ্চর্যভাবে তুমি আমার জীবনে এলে, সেকথা ভাবলেও অবাক লাগে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির জীবনে, সোশ্যাল—রি-ইউনিয়ন বা রবীন্দ্রজয়ন্তী-বসন্তোৎসবে কত ছেলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। কাউকে ভাল লেগেছে, কাউকে ভাল লাগে নি। দু'একজন হয়ত আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। আশুতোষ বিল্ডিং-এর ঐ কোণার ঘরে গান-বাজনার রিহার্সাল দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মদন চৌধুরী হঠাৎ আমার ডান হাতটা চেপে ধরে ভালবাসা জানিয়েছে। বিয়ে করতেও চেয়েছে। তালতলার মোড়ের সেই যে ভাবভোলা দেশপ্রেমিক, তিনিও একদিন আত্মনিবেদন করেছিলেন আমাকে।

মুহূর্তের জন্য চম্‌কে গেছি কিন্তু থমকে দাঁড়াই নি। তারপর যেদিন তুমি আমার জীবনে এলে, সেদিন কে যেন আমার সব শক্তি কেড়ে নিল। কে যেন কানে কানে ফিসফিস করে বলল, এই সেই!

তুমি তো জান আমি আর কোনদিকে ফিরে তাকাই নি। শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি। তোমাকে আমার জীবনদেবতার আসরে বসিয়ে পূজা করেছি, নিজের সর্বস্ব কিছু দিয়ে তোমাকে অঞ্জলি দিয়েছি। মন্ত্র পড়ে, যজ্ঞ করে সর্বসমক্ষে আমাদের বিয়ে আজও হয় নি। কিন্তু আমি জানি তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার ভবিষ্যৎ সন্তানের পিতা।

মেমসাহেব বেশী কথা বলত না কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর বড় বড় চিঠি লিখতে পারত। এই চিঠিটাও অনেক বড়। সবটা তোমাকে লেখার প্রয়োজন নেই। তবে শেষের দিকে কি লিখেছিল জান? লিখেছিল— '...তুমি যে এমন করে আমাকে চমকে দেবে, আমি ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম ঘুরে-ফিরে একটা কাগজে চাকরি যোগাড় করবে। কিন্তু এই সামান্য ক'মাসের মধ্যে তুমি এমন করে নিজেকে দিল্লীর মত অপরিচিত শহরে এত বড় বড় রথীমহারথীদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, সত্যি আমি তা কল্পনা করতে পারিনি। তোমার মধ্যে যে এতটা আগুন লুকিয়ে ছিল, আমি তা বুঝতে পারিনি।...

যাই হোক তোমার গর্বে আমার সারা বুকটা ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমার চাইতে সুখী স্ত্রী আর কেউ হতে পারবে না। আমি সত্যি বড় খুশী, বড় আনন্দিত। তোমার এই সাফল্যের জন্য তোমাকে একটা বিরাট পুরস্কার দেব। কি দেব জান? যা চাইবে তাই দেব। বুঝলে? আর কোন আপত্তি করব না। আর আপত্তি করলে তুমিই বা শুনবে কেন?...'

দোলাবৌদি, তুমি কল্পনা করতে পার মেমসাহেবের ঐ চিঠি পড়ে

আমার কি প্রতিক্রিয়া হলো? প্রথমে ভেবেছিলাম দু'একদিনের জন্য কলকাতা যাই। মেমসাহেবের পুরস্কার নিয়ে আসি। কিন্তু কাজকর্ম পয়সাকড়ির হিসাবনিকাশ করে আর যেতে পারলাম না।

তবে মনে মনে এই ভেবে শান্তি পেলাম যে আমাকে বঞ্চিত করে কৃপণের মত অনেক ঐশ্বর্য ভবিষ্যতের জন্য অন্যায়ভাবে গচ্ছিত রেখে মেমসাহেবের মনে অনুশোচনা দেখা দিয়েছে। আমি হাজার মাইল দূরে পালিয়ে এসেছিলাম। মেমসাহেব সেই আদর, ভাল-বাসা, সেই মজা, রসিকতা কিছুই উপভোগ করছিল না। আমাকে যতই বাধা দিক, আমি জানতাম রোজ আমার একটু আদর না পেলে ও শান্তি পেত না। আমি বেশ অনুমান করছিলাম ওর কি কষ্ট হচ্ছে; উপলব্ধি করছিলাম আমাকে কাছে না পাবার অতৃপ্তি ওকে কিভাবে পীড়া দিচ্ছে।

মনে মনে অনেক কষ্ট পেলেও ওর আসাটা বন্ধ করে ভালই করেছিলাম। দিল্লীতে আসার জন্য ও যে বেশ উতলা হয়েছিল সেটা বুঝতে কষ্ট হয় নি। তাইতো আরো তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্য আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম। ঠিক করলাম ওকে এনে চমকে দেব।

ভগবান আমাকে অনেকদিন বঞ্চিত করে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। দুঃখে অপমানে বছরের পর বছর জ্বলেপুড়ে মরেছি। কলকাতার শহরে এমন দিনও গেছে যখন মাত্র একটা পয়সার অভাবে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে পর্যন্ত চড়তে পারিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য! দিল্লীতে আসার পর আগের সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। সে পরিবর্তনের বিস্তৃত ইতিহাস তোমার এই চিঠিতে লেখার নয়। সুযোগ পেলে পরে শোনাব। তবে বিশ্বাস কর অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এলো আমার কর্মজীবনে। সাফল্যের আকস্মিক বন্যায় আমি নিজেকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

মাস ছয়েক পরে মেমসাহেব যখন আমাকে দেখবার জন্য দিল্লী

এলো, তখন আমি সবে বোর্ডিং হাউসের মায়া কাটিয়ে ওয়েস্টার্ন কোর্টে এসেছি। নিশ্চিত জানতাম মেমসাহেব আমাকে দেখে, ওয়েস্টার্ন কোর্টে আমার ঘর দেখে, আমার কাজকর্ম, আমার জীবন-ধারা দেখে চম্‌কে যাবে। কিন্তু আমি চমকে দেবার আগেই ও আমাকে চমকে দিল।

নিউদিল্লী স্টেশনে গেছি ডিলুক্স এয়ার কণ্ডিশন্‌ড এক্সপ্রেস অ্যাটেণ্ড করতে। মেমসাহেব আসছে। জীবনের এক অধ্যায় শেষ করে নতুন অধ্যায় শুরু করার পর ওর সঙ্গে এই প্রথম দেখা হবে

লাউডস্পীকারে অ্যানাউন্সমেণ্ট হলো, এ-সি-সি এক্সপ্রেস এক্ষুনি একনম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছবে। আমি সানগ্লাসটা খুলে রুমাল দিয়ে মুখটা আর একবার মুছে নিলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে দু'একটা টান দিতে না দিতেই ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল। এদিক-ওদিক দেখতে না দেখতেই মেমসাহেব দু' নম্বর চেয়ার কার থেকে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু একি? মেমসাহেবের কি বিয়ে হয়েছে? এত সাজ-গোছ? এত গহনা? মাথায় কাপড়, কপালে অতবড় সিঁদুরের টিপ।

মেমসাহেবকে কোনদিন এত সাজগোছ করতে দেখিনি। গহনা? শুধু ডানহাতে একটা কঙ্কণ। ব্যাস, আর কিচ্ছু না। গলায় হার? না, তাও না। কোন এক বন্ধুর বিপদে সাহায্য করার জন্য গলায় হার দিয়েছেন। তাছাড়া মাথার কাপড় আর কপালে অতবড় একটা সিঁদুরের টিপ দেখে অবাক হবার চাইতে ঘাবড়ে গেলাম বেশী। মুহূর্তের জন্য পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে গেল। গলাটা শুকিয়ে এলো, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। দুনিয়াটা ওলট-পালট হয়ে গেল।

প্রথমে ভাবলাম স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ঐ কয়েক হাজার লোকের

সামনে ওর গালে ঠাস করে একটা চড়. মারি। বলি, আমাকে অপমান করবার জন্য এত দূরে না এসে শুধু ইনভিটেশন লেটারটা পাঠালেই তো হতো।

আবার ভাবলাম, না, ওসব কিচ্ছু করব না, বলব না।

বিশেষ কথাবার্তা না বলে সোজা গিয়ে ট্যাক্সি চড়লাম।

ট্যাক্সিতে উঠেই মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করল। আমার বাঁ হাতটা টেনে নিল নিজের ডান হাতের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

'আমার কথা ছেড়ে দাও। এখন বল তুমি কেমন আছ? তোমার বিয়ে কেমন হলো? বর কেমন হলো? সর্বোপরি তুমি দিল্লী এলে কেন?'

মেমসাহেব একেবারে গলে গেল, সত্যি বলছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এমন হঠাৎ সবকিছু হয়ে গেল যে কাউকেই খবর দেওয়া হয় নি।...

'ছেলেটি কেমন?'

বেশ গর্বের সঙ্গে উত্তর এলো, ব্রিলিয়ান্ট।

'কোথায় থাকেন।'

'এইত তোমাদের দিল্লীতেই।'

আ মি চমকে্ উঠি, দিল্লীতে?

ও আমার গালটা একটু টিপে দিয়ে বলে, ইয়েস স্যার। তবে কি আমার বর আদি সপ্তগ্রাম বা মছলন্দপুর থাকবে?

ট্যাক্সি কনটপ্লেস ঘুরে জনপদে ঢুকে পড়ল। আর এক মিনিটের মধ্যেই ওয়েস্টার্ন কোর্ট এসে যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কোথায় যাবে?

'কোথায় আবার? তোমার ওখানে।'

ট্যাক্সি ওয়েস্টার্ন কোর্টে ঢুকে পড়ল। থামল। আমরা নামলাম। ভাড়া মিটিয়ে ছোট্ট স্যুটকেসটা হাতে করে ভিতরে ঢুকলাম।

রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে লিফট্-এ চড়লাম। তিন তলায় গেলাম। আমার ঘরে এলাম।

মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে দু'হাত দিয়ে মেমসাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আঃ কি শাস্তি!

আমার বুকটা জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল। ওর সিঁথিঁতে সিঁদুর না দেখে বুঝলাম···

এবার আমিও আর স্থির থাকতে পারলাম না। দু'হাত দিয়ে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। আদর করে, ভালবাসা দিয়ে ওকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলাম আমি। মেমসাহেবও তার উন্মত্ত যৌবনের জোয়ারে আমাকে অনেক দূর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার দেহে, মনে ওর ভালবাসা, আবেগ উচ্ছলতার পলিমাটি মাখিয়ে দিয়ে গেল। আমার মন আরো উর্বরা হলো।

এতদিন পরে দুজনে দুজনকে কাছে পেয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। কতক্ষণ যে ঐ জোয়ারের জলে ডুবেছিলাম, তা মনে নেই। তবে সম্বিত ফিরে এলো, দরজায় নক্ করার আওয়াজ শুনে।

তাড়াতাড়ি দুজনে আলাদা হয়ে বসলাম। আমি বললাম, কোন?

'ছোটা সাব, ম্যায়ঁ।'

ও জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমি বললাম, গজানন।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে ডাক দিলাম, এসো, ভিতরে এসো।

মেমসাহেবকে দেখেই গজানন দু'হাত জোড় করে প্রণাম করল, নমস্তে বিবিজি!

ও একটু হাসল। বলল, নমস্তে।

আমি বললাম, 'গজানন, বিবিজিকে কেমন লাগছে?'

'বহুত আচ্ছা, ছোটা সাব।' এক সেকেণ্ড পরে আবার বলল, আমার ছোট-সাহেবের বিবি কখনও খারাপ হতে পারে?

আমরা দুজনেই হেসে ফেলি। মেমসাহেব বলল, গজানন, বাবুজি প্রত্যেক চিঠিতে তোমার কথা লেখেন।

গজানন দু'হাত কচলে বলে, ছোটসাবকা মেহেরবানি।

আমি উঠে গিয়ে গজাননের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলি, জান মেমসাহেব, গজানন আমার লোক্যাল বস্। আমার গার্ডিয়ান।

'কিয়া করেগা বিবিজি, বাতাও। ছোটাসাব এমন বিশ্রী কাজ করে যে কোন সময়ের ঠিক ঠিকানা নেই। তারপর কিচ্ছু সংসারী বুদ্ধি নেই। আমি না দেখলে কে দেখবে বল? গজানন প্রায় খুনী আসামীর মত ভয়ে ভয়ে জেরার জবাব দেয়।

গজানন এবার মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করে, বিবিজি, ট্রেনে কোন কষ্ট হয় নি তো?

মেমসাহেব বললো, না, না, কষ্ট হবে কেন?

গজানন চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের দু'জনের ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে। ব্রেকফাস্টের ট্রে নামিয়ে রেখে গজানন চলে যায়, আমি যাচ্ছি। একটু পরেই আসছি।

গজানন চলে যাবার পর আমি মেমসাহেবের কোলে শুয়ে পড়লাম। আর ও আমাকে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিতে লাগল।

দোলাবৌদি, মেমসাহেব আর আমি অনেক কাণ্ড করেছি। বাঙালী হয়েও প্রায় হলিউড ফিল্মে অভিনয় করেছি। শেষপর্যন্ত অবশ্য শরৎ চাটুজ্যের 'হিট্' বই-এর মত হয়ে গেছে। আস্তে, আস্তে, ধীরে ধীরে সব জানবে। বেশী ব্যস্ত হয়ো না।

চৌদ্দ

মেমসাহেবের দিল্লীবাসের প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী জানবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে উঠেছ। মেমসাহেব কি বলল, কি করল, কেমন করে আদর করল, কোথায় কোথায় ঘুরল ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের প্রশ্ন তোমার মনে উদয় হচ্ছে। তাই না? হবেই তো। শুধু তুমি নও, সবারই হবে।

আমি সবকিছুই তোমাকে জানাব। তবে প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের সম্পর্ক এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিল যে, ইচ্ছা থাকলেও সবকিছু লেখা যায় না। তোমাকে কিছুটা অনুমান করে নিতে হবে। তাছাড়া মানুষের জীবনের ঐ বিচিত্র অধ্যায়ের সবকিছু কি ভাষা দিয়ে লেখা যায়?

বেলা এগারটার সময় ব্রেকফাস্ট খেয়ে ত্বু'ঘণ্টা ধরে বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে তুজনে কত কি করেছিলাম! কখনও ও আমাকে কাছে টেনেছে, কখনও বা আমি ওকে টেনে নিয়েছি আমার বুকের মধ্যে। কখনও আমি ওর ওষ্ঠে বিষ ঢেলেছি, কখনও বা আমার ওষ্ঠে ও ভালবাসা ঢেলেছে। কখনও আবার তু'জনে তু'জনকে দেখেছি প্রাণভরে। সে-দেখা যেন শুভদৃষ্টির চাইতেও অনেক মিষ্টি, অনেক স্মরণীয় হয়েছিল।

আমি বললাম, কতদিন বাদে তোমাকে দেখলাম! সারাজীবন ধরে দেখলেও আমার সে-লোকসান পূরণ হবে না।

আমার বুকের 'পর মাথা রেখে শুয়ে শুয়েই ও একটু হেসে শুধু বললো, 'তাই বুঝি?'

'তবে কি?'

বন-হরিণীর মত মুহূর্তের মধ্যে মেমসাহেবের চোখের দৃষ্টিটা

একটা ঘুরপাক দিয়ে আকাশের কোলে ভেসে বেড়াল কিছুক্ষণ। একটু পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কিন্তু তোমাকে রোজ দেখতে পেতাম।

আমি চম্‌কে উঠলাম, তার মানে?

ও একটু হাসল! দু' হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে প্রায় মুখের 'পর মুখ দিয়ে বললো, সত্যি তোমাকে রোজ দেখেছি।

এবার আর চমকে উঠিনি। হাসলাম। বললাম, কেন আজে-বাজে বকছ?

'আজে-বাজে নয় গো আজে-বাজে নয়। রোজ সকালে কলেজে বেরুবার পথে রাসবিহারীর মোড়ে এলেই মনে হতো তুমি দাঁড়িয়ে আছ, ইশারায় ডাকছ। তারপর আমরা চলেছি এসপ্লানেড, ডালহৌসী, হাওড়া।'

এবার মেমসাহেব উবুড় হয়ে শুয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার মুখের 'পর। 'বিকেলবেলায় ফেরার পথে তোমাকে যেন আরো বেশী স্পষ্ট করে দেখতে পেতাম। মনে হতো তুমি রাইটার্স বিল্ডিং-এর ডিউটি শেষ করে কোনদিন ডালহৌসী স্কোয়ারের ঐ কোণায়, কোনদিন লাটসাহেবের বাড়ির ওপাশে দাঁড়িয়ে আছ।'

এবার যেন হঠাৎ মেমসাহেব কেঁদে ফেলল। 'ওগো, বিশ্বাস কর, কলেজ থেকে ফেরবার পর বিকেল-সন্ধ্যা যেন আর কাটতে চাইত না...'

আমি চট করে মন্তব্য করলাম, রাত্রিটা বুঝি মহাশান্তিতে কাটাতে?

হঠাৎ যেন লজ্জায় ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার মুখের পাশে মুখটা লুকাল। আমি জানতে চাইলাম, কি হলো?

মুখ তুলল না। মুখ গুঁজে রেখেই ফিসফিস করে বললো, কিছু বলব না।

'কেন?'

'তোমার ডঁাট বেড়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। আমার কাছ থেকেও তুমি কিছু জানতে পারে না। তাছাড়া তোমার প্রাণের বন্ধু জয়া কি করেছিল, কি বলেছিল, সেসব কিছু তোমাকে বলব না।'

মেমসাহেব আর স্থির থাকতে পারে না। উঠে বসল। আমার হাতদু'টো ধরে বললো, ওগো, বল না, কি হয়েছিল।

আমি মাথা নেড়ে গাইলাম, 'কিছু বলব বলে এসেছিলেম, রইনু চেয়ে না বলে।'

প্রথমে খুব বীরত্ব দেখিয়ে মেমসাহেব গাইল, 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, খুব ভাল কথা। অত যখন বীরত্ব, তখন জয়ার কথা শুনে কি হবে?

আমার সোল প্রোপাইটার-কাম-ম্যানেজিং ডাইরেকটর ঘাবড়ে গেল। বোধহয় ভাবল, জয়া এই উঠতি বাজারে শেয়ার কিনে ভবিষ্যতে বেশ কিছু মুনাফা লুঠতে চায়। হয়ত আরো শেয়ার কিনে শেষপর্যন্ত অংশীদার থেকে—

ও প্রায় আমার বুকের 'পর লুটিয়ে পড়ল। 'বল না গো, জয়া কি করেছে?' এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার বললো, জয়া আমার বন্ধু হলে কি হয়! আমি জানি ও সুবিধের মেয়ে নয়, ও সবকিছু করতে পারে।

জান দোলাবৌদি, জয়া আমাকে কিছুই করে নি। তবে ও একটু বেশী স্মার্ট, বেশী মডার্ন। তাছাড়া বড়লোকের আদুরে মেয়ে বলে বেশ ঢলঢল ভাব আছে। আমার মত ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসলে জয়ার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাসতে হাসতে হয়ত দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, হয়ত কাঁধে মাথা রেখেই হিঃ হিঃ করতে লাগল। মেমসাহেব এসব জানে।

একবার আমি, মেমসাহেব আর জয়া ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট বেড়াতে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না হলো! হি-হি হা-হা করে হাসতে হাসতে জয়ার বুকের কাপড়টা পাশে পড়ে গিয়েছিল। মেমসাহেব দু' একবার ওকে ইশারা করলেও ও কিছু গ্রাহ্য করল না। রাগে গজগজ করছিল মেমসাহেব কিন্তু কিছু বলতে পারল না। আমি অবস্থা বুঝে চট করে উঠে একটু পায়চারি করতে করতে জয়ার পিছন দিকে চলে গেলাম। তারপর দেখি মেমসাহেব জয়ার আঁচল ঠিক করে দিল।

কলকাতা ফিরে মেমসাহেব আমাকে বলেছিল, এমন অসভ্য মেয়ে আর দেখিনি!

দিল্লীতে জয়ার ছোটকাকা হোম মিনিস্ট্রিতে ডেপুটি সেক্রেটারী ছিলেন। তাইতো মাঝে মাঝেই দিল্লী বেড়াতে আসত। মেমসাহেব হয়ত ভাবল না জানি ওর অনুপস্থিতিতে জয়া আরো কি করছে।

জয়ারা এর মধ্যে দু'বার দিল্লী এলেও আমার সঙ্গে একবারই দেখা হয়েছিল। তাও বেশীক্ষণের জন্য নয়। আর সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে জয়া আমার পবিত্রতা নষ্ট করবার কোন চেষ্টাও করে নি।

শুধু শুধু মেমসাহেবকে ঘাবড়ে দেবার জন্য জয়ার কথা বললাম।

রিপোর্টার হলেও হঠাৎ পলিটিসিয়ান হয়ে মেমসাহেবের সঙ্গে একটু পলিটিক্স্ করলাম। কাজ হলো।

শর্ত হলো মেমসাহেব আগে সবকিছু বলবে, পরে আমি জয়ার কথা বলব।

বেল বাজিয়ে গজাননকে তলব করে হুকুম দিলাম, হাফ-সেট চায় লেআও।

গজানন মেমসাহেবের কাছে আর্জি জানাল, বিবিজি, ছোটসাবকা চায় পিনা থোড়ি কমতি হোনা চাইয়ে।

মেমসাহেব একবার আমাকে দেখে নিয়ে গজাননকে বললো, তোমার ছোটসাব আমার কিছু কথা শোনে না।

ওর কথা শুনে স্নেহাতুর বৃদ্ধ গজাননও হেসে ফেলল। 'এ-কথা ঠিক না বিবিজি ছোটসাব চব্বিশ ঘণ্টা শুধু তোমার কথাই বলে।'

'গজানন, তুমিও তোমার ছোটাসাব-এর পাল্লায় পড়ে মিথ্যা কথা বল।'

গজানন জিভ কেটে বললো, ভগবান কা কসম বিবিজি, ঝুট আমি কক্ষনো বলব না।

মেমসাহেব হাসল, আমি হাসলাম।

গজানন বললো, যদি তোমার গুস্‌সা না হয়, তাহলে তোমাকে একটা কথা বলতাম।

মেমসাহেব বললো, তোমার কথায় আমি কেন রাগ করব?

'ছোটাসাব তোমাকে ভীষণ প্যার করে।'

'কি করে বুঝলে?' মেমসাহেব জেরা করে।

গজানন হাসল। বললো, বিবিজি, আমি তোমাদের আংরেজি পড়িনি। তোমাদের মত আমার দিমাগ নেই। এই দিল্লীতে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেল। অনেক বড় বড় লোক দেখলাম কিন্তু হামারা ছোটাসাব-এর মত লোক খুব বেশী হয় না।

আমি গজাননকে একটা দাবড় দিয়ে বলি, যা, ভাগ। চা নিয়ে আয়।

গজানন চা আনল। চলে যাবার সময় আমি বললাম, গজানন, কিছু টাকা রেখে যেও।

গজানন চোখ দিয়ে মেমসাহেবকে ইশারা করে বললো, হ্যাগো বিবিজি, টাকা দেব নাকি?

আমি উঠে গজাননকে একটা থাপ্পড় মারতে গেলেই ও দৌড় দিল।

চা খেতে খেতে মেমসাহেব কি বলল জান? বলল অনেক কিছু।

একদিন সকালে উঠে মেজদি ওকে বলল, আমি আর পারছি না।

মেমসাহেব জানতে চাইল, কি পারছিস না রে?

'প্রক্সি দিতে।'

'কিসের প্রক্সি? কার প্রক্সি?'

'কার আবার? রিপোর্টারের।'

মেমসাহেব বলল, অসভ্যতা করবি না মেজদি। মনে মনে কিন্তু সত্যি একটু চিন্তিতা হলো।

একটু পরে একটু ফাঁকা পেয়ে মেমসাহেব মেজদিকে ধরল। 'হ্যারে কি হয়েছে রে?'

মেজদি দর কষাকষি করে, যা চাইব তাই দিবি বল।

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিল মেমসাহেব। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা একটু কামড়ে ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্তের জন্য ভেবে নিল। 'ঠিক আছে যা চাইবি তাই দেবে।'

মেজদি ওস্তাদ মেয়ে। কাঁচা কাজ করবার পাত্রী সে নয়। তাই গ্যারান্টি চাইল। 'মা কালীর ফটো ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আমি যা চাইব তাই দিবি।'

ও ঘাবড়ে যায়। একবার ভাবে মেজদি ঠকিয়ে কিছু আদায় করবে। আবার ভাবে, না, না, কিছু দিয়েও খবরটা জানা দরকার। মেমসাহেবের দোটানা মন শেষপর্যন্ত মেজদির ফাঁদে আটকে যায়। মা কালীর ফটো ছুঁয়েই প্রতিজ্ঞা করল, আমাকে সবকিছু খুলে বললে তুই যা চাইবি, তাই দেব।

মেজদি ওকে টানতে টানতে ঐ কোণার ছোট্ট বসবার ঘরে নিয়ে দরজা আটকে দেয়। মেমসাহেবের বুকটা টিপটিপ করে। গোল টেবিলের পাশ থেকে হুটো চেয়ার টেনে হুজনে পাশাপাশি বসল।

মেজদি শুরু করল, রাত্তিরে তুই কি করিস, কি বকবক করিস, তা জানিস ?

'কি করি রে মেজদি ?'

'কি আর করবি ? আমাকে রিপোর্টার ভেবে কত আদর করিস, তা জানিস ?'

লজ্জায় আমার কালো মেমসাহেবের মুখও লাল হয়েছিল। বলেছিল, যা যা, বাজে বকিস না।

মেজদি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ঠিক আছে। না শুনতে চাস, ভাল কথা।

ও তাড়াতাড়ি মেজদির হাত ধরে বসিয়ে দেয়, আচ্ছা যা বলবি বল।

'তোর আদরের চোটে তো আমার প্রাণ বেরুবার দায় হয়।'···

'কেন মিথ্যে কথা বলছিস ?'

মেজদি মুচকি হাসতে হাসতে বললো, মা কালীর ফটো ছুঁয়ে বলব ?

'না, না, আর মা কালীর ফটো ছুঁয়ে বলতে হবে না।'

'শুধু কি আদর ? কত কথা বলিস !'

'ঘুমিয়ে ? ঘুমিয়ে ?'

মেজদি মুচকি হেসে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞাসা কর।'

'মা শুনেছে ?' মেমসাহেব চমকে ওঠে।

'একদিন তো ডেফিনিট শুনেছে, হয়ত রোজই শোনে।'

ও তাড়াতাড়ি মেজদির হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, কি কথা বলেছি রে ?

নির্লিপ্তভাবে মেজদি উত্তর দিল তুই ওকে যা যা বলে আদর করিস, তাই বলেছিস। আবার কি বলবি ?

সোফায় বসে সেণ্টার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। মেমসাহেব ডান হাত দিয়ে আমার মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, দেখেছ, ঘুমিয়েও তোমাকে ভুলতে পারি না।

একটু চুপ করে এবার ফিসফিস করে বলল, দেখেছ, তোমাকে কত ভালবাসি!

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধুঁয়া ছেড়ে বললাম, ঘোড়ার ডিম ভালবাস। যদি সত্যি সত্যিই ভালবাসতে, তাহলে আজও মেজদি তোমার পাশে শোবার সাহস পায়?

মেমসাহেব আমাকে ভেংচি কেটে বলল, শুতে দিচ্ছি আর কি!

এবার আমি ওর কানে কানে বললাম, আজ তো আমার হাতে লাটাই। আজ কোথায় উড়ে যাবে? তাছাড়া আজ তো তুমি আমাকে পুরস্কার দেবে।

'পুরস্কার?'

'সেই যে—যা চাইবে, তাই পাবে—পুরস্কার!'

মেমসাহেব আমার পাশ থেকে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যেতে যেতে বলল, আমি আজই কলকাতা পালাচ্ছি।

নাটকের এই এক চরম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আবার গজাননের আবির্ভাব হলো। বেশ মেজাজের সঙ্গে বলল, দুটো বেজে গেছে। তোমরা কি সারাদিনই গল্প-গুজব করবে? খাওয়া-দাওয়া করবে না?

দু'টো বেজে গেছে? দু'জনেই এক সঙ্গে ঘড়ি দেখে ভীষণ লজ্জিত বোধ করলাম। গজাননকে বললাম, লাঞ্চ নিয়ে এস। দশ মিনিটে আমরা স্নান করে নিচ্ছি।

দিল্লীতে আমাদের দ্বৈত জীবনের উদ্বোধন সঙ্গীত কেমন লাগল? মনে হয় খারাপ লাগে নি। আমারও বেশ লেগেছিল।

অনেক দুঃখ কষ্ট, সংগ্রামের পর এই আনন্দের অধিকার অর্জন করেছিলাম। তাইতো বড় মিষ্টি লেগেছিল এই আনন্দের আত্মতৃপ্তির আস্বাদন।

মেজদিকে ম্যানেজ করে কলেজ থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে ও আমার কাছে এসেছিল। এসেছিল অনেক কারণে, অনেক প্রয়োজনে। সমাজ-সংস্কারের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করে একটু মিশতে চেয়েছিলাম আমরা দুজনেই। মেমসাহেবের দিল্লী আসার কারণ ছিল সেই মুক্তির স্বাদ, আনন্দ উপভোগ করা।

আরো অনেক কারণ ছিল। শূন্যতার মধ্যে দুজনেই অনেক দিন ভেসে বেড়িয়েছিলাম। দুজনেরই মন চাইছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়। সেই আশ্রয়, সেই সংসার বাঁধার জন্য অনেক কথা বলবার ছিল। দুজনেরই মনে মনে অনেক কল্পনা আর পরিকল্পনা ছিল। সেসব সম্পর্কেও কথাবার্তা বলে একটা পাকা সিদ্ধান্ত নেবার সময় হয়েছিল।

যাই হোক এক সপ্তাহ কোন কাজকর্ম করব না বলে আমিও ছুটি নিয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মেমসাহেবকে ট্রেনে চড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত টাইপরাইটার আর পার্লামেণ্ট হাউস স্পর্শ করব না। চেয়েছিলাম প্রতিটি মুহূর্ত মেমসাহেবের সান্নিধ্য উপভোগ করব।

সত্যি বলছি দোলাবৌদি, একটি মুহূর্তও নষ্ট করিনি। ভগবান আমাদের বিধি-নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ জানতেন বলে একটি মুহূর্তও অপব্যয় করতে দেননি। কথায়, গল্পে, গানে, হাসিতে ভরিয়ে তুলেছিলাম ঐ ক'টি দিন।

লাঞ্চ খেতে খেতে অনেক বেলা হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করে নামবার পর থেকে মেমসাহেব একটুও বিশ্রাম করতে পারে নি। আমি বললাম, মেমসাহেব, তুমি একটু বিশ্রাম কর, একটু ঘুমিয়ে নাও।

'এই ক'মাসে কলকাতায় অনেক ঘুমিয়েছি, অনেক বিশ্রাম করেছি। তুমি আর আমাকে ঘুমুতে বল না।'

এক মিনিট পরেই বলল, তার চাইতে তুমি বরং একটু শোও। আমি তোমার গায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

'আমি কেন শোব?'

'শোও না। আমি তোমার পাশে বসে বসে গল্প করব।'

শোবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। দিল্লীর কাব্যহীন জীবনে অনেকদিন এমনি একটি পরম দিনের স্বপ্ন দেখেছি।

মেমসাহেব বিশ্রাম করল না কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই শুয়ে পড়লাম। ও আমার পাশে বসে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গুনগুন করে গান গাইছিল। কখনও কখনও আবার একটু আদর করছিল। কি আশ্চর্য আনন্দে যে আমার সারা মন ভরে গিয়েছিল, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। স্বপ্ন যে এমন করে বাস্তবে দেখা দিতে পারে, তা ভেবে আমি অদ্ভুত সাফল্য, সার্থকতার স্বাদ উপভোগ করলাম।

বালিশ দু'টোকে ডিভোর্স করে মেমসাহেবের কোলে মাথা রেখে দু'হাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে চোখ বুজলাম।

ও জিজ্ঞাসা করল, ঘুম পাচ্ছে?

কথা বললাম না, শুধু মাথা নেড়ে জানালাম, না।

'ক্লান্ত লাগছে?'

'না।'

'তবে?'

'স্বপ্ন দেখছি।'

'স্বপ্ন?'

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখছি।

'মুখটা আমার মুখের কাছে এনে ও জানতে চাইল, কি স্বপ্ন দেখছ?'

'তোমাকে স্বপ্ন দেখছি।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ, তোমাকে।'

'আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি। আমাকে আবার কি স্বপ্ন দেখছ ?'

ওর কোলের 'পর মাথা রেখেই চিৎ হয়ে শুলাম। দু'হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বললাম, হ্যাঁ, তোমাকেই স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন দেখছি, জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমি এমনি করে তোমার কোলে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাচ্ছি, ভালবাসা পাচ্ছি, ভরসা পাচ্ছি।

মুহূর্তের জন্য গর্বের বিদ্যুৎ চমকে উঠে মেমসাহেবের সারা মুখটা উজ্জ্বল করে তুললো। পরের মুহূর্তেই ওর ঘন কালো গভীর উজ্জ্বল দুটো চোখ কোথায় যেন তলিয়ে গেল। আমাকে বলল, ওগো, তুমি আমাকে অমন করে চাইবে না, তুমি আমাকে এত ভালবাসবে না।

'কেন বল তো ?'

'যদি কোনদিন কোন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে, যদি কোনদিন আমি তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে না পারি, সেদিন তুমি সে দুঃখ, সে আঘাত সহ্য করতে পারবে না।'

আমি মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, তা হতে পারে না মেমসাহেব। আমার স্বপ্ন ভেঙে দেবার সাহস তোমারও নেই, ভগবানেরও নেই।

আমার কথা শুনে বোধহয় ওর একটু গর্ব হলো। বলল, আমি জানি তুমি আমাকে ছাড়া তোমার জীবন কল্পনা করতে পার না কিন্তু তাই বলে অমন করে বলো না।

'কেন বলব না মেমসাহেব ? তোমার মনে কি আজো কোন সন্দেহ আছে ?'

'সন্দেহ থাকলে কেউ এমন করে ছুটে আসে !'

মেমসাহেব আবার থামে। আবার বলল, তোমার দিক থেকে যে আমি কোন আঘাত পাব না, তা আমি জানি। ভয় হয় নিজেকে নিয়েই। আমি কি পারব তোমার আশা পূর্ণ করতে? পারব কি সুখী করতে?

'তুমি না পারলে আর কেউ তো পারবে না মেমসাহেব। তুমি না পারলে স্বয়ং ভগবানও আমাকে সুখী করতে পারবেন না।'

আরো কত কথা হলো। কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে যায়, বিকেল ঘুরে সন্ধ্যা হলো। ঘর-বাড়ি রাস্তাঘাটে আলো জ্বলে উঠল।

মেমসাহেব বলল, ছাড়। আলোটা জ্বেলে দিই।

'না, না, আলো জ্বেলো না। এই অন্ধকারেই তোমাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আলো জ্বাললেই আরো অনেক কিছু দেখতে হবে।'

'পাগল কোথাকার!'

'এমন পাগল আর পাবে না।'

ও আমাকে চেপে জড়িয়ে ধরে বলল, এমন পাগলীও আর পাবে না।

'ভগবান অনেক হিসাব করেই পাগলার কপালে পাগলী জুটিয়েছেন। তা না হলে, কি এত মিল, এত ভালবাসা হয়?'

ঐ অন্ধকারের মধ্যেই আরো কিছু সময় কেটে গেল।

মেমসাহেব বলল, চলো, একটু ঘুরে আসি।

'তোমার কি বেড়াতে ইচ্ছা করছে?'

'কলকাতায় তো কোনদিন শান্তিতে বেড়াতে পারিনি। এখানে অন্ততঃ কোন দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুরতে হবে না।'

মেমসাহেব আলো জ্বালল। 'বেল' টিপে বেয়ারা ডাকল। চা আনাল। চা তৈরী করল। আমি শুয়ে শুয়েই এক কাপ চা খেলাম।

এবার মেমসাহেব তাড়া দেয়, নাও, চটপট তৈরী হয়ে নাও।

আমি শুয়ে শুয়েই বললাম, ওয়াড্রবটা খোল। আমাকে একটা প্যাণ্ট আর বুশশার্ট দাও।

মেমসাহেব লম্বা বেণী দুলিয়ে বেশ হেলেদুলে এগিয়ে গিয়ে ওয়াড্রব খুলেই প্রায় চীৎকার করে উঠল, একি তোমার ওয়াড্রবে শাড়ি ?

একবার শাড়িগুলো নেড়ে বলল, এ যে অনেক রকমের শাড়ি। ঘুরে ঘুরে কালেকশন করেছ বুঝি ?

ও আমার প্যাণ্ট-বুশ-শার্ট না দিয়ে হাঙ্গার থেকে একটা কটকি শাড়ি এনে আমার কাছে আব্দার করল, আমি এই শাড়িটা পরব ?

'তবে কি আমি পরব ?'

শাড়িটার দু-একটা ভাঁজ খুলে একটু জড়িয়ে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, লাভলি !

'কি লাভলি ? শাড়ি না আমি ?'

শাড়িটা গায়ে জড়িয়েই আয়নার সামনে একটু ঘুরে গেল মেমসাহেব। বলল, ইউ আর নটেরিয়াস বাট শাড়ি ইজ লাভলি।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধরতেই ও বকে উঠল, সব সময় জড়াবে না। শাড়িটার ভাঁজ নষ্ট করো না।

চট করে ও এবার আমার দিকে ঘুরে আমার মুখের দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে বলল, ওগো ব্লাউজের কি হবে ? তুমি নিশ্চয়ই ব্লাউজ পিস কেননি ?

আমি ওর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘরের কোণায় নিয়ে গিয়ে একটা ছোট স্যুটকেস খুলে দিলাম। 'নটি গার্ল ! হ্যাভ এ লুক।'

হাসতে হাসতে বলল, ব্লাউজ তৈরী করিয়েছ ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মাপ পেলে কোথায় ?'

'তোমার ব্লাউজের মাপ আমি জানি না ?'

আমার মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি আসে। কানে কানে বলি, স্যুড আই টেল ইউ ইউর ভাইট্যাল স্ট্যাটিকটিকস ?

মেমসাহেব আমার পাশ থেকে পালিয়ে যেতে যেতে বলল, কেবল অসভ্যতা! জার্নালিস্টগুলো বড় অসভ্য হয়, তাই না ?'

'তোমাদের মত ইয়ং আনম্যারেড প্রফেসারগুলো বড় ধার্মিক হয়, তাই না ?'

'কি করব ? তোমাদের মত এক-একটা দস্যু-ডাকাতের হাতে পড়লে আমাদের কি নিস্তার আছে ?

আমি যেন আরো কি বলতে গিয়েছিলাম, ও বাধা দিয়ে বলল, এবার তর্ক বন্ধ করে বেরুবে কি ?

মেমসাহেব শাড়িটা সোফার 'পর রেখে নিজের সুটকেস থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি বের করে বলল, এই নাও পর।

'এবারও জড়িপাড় ধুতি দিলে না ?'

'জড়িপাড় ধুতি না পাবার জন্য তোমার কি কিছু অসুবিধা বা ক্ষতি হচ্ছে ?'

দোলাবৌদি, আমার জীবনের সেসব স্মরণীয় দিনের কথা স্মৃতিতে অমর অক্ষয় হয়ে আছে। আজ আমি রিক্ত, নিঃস্ব। ভিখারী। আজ আমার বুকের ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে অহরহ রাবণের চিতা জ্বলছে। গঙ্গা-যমুনা নর্মদা-গোদাবরীর সমস্ত জল দিয়েও এ আগুন নিভবে না, নেভাতে পারে না।

বাইরে থেকে আমার চাকচিক্য দেখে, আমার পার্থিব সাফল্য দেখে, আমার মুখের হাসি দেখে সবাই আমাকে কত সুখী ভাবে। কত মানুষ আরো কত কি ভাবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কতজনের কত বিচিত্র ধারণা! মনে মনে আমার হাসি

পায়। একবার যদি চিৎকার করে কাঁদতে পারতাম, যদি তারস্বরে চিৎকার করে সব কিছু বলতে পারতাম, যদি হনুমানের মত বুক চিরে আমার অন্তরটা সবাইকে দেখাতে পারতাম তবে হয়ত—

দেখেছ, আবার কি আজে-বাজে বকতে শুরু করেছি? তোমাকে তো আগেই লিখেছি ঐ পোড়াকপালীর কথা লিখতে গেলে, ভাবতে গেলে, মাঝে মাঝেই আমার মাথাটা কেমন করে উঠে। আরো একটু ধৈর্য ধর। তুমি হয়ত বুঝবে আমার মনের অবস্থা।

দোলাবৌদি আমাদের দুজনের কাহিনী নিয়ে ভলিউম ভলিউম বই লেখা যায়। সেই সাত দিনের দিল্লী বাসের কাহিনী নিয়েই হয়ত একটা চমৎকার উপন্যাস লেখা হতে পারে। তাছাড়া তিন দিনের জন্য জয়পুর আর সিলিসের ঘোরা? আহাহা! সেই তিনটি দিন যদি তিনটি বছর হতো। যদি সেই তিনটি দিন কোন দিনই ফুরাত না?

দিল্লীতে সেই প্রথম রাত্রিতে আমরা এক মিনিটের জন্যও ঘুমুলাম না। সারা রাত্রি কথা বলেও ভোরবেলায় মনে হয়েছিল যেন কিছুই বলা হলো না? মনে হয়েছিল যেন বিধাতাপুরুষের রসিকতায় রাত্রিটা হঠাৎ ছোট হয়েছিল। সকালবেলায় সূর্যকে অসহ্য মনে হয়েছিল।

মোটা পর্দার ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি চুরি করে আমাদের ঘরে ঢুকে বেশ উৎপাত শুরু করেছিল। কিন্তু তবুও ও আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে ছিল আর গুনগুন করে গাইছিল, আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।···

আমি প্রশ্ন করলাম, সত্যি?

ও বলল, তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো। তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও—

'আমি আবার কোথায় যাব?'

মেমসাহেব মাথা নেড়ে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার গাইতে থাকে, 'আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো।

'সিওর ?'

'সিওর।' ও এবার কনুই-এর ভর দিয়ে ডান হাতে মাথাটা রেখে বাঁ হাত দিয়ে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গাইল—

আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ-মাস।
যদি যদি আর-কারে ভালবাস·····

আমি বললাম, তুমি পারমিশন দেবে ?

মেমসাহেব হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই আবার গাইল—

আর যদি ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও,
আমি যত দুঃখ পাই গো।

আমি বললাম, আমি আর কিছু চাইছি না, তুমিও দুঃখ পাবে না।

ও আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে চেপে ধরে ঠোঁটে একটু ভালবাসা দিয়ে বলল, আমি তা জানি গো, জানি।

সকালবেলায় চা খেতে খেতে মেমসাহেব বলল, ওগো, চলো না দুদিনের জন্য জয়পুর ঘুরে আসি।

আইডিয়াটা মন্দ লাগল না। ঐ চা খেতে খেতেই প্ল্যান হয়ে গেল। একদিন জয়পুর, একদিন সিলিসের ফরেস্ট বাংলোয় থাকব। তারপর দিল্লী ফিরে এসে কিছু ঘোরাঘুরি, দেখাশুনা আর সংসার পাতার বিধিব্যবস্থা করা হবে বলেও ঠিক করলাম।

আমাকে কিছু করতে হলো না, মেমসাহেব আমার একটা অ্যাটাচির মধ্যে দুদিনের প্রয়োজনীয় সব কিছু ভরে নিয়েছিল। আমি দু'একবার এটা ওটা নেবার কথা বলেছিলাম। ও বলেছিল, তুমি চুপ করো তো।

আমি চুপ করেছিলাম। রাত্রে আমেদাবাদ মেল ধরে পরদিন ভোরবেলায় জয়পুর পৌঁছলাম।

ট্রেনে?

ট্রেনের কথা কি লিখব? সেকেণ্ড ক্লাসে গিয়েছিলাম। কম্পার্টমেণ্টে আরো প্যাসেঞ্জার ছিলেন। অনেক কিছুই তো ইচ্ছা করেছিল কিন্তু···। তবে দুজনে এক কোণায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছিলাম। মেমসাহেবকে শুতে বলেছিলাম কিন্তু রাজী হয় নি। ও বলেছিল, তুমি শোও। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

'না, না, তা হয় না।'

'কেন হবে না?'

'তুমি জেগে থাকবে আর আমি ঘুমাব?'

'আগে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। পরে আমি ঘুমাব।'

আমার ঘুমুতে ইচ্ছা করছিল না। তাই বললাম, তাছাড়া এইটুকু জায়গায় কি ঘুমান যায়?

'এইত আমি সরে বসছি। তুমি আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়।'

আমার হাসি পেল।

'হাসছ কেন?'

হাসতে হাসতেই আমি জবাব দিলাম, 'রেলের এই কম্পার্টমেণ্টেও কি তুমি আমাকে আদর করবে ?'

ও রেগে গেল। 'বেশ করব। একশবার করব। আমি কি পরপুরুষকে আদর করছি ?'

মেমসাহেব একটু সরে বসল। আমি ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

ও আমার মাথায় মুখে হাত দিয়ে আদর করে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা শুরু করল। কয়েক মিনিট বাদে মুখটা আমার মুখের 'পর এনে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ঘুমুচ্ছ ?'

'না।'

'ঘুমুবে না ?'

'না।'

'কেন ?'

'এত সুখে, এত আনন্দে ঘুম আসে না।'

এবার মেমসাহেব হাসল। জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি ভাল লাগছে ?'

'খুব ভাল লাগছে।'

ও চুপ করে যায়। কিছু পরে ও আবার হুমড়ি খেয়ে আমার মুখের 'পর পড়ল। বললো, 'একটা কথা বলব ?'

'বল।'

'তুমি রোজ এমনি করে আমার কোলের 'পর মাথা রেখে শোবে, আর আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

'কেন ?'

'কেন আবার ? আমার ইচ্ছা করে, ভাল লাগে।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। ওর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে হাসছিলাম।

মেমসাহেব দু'হাত দিয়ে আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'হাসছ কেন ?'

'এমনি।'

'না, তুমি অমন করে হাসবে না।'

'বেশ।'

মেমসাহেব আবার আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল যে সত্যি সত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভেঙেছিল একেবারে ভোরবেলায়। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে চারটে। মেমসাহেবও ঘুমুচ্ছিল। দু'হাতে আমার মুখটা জড়িয়ে ধরে মাথাটা হেলান দিয়ে বসে বসেই ঘুমুচ্ছিল। ভীষণ লজ্জা, ভীষণ কষ্ট লাগল। আমি উঠে বসতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। আমি কিছু বলবার আগেই ও জিজ্ঞাসা করল, 'উঠলে যে?'

আমি ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কটা বাজে জান?'

'কটা?'

'সাড়ে চারটে।'

'তাই বুঝি।'

'তুমি সারা রাত্রি এইভাবে বসে বসেই কাটালে?'

ঐ আবছা আলোতেই আমি দেখতে পেলাম একটু হাসিতে মেমসাহেবের মুখটা উজ্জ্বল হয়েছিল। বললো, 'তাতে কি হলো।'

আমি রেগে বললাম, 'তাতে কি হলো? সারা রাত্রি আমি মজা করে শুয়ে রইলাম আর তুমি বসে বসে কাটিয়ে দিলে?'

শান্ত স্নিগ্ধ মেমসাহেব আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'রাগ করছ কেন? বিশ্বাস কর, আমার একটুও কষ্ট হয় নি।'

আমি উপহাস করে বললাম, 'না, না, কষ্ট হবে কেন? বড্ড আরামে ঘুমিয়েছ।'

আবার সেই মিষ্টি হাসি, স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠ। 'আরাম না হলেও আনন্দ তো পেয়েছি।'

জান দোলাবৌদি, পোড়াকপালী এমনি করে ভালবেসে আমার সর্বনাশ করেছে।

জয়পুরে গিয়ে কি করেছিল জান? হোটেলে গিয়ে স্নান করে ব্রেকফাস্ট খাবার পর আমি বললাম, 'কাপড়-চোপড় পালটে নাও।'

'কেন?'

'কেন আবার? ঘুরতে বেরুব।'

'কোথায় আবার ঘুরবে?'

'জয়পুর এসে সবাই যেখানে ঘুরতে যায়।'

ও বললো, 'আমি তো অম্বর প্যালেস বা হাওয়া মহল দেখতে আসিনি।'

'তবে জয়পুর এলে কেন?'

'কেন আবার? তোমাকে নিয়ে বেড়াতে এলাম। এতদিন ধরে পরিশ্রম করছ। তাই একটু বিশ্রাম পাবে বলে জয়পুর এলাম।'

আমি বললাম, 'দিল্লীতেই তো বিশ্রাম করতে পারতাম।'

'ভাবলাম আমার সঙ্গে একটু বাইরে গেলে আরো ভাল লাগবে, তাই এলাম।'

লনের এক কোণায় একটা গাছের ছায়ায় বসে বসে সারা সকাল কাটিয়ে দিলাম আমরা।

'ওগো তুমি যখন গাড়ি কিনবে তখন প্রত্যেক উইক-এণ্ডে আমরা বাইরে বেরুব। কেমন?'

আঙুল দিয়ে নিজের দিকে দেখিয়ে বললাম, 'আমি গাড়ি কিনব?'

'তবে কি আমি কিনব?'

'তুমি কি পাগল হয়েছ ?'

'কেন তুমি বুঝি গাড়ি কিনবে না ?'

'দূর পাগল। আমি গাড়ি কেনার টাকা পাব কোথায় ?'

ও যেন সত্যি একটু রেগে গেল। 'তুমি কথায় কথায়, আমায় পাগল পাগল বলবে না তো।'

'পাগলের মত কথা বললেও পাগল বলব না ?'

ভ্রূ কুঁচকে ও প্রায় চীৎকার করে বললো, 'না।'

একটু পরে আবার বললো, 'গাড়ি কেনবার কথা বলায় পাগলামি কি হলো ?'

আমি একটা সিগরেট ধরিয়ে ওর মুখে ধুঁয়া ছেড়ে বললাম, 'কিচ্ছু না।'

আশ্চর্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও বললো, 'দেখ না এক বছরের মধ্যে তোমার গাড়ি হবে।'

'তুমি জান ?'

'একশ' বার জানি।'

একটু পরে আবার কি বললো জান ? মেমসাহেব আমার গা ঘেঁষে বসে আমার কাঁধের 'পর মাথা রেখে আধো-আধো স্বরে বললো, 'ওগো, তুমি আমাকে ড্রাইভিং শিখিয়ে দেবে ?'

ও তখন বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেনের চাইতেও অনেক বেশী গতিতে উপরে উঠছিল। সুতরাং আমি অযথা বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

মনে মনে আমার হাসি পাচ্ছিল কিন্তু অনেক চেষ্টায় সে হাসি চেপে রেখে বেশ স্বাভাবিক হয়ে জানতে চাইলাম, 'কি গাড়ি কিনতে চাও ?'

আমার প্রশ্নে ও খুব খুশি হলো। হাসিতে মুখটা ভরে গেল। টানা টানা চোখ দুটো যেন আরো বড় হলো। বললো, 'তোমার কোন্ গাড়ি পছন্দ ?'

ওকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বললাম, 'গাড়ি কিনলে তো তোমার পছন্দ মতই কিনব।'

ও মনে মনে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল। তাইতো মুহূর্তের মধ্যে উত্তর দিল, 'স্ট্যাণ্ডার্ড হেরল্ড!'

'তোমার বুঝি স্ট্যাণ্ডার্ড হেরল্ড খুব পছন্দ', আমি জানতে চাইলাম।

'গাড়িটা দেখতেও ভাল তাছাড়া…'

মেমসাহেব এগুতে গিয়ে একটু থামল। তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাছাড়া কি?'

হাসি হাসি মুখে ও উত্তর দিল, 'ঐ গাড়িটা যে টু-ডোর।'

'তাতে কি হলো?'

যেন মহা বোকামি করেই ঐ প্রশ্নটা করেছিলাম। ও বললো, 'বাঃ, তাতে কি হলো?'

খুব সিরিয়াস হয়ে বললো, 'বাচ্চাদের নিয়ে ঐ গাড়িতে যাওয়ায় কত সুবিধা জান? হঠাৎ দরজা খুলে পড়ে যাবার কোন ভয় নেই, তা জান?'

মেমসাহেবের কল্পনার বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেন তখন চল্লিশ হাজার ফুট উপরে উড়ছে। তাছাড়া প্রায় সাড়ে পাঁচশ-ছ'শো মাইল স্পীডে ছুটে চলেছিল। আমি সেই উড়ো জাহাজের কো-পাইলট হয়েও ওকে পালামের মাটিতে নামাতে পারলাম না। মনে মনে কষ্ট হলো। তাছাড়া আগামী দিনের ওর স্বপ্ন হয়ত আমারও ভাল লেগেছিল। মুখে শুধু বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।'

দুপুর বেলা লাঞ্চের পর দুজনে শুয়ে শুয়ে আরো কত গল্প শুনলাম।…

'ওগো, খোকনের খুব ইচ্ছা একবার তোমার কাছে আসে।'

আমি বললাম, 'পাঠিয়ে দিও না।'

'না, না, এখন না। আগে আমাদের সংসার হোক, তারপর আসবে।'

আমি জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা মেমসাহেব, তুমি খোকনকে খুব ভালবাস, তাই না?'

মেমসাহেব বললো, 'কি করব বল? কাকাবাবুকে তো আমরা কোনদিনই ভাড়াটে ভাবি না। কাকিমা বেঁচে থাকলে হয়ত অত মেলামেশা ভাব হতো না। তাছাড়া কাকাবাবু অফিস আর টিউশনি নিয়ে প্রায় সারাদিনই বাড়ির বাইরে। তাই আমরা ছাড়া খোকনকে কে দেখবে বলো?'

আমি বললাম, 'তাতো বুঝলাম কিন্তু তুমি খোকনকে একটু বেশী ভালবাস।'

পাশ ফিরে শুয়ে আমাকে আর একটু কাছে টেনে নিয়ে ও বললো, 'কেন তোমার হিংসা হয়?'

আমি উত্তর দিলাম, 'আমার হিংসা হবে কেন?'

আমিও একটু পাশ ফিরে শুলাম। বললাম, 'গতবার খোকন যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, তখন তুমি কি কাণ্ডটাই না করলে?'

'করব না? আমরা ছাড়া ওর কে আছে বল?'

'আমরা, আমরা বলছ কেন? বল আমি ছাড়া কে করবে?'

ও কোন উত্তর দিল না। শুধু হাসল। একটু পরে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, 'আমি বাড়ির মধ্যে সব চাইতে ছোট। কেউ আমাকে দিদি বলে ডাকে না। ছোটবেলা থেকেই আমার একটা ভাই'এর শখ।......'

'তাই বুঝি?'

কি যেন ভেবে ও হাসল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাসছ কেন?'

'ছোটবেলার একটা কথা মনে হলো।'

'কি কথা?'

মেমসাহেব আবার হাসল। বললো, 'ছোটবেলায় একটা ভাই দেবার জন্য আমি মাকে খুব বিরক্ত করতাম।'

আমি হাসলাম।

হাসতে হাসতেই ও বললো, 'সত্যি বলছি, অনেকদিন পর্যন্ত একটা ভাই দেবার জন্য মাকে বিরক্ত করেছি। আর আমি যেই ভাই'এর কথা বলতাম সঙ্গে সঙ্গে দিদিরা চলে যেত আর মা আমাকে বকুনি দিয়ে ভাগিয়ে দিতেন।'

'তাই বুঝি তুমি খোকনকে এত ভালবাস?'

'অনেকটা তাই। তাছাড়া খোকন ছেলেটাও ভাল আর আমাকেও ভীষণ ভালবাসে।'

'সেকথা সত্যি।'

ও চট্ করে আমার ঠোঁটে একটু ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে বললো, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

পরে আবার মেমসাহেব বলেছিল, 'সকাল বেলায় ধুতি পাঞ্জাবি পরে খোকন যখন কলেজে যায়, তখন আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'লাগবেই তো। নিজে হাতে নিজের স্নেহ দিয়ে যাকে এত বড় করেছ, সেই ছেলে বড় হলে, ভাল হলে, নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।'

একটু থামি, একটু হাসি। ও জিজ্ঞাসা করল, 'আবার হাসছ কেন?'

'এমনি।'

'এমনি কেন?'

আবার হাসলাম, আবার বললাম, 'এমনি।'

মেমসাহেব পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। 'এমনি কেন হাসছ বল না।'

হাসতে হাসতেই আমি বললাম, 'বলব?'

'বলো।'

আবার হাসলাম। বললাম, 'সত্যি বলব?'

মেমসাহেব কনুই'এর ভর দিয়ে আমার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে বললো, 'বলছি তো বল না।'

হু'হাত দিয়ে ওর মুখটা টেনে নিয়ে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাদের খোকন কবে হবে?'

মেমসাহেবও আমার কানে কানে বললো, 'তুমি যেদিন চাইবে?'

'সিওর?'

'সিওর?'

ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ।'

ও হাসতে হাসতে উত্তর দিল, 'নট, অ্যাট অল! ইট উইল বী মাই প্লেজার।'

'আর ইউ সিওর ম্যাডাম?'

'ইয়েস স্যার, আই এ্যাম সিওর।'

এই কথার পর তুজনেরই যেন কি হলো। কি যেন সব হুষ্টুমি বুদ্ধির ঝড় উঠল তুজনেরই মাথায়। সেদিন তুপুরে ঐ শান্ত স্নিগ্ধ মেমসাহেব যে কি কাণ্ডটাই করল! পরে আমি বলেছিলাম, 'জান মেমসাহেব, তোমাকে দেখে বুঝা যায় না তোমার মধ্যে এত হুষ্টুমি বুদ্ধি লুকিয়ে আছে।'

ও পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে বললো, 'বাজে বকো না।'

পরের দিন ভোরবেলায় এলাম সিলিসের। লেকের ধারে পাহাড়ের পর এককালের রাজপ্রাসাদ এখন সরকারী পান্থশালা। দোতলার ম্যানেজারের খাতায় নাম ধাম লিখে ঘরের চাবি নিয়ে তিন-তলার ছাদে এসে দাঁড়াতেই মেমসাহেব লেক আর পাহাড় দেখে মুগ্ধ হলো। বললো, 'চমৎকার।'

মাথায় ঘোমটা, কপালে বিরাট সিঁহুরের টিপ, চোখে সানগ্লাস দিয়ে মেমসাহেবকে এই পরিবেশে আমার যেন আরো হাজার হাজার গুণ ভাল লাগল। আমি বললাম, 'সত্যি চমৎকার!'

'তা আমার দিকে তাকিয়ে বলছ কেন ?'

'এই লেক, পাহাড় আর এই রাজপ্রাসাদের চাইতেও তোমাকে বেশী ভাল লাগছে।'

আমার প্রশংসা গ্রাহ্য না করে ও ছাদের চারপাশ ঘুরে ঘুরে লেক আর পাহাড় দেখছিল। ইতিমধ্যে ছাদের ওপাশ থেকে অকস্মাৎ এক সদ্য বিবাহিতা মহিলা মেমসাহেবের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা বাঙালী ?'

ও একবার ঘাড় বেঁকিয়ে সানগ্লাসের মধ্য দিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।' একটু থেমে জানতে চাইল, 'আপনি ?'

ভদ্রমহিলা বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে বললেন, 'আমরাও বাঙালী।'

আমি মনে মনে বললাম, এখানেও কি একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারব না ?

ভদ্রমহিলা থামলেন না। আবার প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় থাকেন আপনারা ?'

মেমসাহেব অস্বস্তিবোধ করলেও ভদ্রমহিলার আগ্রহের তৃষ্ণা না মিটিয়ে আসতে পারছিল না। বললো, 'দিল্লী।'

'দিল্লীতে ? কোথায় ? লোদী কলোনী ?'

'না, ওয়েস্টার্ন কোর্টে।'

'আপনার স্বামী কি গভর্ণমেণ্টে আছেন ?'

'না, উনি জার্নালিস্ট।'

বেয়ারা ঘরের দরজা খুলে অ্যাটাচিটা রেখে দিল। আমি এবার ডাক দিলাম, 'শোন।'

মেমসাহেব মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে বললো, 'এখন আসি। পরে দেখা হবে।'

'আমরা আজ বিকেলেই আজমীঢ় চলে যাব।'

'আজই ?' মেমসাহেব মনে মনে দুঃখ পাবার ভান করল।

ও ঘরের দরজায় আসতেই আমি বললাম, 'তুমি ওকে বলো এক্ষুনি বিদায় নিতে।'

সানগ্লাসটা খুলতে খুলতে ও বললো, 'আঃ, শুনতে পাবেন।'

মেমসাহেব চুল খুলতে বসল। আমি বাথরুমে ঢুকলাম। স্নান সেরে বেরিয়ে আসতেই ও আমাকে বললো, 'তুমি সাবান, তোয়ালে নিয়ে যাওনি?'

'বাথরুমেই তো ছিল।'

'ওতো হোটেলের।'

'তাতে কি হলো? কাচান তোয়ালে নতুন সাবান ব্যবহার করলে কি হয়েছে?'

'কিছু হোক আর নাই হোক, আমার তোয়ালে-সাবান থাকতে তুমি কেন হোটেলের জিনিস ব্যবহার করবে?'

মেমসাহেবও স্নান সেরে নিল। বেয়ারাকে ডেকে বললাম, নাস্তা লে আও।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে সোফায় এসে বসলাম ছুজনে। মেমসাহেবকে বললাম, 'একটা গান শোনাও।'

'চারিদিকে লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। এখন নয়, সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ের পাশ দিয়ে লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে তোমাকে অনেক গান শোনাব।'

সেদিন সারাদিন মেমসাহেবের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা হয় নি সত্য। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গীত রচনা করেছিলাম ছুজনে।...

'ওগো, এর পর তোমার আর কিছু আয় বাড়লেই তুমি একটা থ্রি-রুম ফ্ল্যাট নেবে।'

'এখনই ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে?'

'ছুজনেই আস্তে আস্তে সংসারের সবকিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নেব।'

'তাছাড়া থ্রি-রুম ফ্ল্যাট নিয়ে কি হবে? একটা ঘরের একটা ছোট্ট ইউনিট হলেই তো যথেষ্ট।'

'না, না, তা হয় না। একটা ঘরের ফ্ল্যাটে আমাদের দুজনেরই তো হাত-পা ছড়িয়ে থাকা অসম্ভব।'

'দুজন ছাড়া তিনজন পাচ্ছ কোথায়?'

এবার মেমসাহেবের সব গাম্ভীর্য উধাও হয়ে গেল। হাসতে হাসতে বললো, 'তোমার মত ডাকাতের সঙ্গে সংসার করতে শুরু করলে দু'জন থেকে তিনজন, তিনজন থেকে চারজন পাঁচজন হতেও সময় লাগবে না।'

ওর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। অবাক বিস্ময়ে আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

'অমন হাঁ করে কি দেখছ?'

'তোমাকে।'

'আমাকে?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'হুঁ, তোমাকে।'

'আমাকে কোনদিন দেখনি?'

ওর দিকে চেয়ে চেয়েই বললাম, 'দেখেছি।'

এবার মেমসাহেবও একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল। 'তবে অমন করে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখছ?'

আমি দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা তুলে ধরে বললাম, 'জান মেমসাহেব, তুমি নিশ্চয়ই সুখী সার্থক স্ত্রী হবে। কিন্তু সন্তানের জননী হিসাবে বোধহয় তোমার তুলনা হবে না।'

মেমসাহেব প্রথমে ধীরে ধীরে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল। তারপর আলতো করে মাথাটা আমার বুকের 'পর রাখল। দুটো আঙুল দিয়ে পাঞ্জাবির বোতামটা ঘুরাতে ঘুরাতে বললো, 'আমার যে ছেলেমেয়ের ভীষণ শখ। রাস্তা-ঘাটে ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা দেখলেই মনে হয়...'

'যদি তোমার হতো, তাই না?'

মেমসাহেব আমার কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে হাসল।

তারপর আস্তে আস্তে ওর মুখটা আমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। আমার মনে হলো কি যেন লজ্জায় বলতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলবে?'

মুখটা লুকিয়ে রেখেই আস্তে আস্তে বললো, 'তোমার ইচ্ছা করে না?'

আমি হেসে ফেললাম। 'জান মেমসাহেব, স্বপ্ন দেখতে বড় ভয় হয়।'

আমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা মুখটা ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইল। বললো, 'কেন ভয় হয়?'

'জীবনে চলতে গিয়ে বারবার পিছনে পড়ে গেছি। তাইতো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে, ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতে ভয় হয়।'

ও হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে বললো, 'না, না, ভয়ের কথা বলো না। ভয় কি? একটু আতঙ্কে, একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জানতে চাইল, 'আমি কি তোমার হবো না?'

এবার আমি ওর মুখটা চেপে ধরে বললাম, 'ছি, ছি, ওসব আজেবাজে কথা ভাবছ কেন? তুমি তো আমারই।'

ওর মুখে তখনও বেশ চিন্তার ছাপ। বললো, সে তো জানি কিন্তু তবুও তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

আমি দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে তুলে নিলাম। সান্ত্বনা জানালাম, 'কিছু ভয় করো না। তোমার স্বপ্ন, তোমার ভালবাসা কোনদিন ব্যর্থ হতে পারে না।'

একটু ব্যাকুলতা মেশানো স্বরে বললো, 'সত্যি বলছ?'

'একশ'বার বলছি। যদি বিধাতার ইচ্ছা না হতো তাহলে কি ঐ আশ্চর্য ভাবে আমাদের দেখা হতো? নাকি এমনি করে আজ আমরা সিলিসের লেকের পাড়ে মিলতে পারতাম?'

'আমারও তো তাই মনে হয়। যদি ভগবানের কোন নির্দেশ,

কোন ইঙ্গিত না থাকত তাহলে সত্যি আমরা কোনদিন মিলতে পারতাম না।'

'তবে এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?'

অনুযোগের সুরে মেমসাহেব বললো, 'তুমিই তো ঘাবড়ে দিচ্ছ।'

'ঘাবড়ে দিচ্ছি না, সতর্ক করে দিচ্ছি।'

দু' আঙুল দিয়ে আমার গালটা চেপে ধরে বললো, 'কি আমার সতর্ক করার ছিরি!'

দোলাবৌদি, সেই অরণ্য আর পর্বতের কোলে যে দুটি দিন কাটিয়েছিলাম, তা আমার জীবনের মহা স্মরণীয় দিন। এত আপন করে, এত নিবিড় করে মেমসাহেবের এত ভালবাসা আমি এর আগে কোনদিন পাইনি। ঐ দুটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত মেমসাহেবের ভালবাসা আর উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করেছিলাম আমি। তাইতো তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাহচর্যে আসতে মন চায় নি।

মেমসাহেব বলেছিল, 'অনেক বেলা হলো। চলো লাঞ্চ খেয়ে আসি।'

আমি সোজা জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'আমি ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছি না।'

'তবে?'

'তবে আবার কি? বেয়ারাকে ডেকে বল ঘরে খাবার দিয়ে যেতে।'

আমি অতীত দিনের রাজপ্রাসাদের রাজকুমারের শয়নকক্ষে মহারাজার মত শুয়ে রইলাম। ও বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললো, 'সাহাবকা তবিয়ত আচ্ছা নেই হ্যায়। মেহেরবানি করকে খানা ইধারই লে-আনা।'

'জো হুকুম মেমসাব।'

ঘরে খাবার এসেছিল। সেন্টার টেবিলে খাবার-দাবার সাজিয়ে ও ডাক দিয়েছিল, 'এসো খেতে এসো।'

বড় সোফায় দু'জনে পাশাপাশি বসে খেয়েছিলাম। খেতে খেতে এক টুকরো নরম মাংস আমার মুখে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'এই নাও খেয়ে নাও।'

'তুমি খাও না।'

'আমি দিচ্ছি, তুমি খাও না।'

মাংসের টুকরোটা খাবার সময় ওর দুটো আঙুলে কামড় দিয়ে বললাম, 'তোমাকেও খেয়ে ফেলি।'

হাসতে হাসতে বললো, 'আমাকে কি খেতে বাকি রেখেছ?'

খেয়ে-দেয়ে ও একটা চাদর গায় দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সতর্ক করে দিল, 'এখন চুপটি করে ঘুমোও, একটুও বিরক্ত করবে না।'

'সত্যি?'

'সত্যি নয়ত কি মিথ্যে?'

আমি একটু ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'বিরক্ত না করে যদি তোমাকে সুখী করি?'

আমাকে হাত দিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে হেসে বললো, 'দূর থেকে সুখী করো।'

'অনেক দূরে সরে যাব?'

'হ্যাঁ, যাও।'

'তাই কি হয়? তোমার কষ্ট হবে।'

বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে বললো, 'কলা হবে। দেখি কেমন যেতে পার!'

মেমসাহেব জানত ও পাশ ফিরে শুয়ে থাকতে পারবে না, আমিও দূরে সরে থাকব না। ওর মনের কথা আমি জানতাম, আমার মনের কথাও ও জানত। তবুও হয়ত একটু বেশি আদর, একটু বেশি ভালবাসা পাবার জন্য ও এমনি দুষ্টুমি করতে ভালবাসত। আমারও মন্দ লাগত না।

পরের দিন সারা গেস্টহাউস ফাঁকা হয়েছিল। শুধু আমরা দুজন আর দোতলায় এক বৃদ্ধ দম্পতি ছাড়া আর কোন গেস্ট ছিল না।

সন্ধ্যাবেলায় আমরা দুজনে লেকের ধার দিয়ে পাহাড় আর অরণ্যের মধ্যে কত ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। মেমসাহেব কত গান শুনিয়েছিল। রাত্রে ফিরে এসে ছাতের কোণে লেকের মিষ্টি হাওয়ায় বসে বসে দুজনে ডিনার খেলাম। তারপর লাইটগুলো অফ করে দিয়ে বিরাট মুক্ত আকাশের তলায় বসে রইলাম আমরা দুজনে। আকাশের তারাগুলো মিট-মিট করে জ্বললেও সেদিন ঐ আব্ছা অন্ধকারে আমাদের দুজনের মনের আকাশ পূর্ণিমার আলোয় ভরে গিয়েছিল।

আশপাশে দুনিয়ার আর কোন জনপ্রাণী ছিল না। মনে হয়েছিল শুধু আমরা দুজনেই যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক। ভগবান যেন আমাদের মুখ চেয়ে, আমাদের শান্তির জন্য আর সবাইকে ছুটি দিয়েছিলেন এই পৃথিবী থেকে অন্য কোথাও একটু ঘুরে আসতে।

জনারণ্যের বাইরেও এর আগে কয়েকবার মেমসাহেবকে কাছে পেয়েছি কিন্তু এমন করে কাছে পাইনি। এত পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণভাবে আগে পাইনি।

'মেমসাহেব, ভুলে যাবে নাতো এই রাত্রির কথা ?'

বোতল বোতল ভালবাসার হুইস্কি খেয়ে মেমসাহেবের এমন নেশা হয়েছিল যে কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না। তাইতো শুধু মাথা নেড়ে বললো, 'না।'

'কোনওদিন না ?'

'না।'

'যাদ কোনদিন তুমি আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাও—'

'তোমার এই ভালবাসা আর এই স্মৃতি বুকে নিয়ে কোথায় যাব বলো ?'

'তবুও মানুষের অদৃষ্টের কথা তো বলা যায় না।'

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একটু ভিজিয়ে নিল, ছুটো দাঁত দিয়ে এ ঠোঁটের কোনাটা একটু কামড়ে নিল মেমসাহেব। তারপর বললো, 'তোমার এই ভালবাসা পাবার পর আর একজনের সঙ্গে সারাজীবন ধরে ভালবাসার অভিনয় করতে আমি পারব না।'

একটু থামল। আমাকে আর একটু কাছে টেনে নিল। একটু বেশি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তাছাড়া তোমার জীবনটা সর্বনাশ করে আর একজনকে আবার ঠকাব কেন?' একটু জোর গলায় বলে উঠল, 'না, না, আমি তা কোনদিন পারব না।'

আমিও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। আমিও বেশ জোর করে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। একটু যেন ভেজা গলায় বলেছিলাম, 'সত্যি বলছি মেমসাহেব, ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি সে ছুর্দিন যেন কোনদিন না আসে। কিন্তু যদি কোনদিন আসে, সেদিন আমি আর বাঁচব না। হয় উন্মাদ হবো নয়ত তোমার স্মৃতি বুকে নিয়েই এই লেকের জলে চিরকালের জন্য ডুব দেব।'

ও তাড়াতাড়ি আমার মুখটা চেপে ধরল। বললো, 'ছি, ছি, ওকথা মুখে আনে না। এই তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।'

একটু থেমে, আমাকে একটু আদর করে মেমসাহেব আবার বলেছিল, আমি যেতে চাইলেই তুমি আমাকে যেতে দেবে কেন? আমি না তোমার স্ত্রী? তোমার মনে কোন দ্বিধা, কোন চিন্তা থাকলে আজ এই রাত্তিরেই তুমি আমার সিঁথিতে সিঁছুর পরিয়ে দাও, হাতে শাঁখা পরিয়ে দাও। আমি সেই শাঁখা-সিঁছুর পরেই কলকাতা ফিরে যাব।'

মেমসাহেবের কথায় আমার মন থেকে অবিশ্বাসের ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টুকরো মেঘগুলো পর্যন্ত কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমার মুখটা হাসিতে ঝলমল করে উঠল। বললাম, 'না, না, আমার মনে

কোন দ্বিধা নেই। তুমি যদি আমার না হতে তাহলে কি অমন হাসিমুখে তোমার সমস্ত সম্পদ, সব ঐশ্বর্য আর ভালবাসা এমন করে দিতে?'

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। হাতে ঘড়ি ছিল কিন্তু দেখার মনোবৃত্তি কারুরই ছিল না। ঘরে এসে আর মেমসাহেব পাশ ফিরে শুয়ে দূরে থাকে নি। এত আপন, এত নিবিড়, এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল সে রাত্রে যে সে কাহিনী লেখা সম্ভব নয়। শুধু জেনে রাখ আমাদের দুটি মন, দুটি প্রাণ, দুটি আত্মা আর আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনা সব একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল সে চিরস্মরণীয় রাত্রে।

পরের দিন ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়েছিল। হয়ত আরো অনেক বেলা হতো। কিন্তু সূর্যের আলো চোখে পড়ায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। পাশের খাটে মেমসাহেব আমার দিকে ফিরে শুয়েছিল। সূর্যের আলো ওর চোখে পড়ছিল না। মনে হলো মহানন্দে স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে।

ওর ঘুম ভাঙাতে আমার মন চাইল না। ও এত নিশ্চিন্তে, শান্তিতে ঘুমুচ্ছিল যে দেখতে বেশ লাগছিল। বহুক্ষণ ধরে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম। তারপর উঠে বসে আরো ভাল করে দেখলাম। ওর সর্বাঙ্গের 'পর দিয়ে বার বার চোখ বুলিয়ে নিলাম। একটু হয়ত হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম ওর গায়।

মনে মনে কত কি ভাবলাম। ভাবলাম, এই মেমসাহেব। এই আমার জীবন-নাট্যের নায়িকা! এই সেই চপলা চঞ্চলা বালা যে আমার জীবন ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়েছে? এই সেই শিল্পী যে আমার জীবনে সুর দিয়েছে, চোখে স্বপ্ন দিয়েছে। ভাবলাম, এই সেই মেয়ে যে আমার জীবনে না এলে আমি কোথায় সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে যেতাম, শুকনো পাতার মত কালবৈশাখীর মাতাল হাওয়ায় অজানা ভবিষ্যতের কোলে চিরকালের জন্য লুকিয়ে পড়তাম?

ভাবতে ভাবতে ভারী ভাল লাগল। ওর কপালের 'পর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে একটু আদর করলাম।

মেমসাহেব কাত হয়ে শুয়েছিল। ওর দীর্ঘ মোটা বিনুনিটা কাঁধের পাশ, বুকের 'পর দিয়ে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে আরো অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। ওর ছন্দোবদ্ধ দেহের চড়াই-উতরাই দেখে যেন মনে হলো প্রাক্সিটিলীস'এর ভেনাস

বা সাঁচীর যক্ষী টর্সো। নাকি খাজুরাহো'র নায়িকা, অজন্তার মারকন্যা!

মনে পড়ল ঈভার প্রতি মিলটনের কথা—'O fairest of creation last and best, of all God's works'

ঈভার মত মেমসাহেব নিশ্চয়ই অত সুন্দরী ছিল না কিন্তু আমার চোখে আমার মনে সে তো অনন্যা! আমার শ্যামা মেমসাহেবকে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম অনেকক্ষণ। ভাবলাম বাইবেলের মতে তো নারীই ভগবানের শেষ কীর্তি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু সবাই কি মেমসাহেব হয়? দেহের এই মাধুর্য, চোখে এমনি স্বপ্ন, চরিত্রে এই দৃঢ়তা, মনের এই প্রসারতা তো আর কোথাও পেলাম না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন ও আমাকে ইশারা করল। মনে হলো যেন ডাক দিল ওগো, কাছে এসো না, দূরে কেন? তুমি কি আমাকে তোমার বুকের মধ্যে তুলে নেবে না?

আমি হাসলাম। মনে মনে বললাম, পোড়ামুখী তুই তো জানিস না, তোকে বেশী আদর করতেও আমার ভয় হয়। তোকে বেশীক্ষণ বুকের মধ্যে ধরে রাখলে জ্বালা করে, ভয় ধরে।

ভয়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়। ভয় হবে না? যদি কোনদিন কোন কারণে কোন দৈবদুর্বিপাকে আমার বুকটা খালি হয়ে যায়? তখন?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই মেমসাহেব ওর ডান হাতটা আমার কোলের 'পর ফেলে একটু জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করল। যেন বলল, না গো, না, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

আমি মেমসাহেবকে একটু কাছে টেনে নিলাম, একটু আদর করলাম।

ঐ সকালবেলার মিষ্টি সূর্যের আলোয় মেমসাহেবকে আদর করে বড় ভাল লাগল। কিন্তু আনন্দের ঐ পরম মুহূর্তেও একবার

মনে হলো, সন্ধ্যায় তো সূর্য অস্ত যায়, পৃথিবীতে তো অন্ধকার নেমে আসে।

জান দোলাবৌদি, ঐ হতচ্ছাড়ী মেয়েটাকে যখনই বেশী করে কাছে পেয়েছি তখনই আমার মনের মধ্যে ভয় করত। কেন করত তা জানি না কিন্তু আজ মনে হয়—

থাকগে। ওসব কথা বলতে শুরু করলে আবার সব কিছু গুলিয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে আমার মেমসাহেবের কাহিনী শোনাতে হবে। সময় ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা শুভলগ্নে আমাকে তো তোমার পাত্রীস্থ করতে হবে। তাই না? তাছাড়া আমারও তো বয়স বাড়ছে। বয়স বেশী হয়ে গেলে কি আমার কপালে কিছু জুটবে?

ঐ অরণ্য-পর্বত-লেকের ধারের রাজপ্রাসাদে দুটি দিন, দুটি রাত্রি স্বপ্ন দেখে আমরা আবার দিল্লী ফিরে এলাম। ফিরে এলাম ঠিকই কিন্তু যে মেমসাহেব আর আমি গিয়েছিলাম সেই আমরা ফিরে এলাম না। ফিরে এলাম সম্পূর্ণ নতুন হয়ে।

দিল্লীতে ফিরে এসে মেমসাহেব একটি মুহূর্তও নষ্ট করে নি। সংসার পাতার কাজে মেতেছিল। একটা স্কুটার রিক্সা নিয়ে দুজনে মিলে দিল্লীর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছিলাম ভবিষ্যতের আস্তানা পছন্দ করবার আশায়। করোলবাগ, ওয়েস্টার্ন এক্সটেনশন, নিউ রাজেন্দ্রনগর, ইস্ট প্যাটেল নগর থেকে দক্ষিণে নিজামুদ্দীন, জংপুরা, ডিফেন্স, সাউথ একসটেনশন, কৈলাস, হাউসখাস, গ্রীনপার্ক পর্যন্ত ঘুরেছিলাম। সব দেখেশুনে ও বলেছিল, গ্রীনপার্কেই একটা ছোট্ট কটেজ নেব আমরা।

'এত জায়গা থাকতে গ্রানপার্ক?'

'শহর থেকে বেশ একটু দূরে আর বেশ ফাঁকা ফাঁকা আছে।'

'বড্ড দূর।'

'তা, হোক। তবুও থেকে শান্তি পাওয়া যাবে।'

'তা ঠিক।'

পরে আবার বলেছিল, হু'তিন মাসের মধ্যেই বাড়ি ঠিক করবে। তারপর একটু গোছগাছ করে নিয়েই আমরা সংসার পাতব।

হাত দিয়ে আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করল, কেমন? তোমার আপত্তি নেই তো?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম, না।

আরো হু'চারটে কি যেন কথাবার্তা বলার পর ও আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, দেখ না, বিয়ের পর তোমাকে কেমন জব্দ করি!

'কি জব্দ করবে?'

'আজেবাজে খাওয়া-দাওয়া ফালতু আড্ডা দেওয়া সব বন্ধ করে দেব।'

'তাই বুঝি?'

'তবে কি?'

এবার আমিও একটা হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বললাম, আর কি করবে মেমসাহেব?

আধো আধো গলায় উত্তর দিল, সব কথা বলব কেন?

'তাই বুঝি?'

'তবে কি? বাট ইউ উইল সী আই উইল মেক ইউ হ্যাপি।'

'তা আমি জানি। তবে মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়।'

'কি ভয় হয়?'

আমি ওর কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, আমি বোধহয় স্ত্রৈণ হবো!

মেমসাহেব আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, বাজে বকো না।

একটু মুচকি হাসলেও বেশ সিরিয়াসলি বললাম, বাজে না

মেমসাহেব। বিয়ের পর বোধহয় তোমাকে ছেড়ে আমি পার্লামেণ্ট বা অফিসেও যেতে পারব না।

এবার মেমসাহেব একটু মুচকি হাসে। বললে, চব্বিশ ঘণ্টা বাড়ি বসে কি করবে?

আবার কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, তোমাকে নিয়ে শুয়ে থাকব।

ও হেসে বললে, অসভ্য কোথাকার! একটু থেমে আবার বললে, শুতে দিলে তো?

আমি বললাম, শুতে না দিলে আমি চীৎকার করে, কান্নাকাটি করে সারা পাড়ায় জানিয়ে দেব।

মেমসাহেব এবার আমার পাশ থেকে উঠে পড়ে। মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললে, বাপরে বাপ! কি অসভ্য।

আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরতে গেলাম। ও ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, পারল না। আঁচল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম সোফার ওপর। 'যদি বলি এখনই······

হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে বললে, নাক ফাটিয়ে দেব।

'সত্যি?'

এমনি করে মেমসাহেবের দিল্লীবাসের মেয়াদ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল। রবিবার বিকেলে ডিল্যুক্স এয়ার কণ্ডিসনড এক্সপ্রেসে কলকাতা চলে গেল। ওয়েস্টার্ন কোর্ট থেকে স্টেশন রওনা হবার আগে মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করল, আমার বুকে মাথা রেখে জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদল।

আমি ওকে আশীর্বাদ করলাম, আদর করলাম, চোখের জল মুছিয়ে দিলাম।

এক সপ্তাহ ধরে দুজনে কত কথা বলেছি কিন্তু সেদিন ওর বিদায় মুহূর্তে দুজনের কেউই বিশেষ কথা বলতে পারিনি। আমি শুধু বলেছিলাম, সাবধানে থেকো। ঠিকমত চিঠিপত্র দিও।

ও বলেছিল, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করো। তোমার শরীর কিন্তু ভাল না।

শেষে নিউ দিল্লী স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগে বলেছিল, তুমি কিন্তু আমাকে বেশীদিন একলা রেখো না। কলকাতায় আমি একলা থাকতে পারি না।

মেমসাহেব চলে গেল। আমি আবার ওয়েস্টার্ন কোর্টের শূন্যঘরে ফিরে এলাম। মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। খেতে গেলাম না। ডাইনিং হলে আমাকে দেখতে না পেয়ে গজানন এলো আমার ঘরে খবর নিতে। আমাকে অনেক অনুরোধ করল কিন্তু তবুও আমি খেতে গেলাম না। বললাম, শরীর খারাপ।

গজানন আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিল। সেজন্য সেও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করে বিদায় নিল।

কলকাতা থেকে মেমসাহেবের পৌঁছনো সংবাদ আসতে না আসতেই আমি আবার কাজকর্ম শুরু করেছিলাম। পুরো একটা সপ্তাহ পার্লামেণ্ট যাইনি, সাউথ ব্লক-নর্থ ব্লক যাইনি, মন্ত্রী-এম-পি-অফিসার-ডিপ্লোম্যাট দর্শন করিনি। এমন কি টাইপ রাইটার পর্যন্ত স্পর্শ করিনি।

দু'একদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলাম কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন খবর-টবর পেলাম না। পার্লামেণ্টে তখন আকশাই চীন সড়ক নিয়ে ঝড় বইছিল প্রায়ই। প্রাইম মিনিস্টারও বেশ গরম গরম কথা বলছিলেন মাঝে মাঝেই। দু'চারজন পলিটিসিয়ান যুদ্ধ করবার পরামর্শ দিলেও প্রাইম মিনিস্টার তা মানতে রাজী হলেন না। অথচ এইভাবে বক্তৃতার লড়াই কতদিন চলতে পারে? অল ইণ্ডিয়া রেডিও আর পিকিঙ বেতারের রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধ তেতো হয়ে উঠেছিল। লড়াই করার কোন উদ্যোগ, আয়োজন বা মনোবৃত্তি সরকারী মহলে না দেখায় আমার মনে স্থির বিশ্বাস হলো আলোচনা হতে বাধ্য।

ছ'চারজন সিনিয়র ক্যাবিনেট মিনিস্টারের বাড়িতে আর অফিসে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে কোন কিছুর হদিশ পেলাম না। শেষে সাউথ ব্লকে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী ও স্পেশ্যাল সেক্রেটারীকেও তেল দিয়ে কিছু ফল হলো না।

শেষে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি এমন সময়···

আফ্রিকা ডেস্কের মিঃ চোপরার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেরুতে বেরুতে প্রায় সাড়ে ছ'টা হয়ে গেল। বেরুবার সময় প্রাইম মিনিস্টারের ঘরের সামনে উঁকি দিতে গিয়ে দেখলাম, প্রাইম মিনিস্টার লিফট'এ ঢুকেছেন। আমি তাড়াতাড়ি হুড়মুড় করে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম।

প্রাইম মিনিস্টার গাড়ির দরজার সামনে এসে গিয়েছেন, পাইলট তার মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়েছে, অয়ারলেস আর সিকিউরিটি কারও স্টার্ট দিয়েছে কিন্তু চলতে শুরু করে নি, এমন সময় ফরেন সেক্রেটারী প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হলেন। কানে কানে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কি যেন কথা বললেন। প্রাইম মিনিস্টার আর ফরেন সেক্রেটারী আবার লিফট'এ চড়ে উপরে চলে গেলেন।

আমি একটু পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখলাম। বুঝলাম, সামথিং ভেরী সিরিয়াস অথবা সামথিং ভেরী আর্জেন্ট। তা নয়ত ঐভাবে ফরেন সেক্রেটারী প্রাইম মিনিস্টারকে অফিসে ফেরত নিয়ে যেতেন না।

আমি প্রাইম মিনিস্টারের অফিসের পাশে ভিজিটার্স রুমে বসে রইলাম। দেখলাম, বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে প্রাইম মিনিস্টার আবার বেরিয়ে গেলেন। প্রাইম মিনিস্টারকে এবার দেখে মনে হলো, একটু যেন স্বস্তি পেয়েছেন মনে মনে।

আমি আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম। দেখলাম

প্রাইম মিনিস্টার চলে যাবার পর পরই চায়না ডিভিশনের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ মালিক ফরেন সেক্রেটারীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

আমার আর বুঝতে বাকি রইল না চীন সম্পর্কেই কিছু জরুরী খবর এসেছে।

সেদিনকার মত আমি বিদায় নিলাম। পরের দিন থেকে মিঃ মালিকের বাড়ি আর অফিস ঘুরঘুর করা শুরু করলাম। তবুও কিছু সুবিধা হলো না।

শেষে ইউনাইটেড নেশনস্ ডিভিশনের একজন সিনিয়র অফিসারের কাছে খবর পেলাম সীমান্ত বিরোধ আলোচনার জন্য চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইকে দিল্লী আসার আমন্ত্রণ জানান হয়েছে এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

খবরটি সে বাজারে প্রায় অবিশ্বাস্য হলেও যাচাই করে দেখলাম, ঠিকই। দিল্লীর বাজার তখন অত্যন্ত গরম কিন্তু তবুও আমি খবরটা পাঠিয়ে দিলাম। ট্রাঙ্ককল করে নিউজ এডিটরকে ব্রিফ করে দিলাম। পরের দিন ডবল কলম হেডিং দিয়ে সেকেণ্ড লীড হয়ে ছাপা হলো, চৌ এন-লাই দিল্লী আসছেন।

এই খবরটা দেবার জন্য প্রায় সবাই আমাকে পাগল ভাবল। আমার এডিটরের কাছেও অনেকে অনেক বিদ্রূপ মন্তব্য করলেন। এডিটর চিন্তিত হয়ে আমাকে ট্রাঙ্ককল করলেন। আমি বললাম, একটু ধৈর্য ধরুন।

এক সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই লোকসভায় কোশ্চেন-আওয়ারের পর স্বয়ং প্রাইম মিনিস্টার ঘোষণা করলেন, প্রিমিয়ার চৌ এন-লাই তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সীমান্ত বিরোধ আলোচনার জন্য দিল্লী আসছেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো অনেকের মাথায়। আমি কিন্তু আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলাম। রাত্রে এডিটরের

টেলিগ্রাম পেলাম, কনগ্রাচুলেশনস্ স্পেশ্যাল ইনক্রিমেন্ট টু-ফিফ্‌টি উইথ ইমিডিয়েট এফেক্‌ট্। দু'হাত তুলে ভগবানকে প্রণাম করলাম।

সেই রাত্রেই মেমসাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে সুখবরটা জানিয়ে দিলাম।

পরের দিন মেমসাহেবেরও একটা টেলিগ্রাম পেলাম, এ্যাকসেপ্ট কনগ্রাচুলেশনস্ অ্যাণ্ড প্রণাম স্টপ লেটার ফলোজ।

মেমসাহেবের চিঠি পাবার পরও ভাবতে পারিনি ভবিষ্যতে আরো কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটবে আমার জীবনে। কিন্তু সত্যি সত্যিই ঘটল। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে ইউরোপ যাবার দুর্লভ সুযোগ এলো আমার জীবনে কয়েক মাসের মধ্যেই।

বিদায় জানাবার জন্য মেমসাহেব দিল্লী ছুটে এসেছিল। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমাকে সী-অফ্ করার জন্য তুমি কলকাতা থেকে দিল্লী এলে?

দুটি হাত দিয়ে আমার দুটি হাত দোলাতে দোলাতে বলেছিল, তুমি প্রথমবারের জন্য ইউরোপ যাচ্ছ আর আমি চুপ করে বসে থাকব কলকাতায়?

ঐ কালো হরিণ চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললো, তাও আবার প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে চলেছ! আমি না এসে থাকতে পারি?

পাগলীর কথাবার্তা শুনে আমার হাসি পেতো। কত হাজার হাজার লোক বিদেশ যাচ্ছে! তার জন্য এক হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে এসে বিদায় জানাতে হবে?

দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা তুলে ধরে মেমসাহেব বললো, এসেছি, বেশ করেছি! তোমাকে কৈফিয়ত দিয়ে আসব?

বল দোলাবৌদি, অমন পাগলীর সঙ্গে কি তর্ক করা যায়? যায় না। তাই আমিও আর তর্ক করিনি।

পাশপোর্ট-ভিসা-ফরেন এক্সচেঞ্জ আগেই ঠিক ছিল। এয়ার-

প্যাসেজ আগের থেকেই বুক করা ছিল। দুজনে মিলে এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসে গিয়ে টিকিটটা নেবার পর কটনপ্লেসে কয়েকটা ছোটখাট জিনিসপত্র কিনলাম। তারপর কফি হাউসে গিয়ে কফি খেয়ে ফিরে এলাম ওয়েস্টার্ন কোর্টে।

ফেরার পথে মেমসাহেব বললো, দেখ তোমার কাজকর্ম আজই শেষ করবে। কালকে কোন কাজ করতে পারবে না।

'কেন? কাল কি হবে?' আমি জানতে চাইলাম।

ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ও বললো, বাঃ পরশু ভোরেই তো চলে যাবে। কালকের দিনটাও আমি পেতে পারি না?

লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম করে বেরিয়েছিলাম বাকি কাজগুলো শেষ করার জন্য। তারপর এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রিতে গিয়ে দেখাশুনা করে ফিরে এলাম সন্ধ্যার পরই।

এসে দেখি মেমসাহেব একটা চমৎকার বালুচরী শাড়ি পরেছে, বেশ চেপে কান ঢেকে চুল বেঁধেছে, বিরাট খোঁপায় রূপার কাঁটা গুঁজেছে। রূপার চেন'এ টিবেটিয়ান লকেট লাগানো একটা হার ছাড়া আরো কয়েকটা রূপার গহনা পরেছে। কপালে টকটকে লাল একটা বিরাট টিপ ছাড়াও চোখে বোধ হয় একটু সুরমার টান লাগিয়েছিল।

আমি ঘরে ঢুকে মেমসাহেবকে দেখেই থমকে দাঁড়ালাম। ও মুখটা একটু নীচু করে চোখটা একটু ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। একটু হাসল।

আমি হাসলাম না, হাসতে পারলাম না। আগের মতই স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

ও আবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল। জিজ্ঞাসা করল, অমন স্থির হয়ে কি দেখছ?

'তোমাকে।'

ন্যাকামি করে ও আবার বললো, আমাকে?

'বুঝতে পারছ না ?'

একটু হাসল। বললো, তা তো বুঝতে পেরেছি কিন্তু অমন করে দেখবার কি আছে ?

'কেন দেখছি তা বুঝতে পারছ না ? দেখবার কি কোন কারণ নেই ?'

মেমসাহেব এবার আর তর্ক না করে ধীর পদক্ষেপে দেহটাকে একটু দুলিয়ে দুলিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার হাত দুটো ধরে মুখটা একটু বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, খুব খারাপ লাগছে ?

আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম, অসহ্য, অসহ্য !

'সত্যি খারাপ লাগছে ?'

'অত খারাপ কি না তা জানি না, তবে তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।'

ও এবার সত্যি একটু চিন্তিতা হয়ে প্রশ্ন করল, এসব খুলে ফেলব ?

এতক্ষণ ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার ওকে পাশে টেনে নিয়ে বললাম, হে নিরুপমা, চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।...আর হে নিরুপমা, আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।

দোলাবৌদি, মেমসাহেবও কোন কথা বলল না। দুটি হাত দিয়ে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে মাথাটা হেলান দিয়ে খুব মিহিস্বরে গাইল, আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ভালবাসায় ভোলাব।

আমি প্রশ্ন করলাম, আর কি করবে ?

মেমসাহেব গাইতে গাইতে বললো, ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে—সোহাগ আমার মালা করে গলায় তোমার দোলাব।

আমি বললাম, সত্যি ?

'হাজারবার লক্ষবার সত্যি।'

মেমসাহেব গজাননকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল। চা এলো।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি এয়ার ইণ্ডিয়া বা টুরিস্টব্যুরোর চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছ?

'কেন বলতো?'

'তা নয়ত এত রূপোর গহনা চাপিয়েছ কেন?'

'আমার খুব ভাল লাগে।' কেন তোমার খারাপ লাগছে?'

'পাগল হয়েছ?' খারাপ লাগবে কেন? খুব ভাল লাগছে।'

'সত্যি?'

'সত্যি ছাড়া কি মিথ্যা বলছি?'

'যাই হোক এত সাজলে কেন?'

'তোমার ভাল লাগবে বলে।'

একটু থেমে আবার বললো, তাছাড়া···

'তাছাড়া কি?'

মুখটা একটু লুকিয়ে, বললো, ইউরোপ যাচ্ছ। না জানি কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবে। তাই যাতে চট করে ভুলে না যাও···

'আমাকে নিয়ে আজো তোমার এত ভয়?'

আমাকে একটু আদর করে মেমসাহেব বললো, না গো না। এমনি সেজেছি।

সেদিন সন্ধ্যা-রাত্রি আর পরের দিনটা পুরোপুরি মেমসাহেবকে দিয়েছিলাম।

তারপর বিদায়ের দিন এয়ারপোর্ট রওনা হবার আগে মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করেছিল, আমি ওকে আশীর্বাদ করেছিলাম। কিন্তু তবুও ও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হলো যেন কিছু বলবে। জানতে চাইলাম, কিছু বলবে?

কিছু কথা না বলে মাথা নীচু করে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মুচকি মুচকি হাসছিল।

আমি ওর মুখটা আলতো করে তুলে ধরে আবার জানতে চাইলাম, কি, কিছু বলবে ?

অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর হতচ্ছাড়ী আমার কানে কানে কি বলেছিল জান দোলাবৌদি ? বলেছিল, আমাকে আর একটু ভাল করে আদর কর।

কি করব ? বিদায়বেলায় এই অনুরোধ না রেখে আমি পারিনি। সত্যি একটু ভাল করেই আদর করলাম আর ওর দেহে একটা চিহ্ন রেখে গেলাম, যে চিহ্ন শুধু মেমসাহেবই দেখেছিল কিন্তু দুনিয়ার আর কেউ দেখতে পারে নি।

পালামের মাটি ছেড়ে আমি চলে গেলাম।

ঘুরতে ঘুরতে শেষে লণ্ডন পৌঁছে মেমসাহেবের চার-পাঁচটা চিঠি একসঙ্গে পেলাম। বার বার করে লিখেছিল, ফেরার সময় তুমি দিল্লীতে না গিয়ে যদি সোজা কলকাতা আস, তবে খুব ভাল হয়। কলেজে টেস্ট শুরু হয়েছে ; সুতরাং এখন ছুটি নেওয়া যাবে না। অথচ তুমি ফিরবে আর আমি তোমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করব না, তা হতে পারে না।

শেষে লিখেছিল, তুমি কবে, কোন্ ফ্লাইটে, কখন দমদমে পৌঁছবে, সে খবর আর কাউকে জানাবে না। দমদমে যেন ভিড় না হয়। শুধু আমিই তোমাকে রিসিভ করব, আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি যেন এয়ারপোর্টে না থাকে।

মেমসাহেব আমাকে বিদায় জানাবার জন্য কলকাতা থেকে দিল্লী ছুটে এসেছিল। সুতরাং আমি ওর এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। বণ্ড স্ট্রীটে এয়ার ইণ্ডিয়া অফিসে গিয়ে আরো কিছু পেমেণ্ট করে টিকিটটা চেঞ্জ করে আনলাম। তারপর রওনা হবার আগে মেমসাহেবকে একটা কেবল্ করলাম, রিচিং ডামডাম এয়ার ইণ্ডিয়া স্যাটারডে মর্ণিং। মজা করবার জন্য শেষে উপদেশ দিলাম, ডোণ্ট ইনফর্ম এনিবডি।

সেদিন দমদমে অরেঞ্জ পাড়ের একটা তাঁতের শাড়ি আর অরেঞ্জ রং-এর একটা ব্লাউজ পরে, রোদ্দুরের মধ্যে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মেমসাহেব রেলিং'এর ধারে দাঁড়িয়েছিল আমার আগমন প্রত্যাশায়। আমার তু'হাতে ব্রিফকেশ, টাইপরাইটার, কেবিন-ব্যাগ আর ওভারকোট থাকায় হাত নাড়তে পারলাম না। শুধু একটু মুখের হাসি দিয়ে ওকে জানিয়ে দিলাম, ফিরে এসেছি।

কাস্টমস্-ইমিগ্রেশন কাউণ্টার পার হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই ও আমার হাত থেকে টাইপরাইটার আর কেবিনব্যাগটা নিয়ে নিল। টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে বেরুবার সময় জিজ্ঞাসা করল, ভাল আছ তো?

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, তুমি?

'ভাল আছি।'

তারপর ট্যাক্সিতে উঠে মেমসাহেব আমাকে প্রণাম করল। আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে বললাম, সুখে থাক, মেমসাহেব।

'নিশ্চয়ই সুখে থাকব।'

তারপর আমি বলেছিলাম, জান, এই শাড়িটা আর ব্লাউজ পরে তোমাকে ভারী ভাল লাগছে।

খুব খুশি হয়ে হাসিমুখে ও বললো, সত্যি বলছ?

'সত্যি বলছি। তোমাকে বড় শান্ত, স্নিগ্ধ, মিষ্টি লাগছে।'

একটু পরে আবার বলেছিলাম, ইচ্ছা করছে তোমাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করি।

মেমসাহেব তু'হাত জোড় করে বলেছিল, দোহাই তোমার, এই ট্যাক্সির মধ্যে আদর করো না।

দোলাবৌদি, এমনি করে এগিয়ে চলেছিলাম আমি আর মেমসাহেব। আমি দিল্লীতে থাকতাম, ও কলকাতায় থাকত। কখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে মেজদিকে হাত করে ও দিল্লী আসত, কখনও

বা আমি কলকাতা যেতাম। মাঝে মাঝেই আমাদের দেখা হতো। বেশীদিন দেখা না হলে আমরাও শান্তি পেতাম না।

ইতিমধ্যে একজন ন্যাভাল অফিসারের সঙ্গে মেমসাহেবের মেজদির বিয়ে হলো। বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমি কলকাতা গিয়েছিলাম। একটা ভাল প্রেজেনটেশনও দিয়েছিলাম।

মেজদির বিয়েতে গিয়ে ভালই করেছিলাম। এই উপলক্ষ্যে আমার সঙ্গে ওদের পরিবারের অনেকের আলাপ-পরিচয় হলো। তাছাড়া ঐ বিয়ে বাড়িতেই মেজদি আমাদের ব্যাপারটা পাকাপাকি করে দিয়েছিলেন। আমার হাত ধরে টানতে টানতে মেজদি ওর মা'র সামনে হাজির করে বলেছিলেন, হ্যাঁ মা, এই রিপোর্টারের সঙ্গে তোমার ঐ ছোটমেয়ের বিয়ে দিলে কেমন হয়?

এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। লজ্জায় আমার চোখ-মুখ-কান লাল হয়ে উঠেছিল। তবুও আমি অনেক কষ্টে ভণিতা করে বললাম, আঃ মেজদি! কি যা তা বলছেন?

মেজদি আমাকে এক দাবড় দিয়ে বললেন, আর ঢং করবেন না। চুপ করুন।

তারপর মেজদি আবার বললেন, কি মা? তোমার পছন্দ হয়?

এত সহজে ঐ কালো-কুচ্ছিত হতচ্ছাড়ী মেয়েটাকে যে আমার মত সুপাত্রের হাতে সমর্পণ করতে পারবেন, মেমসাহেবের মা তা স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাই বললেন, তোদের যদি পছন্দ হয় তাহলে আর আমার কি আপত্তি থাকবে বল?

বিয়ে বাড়ি। ঘরে আরো অনেক লোকজনে ভর্তি ছিল। ওদের সবার সামনেই মেজদি আমার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, নিন, মাকে প্রণাম করুন।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। কিন্তু কি করব? প্রণাম করলাম।

এবার মেজদি আমার মাথাটা চেপে ধরে বললেন, নিন, এবার আমাকে প্রণাম করুন।

আমি প্রতিবাদ করলাম, আপনাকে কেন প্রণাম করব ?

মেজদি চোখ রাঙিয়ে বললেন, আঃ! যা বলছি তাই করুন। তা নয়ত সবকিছু ফাঁস করে দেব।

আশেপাশের সবাই গিলে গিলে মেজদির কথা শুনছিলেন আর হাঁ করে আমাকে দেখছিলেন।

আমি এদিক-ওদিক বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে মেজদিকে চোখ টিপে ইশারা করলাম।

ন্যাভাল অফিসারকে পেয়ে মেজদির প্রাণে তখন আনন্দের বন্যা। আমার ইশারাকে সে তখন গাহ্য করবে কেন ? তাই সবার সামনেই বলে ফেললেন, ওসব ইশারা-টিসারা ছাড়ুন। আগে প্রণাম করুন —তা নয়ত……

দোলাবৌদি, তুমি আমার অবস্থাটা একবার অনুমান কর। বিয়ে বাড়ি। চারদিকে লোকজন গিজ্‌গিজ করছে। তারপর ঐ রণমূর্তিধারী বধূবেশী মেজদি! বীরত্ব দেখিয়ে বেশী তর্ক করলে না জানি হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙে মেজদি কি সর্বনাশই করত! টিপ করে একটা প্রণাম করেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু মেজদি আবার টেনে ধরে বললেন, আহা-হা! একটু দাঁড়ান।

হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, ঐ যে দিদি দাঁড়িয়ে আছে। দিদিকে প্রণাম করুন।

আমি একটু ইতস্তত করতেই মেজদি আবার ভয় দেখালেন, খবরদার রিপোর্টার। অবাধ্য হলেই···

দিদিকেও প্রণাম করলাম।

দিল্লী আসার দিন মেমসাহেব স্টেশনে এসে বলেছিল, জান, তোমাকে সবার খুব পছন্দ হয়েছে।

স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সবার সামনেই ও আমাকে প্রণাম করল, আমি ওকে আশীর্বাদ করলাম। দিল্লী মেল ছেড়ে দিল।

সতের

মেজদি যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের এত বড় উপকার করবেন, তা কোনদিন ভাবিনি। শুধু ভাবিনি নয়, কল্পনাও করিনি। মেমসাহেব আমাকে ভালবাসত, আমি মেমসাহেবকে ভালবাসতাম। সে ভালবাসায় কোন ফাঁকি, কোন ভেজাল ছিল না। আমরা নিশ্চিত জানতাম আমরা মিলবই। শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করেও আমরা মিলতাম।

কিন্তু তবুও মেজদির ঐ সাহায্য ও উপকারটুকুর একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং মেজদির প্রতি আমরা দুজনেই কৃতজ্ঞ ছিলাম।

আসলে মেজদি বরাবরই আমাকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। আমারও মেজদিকে বড় ভাল লাগত। প্রথম দিন থেকেই মেজদিরও আমাকে ভাল লেগেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মেজদি আমাদের দুজনের ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মনে মনে ছোট বোনকে তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে।

এবার তো সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিলেন, মেমসাহেব আমার, আমি মেমসাহেবের। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির হস্তান্তরের সবকিছু পাকাপাকি হয়ে গেল। শুধু এক সাব-রেজিস্ট্রারের সই আর সীলমোহর লাগান বাকি রইল। এই কাজটুকুর জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত ছিলাম না।

মেমসাহেব অনেকদিন আগে বললেও আমি এতদিন বাড়ি ভাড়া নেবার কথা খুব সিরিয়াসলি ভাবিনি। সেবার কলকাতা থেকে ফিরে সত্যি সত্যিই গ্রীনপার্ক ঘোরাঘুরি শুরু করলাম, দু' চারজন বন্ধু-বান্ধবকেও বললাম।

দু'চারটে বাড়ি দেখলাম কিন্তু ঠিক পছন্দ হলো না। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। আরো কিছু বাড়ি দেখলাম। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আরো কিছু পরামর্শ করলাম। কয়েকটা বাড়ির জন্য দরদস্তুরও করলাম।

এমনি করে আরো মাস দুই কেটে যাবার পর সত্যি সত্যিই তিনখানা ঘরের একটা ছোট কটেজ পেলাম তিনশ' টাকায়। বাড়িটা আমার বেশ পছন্দ হলো। মেহরলী রোড থেকে বড় জোর দু'শো গজ হবে। গ্রীনপার্ক মার্কেট বেশ কাছে, মিনিট তিন-চারের রাস্তা। বাজার দূরে হলে মেমসাহেবের পক্ষে কষ্টকর হতো। তাছাড়া বাড়িটাই বেশ ভাল। কর্নার প্লট্। সামনে আর পাশে মাঝারি সাইজের লন। গেটের ভিতর দিয়ে বাড়ির ভিতরে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা। ড্রইং-ডাইনিং রুমটা তো বেশ বড়। কুড়ি বাই পনের। একটা বেডরুম বড়, একটা ছোট। দুটো বেডরুমেই লফট্ আর ওয়ারড্রব। বড় বেডরুম আর ড্রইং-ডাইনিং রুমের মাঝে একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলের বাথরুম। বাড়ির ভিতরে একটা ইণ্ডিয়ান স্টাইলের প্রিভি। সামনের বারান্দাটা অনেকটা লম্বা থাকলেও বিশেষ চওড়া ছিল না। ভিতরের বারান্দাটা স্কোয়ার সাইজের বেশ বড় ছিল। রান্নাঘর? দিল্লীর নতুন বাড়িতে যেমন হয়, তেমনিই ছিল। আলমারী—মিটসেফ্—সিঙ্ক-কাপবোর্ড সবই ছিল। লফট্, আলমারী ওয়ারড্রব থাকার জন্য আলাদা কোন স্টোর ছিল না কিন্তু ছাদে একটা দরজা-বিহীন ঘর ছিল।

লন দুটো বেশ ভাল ছিল সত্যি কিন্তু দিল্লীর অন্যান্য বাড়ির মত এই বাড়িটায় কোন ফুলগাছ ছিল না। আগে যিনি ভাড়া ছিলেন, তার নিশ্চয়ই ফুলের শখ ছিল না। তবে সামনের বারান্দার এক পাশ দিয়ে একটা বিরাট মাধবীলতা উঠেছিল।

মোটকথা সব মিলিয়ে বাড়িটা আমার বেশ ভাল লেগেছিল। তাছাড়া আমার মত ডাকাতের হাতে পড়ে মেমসাহেব ফ্যামিলি

প্ল্যানিং এসোসিয়েশনের সভানেত্রী হলেও এ বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হবে না বলে বাড়িটা আরো ভাল লেগেছিল।

বাড়িটা নেবার পর মেমসাহেবকে কিছু জানালাম না। ঠিক করলাম ও দিল্লী আসার আগেই বেশ কিছুটা সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে চমকে দেব। আবার ভাবলাম, ওয়েস্টার্ন কোর্ট ছেড়ে এই বাড়িতেই চলে আসি। পরে ভাবলাম, না, না, তা হয় না। একলা একলা থাকব এই বাড়িতে? অসম্ভব। ঠিক করলাম ওকে নিয়েই এই বাড়িতে ঢুকব।

গজাননকে আমার এই নতুন বাড়িতে থাকতে দিলাম। আমি ওকে বললাম গজানন, তুমি আমার বাড়িটার দেখাশুনা কর। আমি এর জন্য তোমাকে মাসে মাসে কিছু দেব।

গজানন সাফ জবাব দিয়েছিল, নেই নেই, ছোটাসাব, তুমি আমার হিসেব-টিসেব করতে পারবে না। আমি বিবিজির কাছ থেকে যা নেবার তাই নেব।

গজানন বাসে যাতায়াত করত। ডিউটি শেষ হবার পর এক মিনিটও অপেক্ষা করত না। সোজা চলে যেত গ্রীনপার্ক।

আমি আমার বাড়তি আড়াইশ' টাকা দিয়ে কেনাকাটা শুরু করে দিলাম। একটা সোফা সেট কিনলাম, একটা ডবল বেডের খাট কিনলাম। ওয়েস্টার্ন কোর্ট থেকে আমার বইপত্তর ঐ বাড়িতে নিয়ে গেলাম। বিদেশ থেকে কিনে আনা ডেকরেশন পিসগুলোও সাজালাম।

তারপর এক মাসে সমস্ত ঘরের জন্য পর্দা করলাম। তাছাড়া যখন যেরকম বাতিক আর সামর্থ্য হয়েছে, তখন কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়াম্ বা অন্য কোন স্টেট এম্পোরিয়াম্ থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনে ঘরদোর সাজাচ্ছিলাম।

গজানন বড় দরদ নিয়ে বাড়িটার দেখাশুনা করছিল। দীর্ঘদিন ওয়েস্টার্ন কোর্টে কাজ করার ফলে ওর বেশ একটা রুচিবোধ

হয়েছিল। মানি প্ল্যাণ্ট, ক্যাকটাস্‌, ফার্ন দিয়ে বাড়িটা চমৎকার সাজাল।

আমি যখনই দিল্লীর বাইরে গেছি, গজানন তখনই ফরমায়েশ করে ছোটখাট সুন্দর সুন্দর জিনিস আনিয়েছে। হায়দ্রাবাদ থেকে দশ-পনের টাকা দামের ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর উড্‌ কার্ভিং এনেছি, বেনারস থেকে পাথরের জিনিস এনেছি, কলকাতা থেকে বাঁকুড়ার টেরেকোটা ঘোড়া আর কৃষ্ণনগরের ডলস্‌ এনেছি। উড়িষ্যা থেকে স্যাণ্ডস্টোনের কোনারক মূর্তি, কালীঘাট আর কটকি পটও এনেছিলাম আমাদের ড্রইংরুমের জন্য।

বুক-সেলফ'এর উপর দু'কোনায় দুটো ফটো রেখেছিলাম। একটা প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আমার ছবি আর একটা মেমসাহেবের প্রোর্ট্রেট।

এদিকে যে এতকাণ্ড করছিলাম, সেসব কিছুই মেমসাহেবকে জানালাম না। ইচ্ছা করেই জানালাম না। ইতিমধ্যে বোম্বে থেকে মেজদির কাছ থেকে চিঠি পেলাম—

ভাই রিপোর্টার,

যুদ্ধ না করেও যারা যোদ্ধা, ইণ্ডিয়ান নেভীর তেমনি এক অফিসারকে বিয়ে করে কি বিপদেই পড়েছি। সংসার করতে গিয়ে রোজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, রোজ হেরে যাচ্ছে। রোজ বন্দী করছি, রোজ মুক্তি দিচ্ছি। তবে বার বার তো যুদ্ধ-বন্দীর প্রতি এত উদার ব্যবহার করা যায় না। এবার তাই শাস্তি দিয়েছি, দিল্লী ঘুরিয়ে আনতে হবে। তবে ভাই একথা স্বীকার করব বন্দী এক কথায়, বিনা প্রতিবাদে, শাস্তি হাসিমুখে মেনে নিয়েছে।

আর কিছুদিনের মধ্যেই তুমিও বন্দী হতে চলেছ। শাস্তি তোমাকেও পেতে হবে। তবে তুমি তোমার মেমসাহেবের কাছ থেকে শাস্তি পাবার আগেই আমরা দুজনে তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য দিল্লী আসছি।

প্রেসিডেন্টের খুব ইচ্ছা যে আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনে ওর অতিথি হই। কিন্তু ভাই, তোমাকে ছেড়ে কি রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকা ভাল দেখায়? তোমার মনে কষ্ট দিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকতে আমি পারব না। আমাকে ক্ষমা করো।

আগামী বুধবার ফ্রন্টিয়ার মেল অ্যাটেণ্ড করতে ভুলে যেও না। তুমি স্টেশনে না এলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই আবার সেই রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে হবে।

তোমার মেজদি।

বুধবার আমি ফ্রন্টিয়ার মেল অ্যাটেণ্ড করেছিলাম। মেজদিদের নিয়ে এসেছিলাম আমার গ্রীনপার্কের নতুন আস্তানায়। সারা জীবন কলকাতায় ঐ চারখানা ঘরের তিনতলার ফ্ল্যাটে কাটিয়ে আমার গ্রীনপার্কের বাড়ি মেজদির ভীষণ পছন্দ হয়েছিল।

যুদ্ধ না করেও যিনি যোদ্ধা, মেজদির সেই ভাগ্যবান বন্দী ঘরবাড়ি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, দেখেশুনে মনে হচ্ছে ম্যাডাম সপিং করতে গিয়েছেন। এক্ষুনি এসে ড্রইংরুমে বসে এককাপ কফি খেয়েই বেডরুমে লুটিয়ে পড়বেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ম্যাডাম'এর জন্য এত আয়োজন করার পর এ বাড়িতে আপনার একলা থাকতে কষ্ট হয় না?

আমি বলেছিলাম, আমি তো এখানে থাকি না। আমি ওয়েস্টার্ন কোর্টেই থাকি।

আমার কথায় ওরা দুজনেই অবাক হয়েছিল। বোধহয় খুশিও হয়েছিলেন। খুশি হয়েছিলেন এই কথা ভেবে যে একলা ভোগ করার জন্য আমি এত উদ্যোগ আয়োজন করিনি।

মেজদিরা তিনদিন ছিলেন। কখনো ওরা দুজনে, কখনও বা আমরা তিনজনে ঘুরে বেড়িয়েছি। ওদের দিল্লী ত্যাগের আগের দিন সন্ধ্যায় গ্রীনপার্কের বাড়ির ড্রইংরুমে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমরা আড্ডা দিয়েছিলাম।

কথায় কথায় মেজদি একবার বললেন, সংসার করার প্রায় সবকিছুই তো আপনি যোগাড় করে ফেলেছেন। বিয়েতে আপনাদের কি দেব বলুন তো?

আমি উত্তর দেবার আগেই বন্দী উত্তর দিলেন, আজেবাজে কিছু না দিয়ে একটা ফোমড্ রাবারের গদি দিও। শুয়ে আরাম পাবে আর প্রতিদিন তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে।

এইসব আজেবাজে আলতু-ফালতু কথাবার্তা বলতে বলতে অনেক রাত হয়েছিল। মেজদি বললেন, আজ আর ওয়েস্টার্ন কোর্ট যাবেন না, এইখানেই থেকে যান।

আমি হেসে বলেছিলাম, না, না, তা হয় না।

'কেন হয় না?'

'ওখানে নিশ্চয়ই জরুরী চিঠিপত্র এসেছে…'

মেজদি মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন, এত রাত্তিরে আর চিঠিপত্তর দেখে কি করবেন। কাল সকালে দেখবেন।

আবার বললাম, না, না, মেজদি, আমি এখন এ-বাড়িতে থাকব না।

এবার মেজদি হাসলেন। বললেন, কেন? প্রতিজ্ঞা করেছেন বুঝি যে, একলা একলা এই বাড়িতে থাকবেন না?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম। একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে এলাম ওয়েস্টার্ন কোর্ট।

পরের দিন স্টেশনে বিদায় জানাতে গেলে মেজদি আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিলেন। বললেন, আপনার মেমসাহেব বোম্বে দেখেনি। তাই সামনের ছুটিতে আমাদের কাছে আসবে। ক'দিনের জন্য দিল্লী পাঠিয়ে দেব, কেমন?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপকা মেহেরবানি!

মেজদি বললেন, মেহেরবানির আবার কি আছে? বিয়ের আগে একবার সবকিছু দেখেশুনে যাক।

আমি এ-কথারও কোন জবাব দিলাম না। মাথা নীচু করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্রেন ছাড়ার মুখে মেজদি বললেন, ফাল্গুনে বিয়ে হলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

আমি মাথা নীচু করেই বললাম, সে-সময় যে পার্লামেন্টের বাজেট সেসন চলবে।

'তা চলুক গে। বেশী দেরী আর ভাল লাগছে না।'

শেষে মেজদি বলেছিলেন, সাবধানে থাকবেন ভাই। চিঠি দেবেন।

মেজদি চলে যাবার পর মনটা সত্যি বড় খারাপ লাগল। পরমাত্মীয়ের বিদায়-ব্যথা অনুভব করলাম মনে মনে।

ক'দিন পর মেমসাহেবের চিঠি পেলাম।

...'তুমি কি কোন তুক-তাক বা কবচ-মাদুলী দিয়ে মেজদিকে বশ করেছ? ও মা-র কাছে ছ' পাতা আর আমার কাছে চার পাতা চিঠি লিখেছে। সারা চিঠি ভর্তি শুধু তোমার কথা, তোমার প্রশংসা। তোমার মত ছেলে নাকি আজকাল পাওয়া মুশকিল। তুমি নাকি ওদের খুব যত্ন করেছ? ওরা নাকি খুব আরামে ছিল?

তারপর মা-র চিঠিতে ফাল্গুন মাসে বিয়ে দেবার কথা লিখেছে। তোমারও নাকি তাই মত? মা-র কোন আপত্তি নেই। আজ মেজদির চিঠিটা মা দিদির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আর ক'দিন পরেই আমাদের কলেজ বন্ধ হবে। ছুটিতে মেজদির কাছে যাব। যদি মেজদিকে ম্যানেজ করতে পারি তবে ওদের কাছে দু' সপ্তাহ থেকে এক সপ্তাহের জন্য তোমার কাছে যাব।

আমাদের এখানকার আর সব খবর মোটামুটি ভাল। তবে ইদানীং খোকনকে নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছে ও রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। পড়াশুনা এখনও অবশ্য ঠিকই করছে কিন্তু ভয় হয় একবার যদি রাজনীতি নিয়ে বেশী মেতে

ওঠে, তবে পড়াশুনার ক্ষতি হতে বাধ্য। খোকন যদি কোন কারণে খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য আমারও কিছুটা দায়ী হতে হবে। সর্বোপরি বৃদ্ধ বিপত্নীক কাকাবাবু বড় আঘাত পাবেন।'…

আমি মেমসাহেবকে লিখলাম, মেজদি যা লিখেছে তা বর্ণে বর্ণে সত্য। ফাল্গুন মাসে পার্লামেন্টের সেসন চলবে। কিন্তু তা চলুক গে। চুলোর দুয়োরে যাক পার্লামেন্ট! ফাল্গুন মাসে আমি বিয়ে করবই। আমার আর দেরী সহ্য হচ্ছে না। তুমি যে আমার চাইতেও বেশী অধৈর্য হয়েছ, তা আমি জানি।

আরো অনেক কিছু লিখেছিলাম। শেষের দিকে খোকনের সম্পর্কে লিখেছিলাম, তুমি ওকে নিয়ে অত চিন্তা করবে না। বাঙালীর ছেলেরা যৌবনে হয় রাজনীতি, না হয় কাব্য-সাহিত্য চর্চা করবেই। শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত ঋতুর মত এসব চিরস্থায়ী নয়। দু'চারদিন ইন্‌কিলাব বা বন্দেমাতরম্ চিৎকার করে ডালহৌসী স্কোয়ারের স্টীম রোলারের তলায় পড়লে সব পাল্টে যাবে। খোকনও পাল্টে যাবে।

এ-কথাও লিখলাম, তুমি খোকনের জন্য অত ভাববে না। হাজার হোক আজ সে বেশ বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে। তাছাড়া তার বাবা তো আছেন। ছেলেমেয়েদের এই বয়সে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে গেলে অনেক সময়েই হিতে বিপরীত হয়। তোমারও হতে পারে। সুতরাং একটু খেয়াল করে চলবে।

শেষে লিখলাম, খোকন যখন ছোট ছিল, যখন তাকে মাতৃস্নেহ দিয়ে, দিদির ভালবাসা দিয়ে অভাবিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল, তুমি ও মেজদি তা করেছ। তোমাদের স্নেহচ্ছায়ায় যে একটা মাতৃহারা শিশু আজ যৌবনে পদার্পণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, সেইটুকুই তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। এর চাইতে বেশী আশা করলে হয়ত দুঃখ পেতে পার।

জান দোলাবৌদি, খোকন সম্পর্কে এত কথা আমি লিখতাম না।

কিন্তু ইদানীংকালে মেমসাহেব খোকনকে নিয়ে এত বেশী মাতামাতি, এত বেশী চিন্তা করা শুরু করেছিল যে-এসব না লিখে পারলাম না। আজকাল ওর প্রত্যেকটা চিঠিতে খোকনের কথা থাকত। লিখত, খোকনের এই হয়েছে, ঐ হয়েছে। খোকনের কি হলো, কি হবে? খোকন কি মানুষ হবে না? ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার কথা লিখত। তুমি তো জান আজকালকার দিনে নিজেদের খোকনকেই মানুষ করতে মানুষ পাগল হয়ে উঠছে তাছাড়া স্নেহ-ভালবাসা দেওয়া সহজ কিন্তু বিনিময়ে তার মর্যাদা পাওয়া দুর্লভ।

খোকনের প্রতি ওর এত স্নেহ-ভালবাসার জন্য সত্যি আমার ভয় করত। ভয় হতো যদি কোনদিন খোকন ওর এই স্নেহ-ভালবাসার মূল্য না নেয়, মর্যাদা না দেয়, তখন সে-দুঃখ, সে-আঘাত সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। তাই না?

এই চিঠির উত্তরে মেমসাহেব কি লিখল জান? লিখল, তুমি যত সহজে খোকন সম্পর্কে যেসব উপদেশ পরামর্শ দিয়েছ, আমার পক্ষে অত সহজে সেসব গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ খুব সহজ। মাতৃহারা ছ'বছরের শিশু খোকনকে নিয়ে কাকাবাবু আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। মাতৃস্নেহ দেবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না কিন্তু দিদি, মেজদি আর আমি ওকে বড় করেছি। ওকে খাইয়েছি, পরিয়েছি, সুর করে ছড়া বলতে বলতে কোলের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়েছি। একদিন নয়, দু'দিন নয়, বছরের পর বছর খোকনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুয়েছি আমরা তিন বোনে।

কয়েক বছর পর দিদির বিয়ে হয়ে গেলে আমি আর মেজদি ওকে দেখেছি। ওর অসুখ হলে মেজদি ছুটি নিয়েছে, আমি কলেজ কামাই করেছি, মা মানত করেছেন। মেজদিরও বিয়ে হয়ে গেল। আজ খোকনকে দেখবার জন্য শুধু আমি পড়ে রয়েছি। তুমিও কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে। মা-বাবার কথা বাদ দিলে খোকন

ছাড়া এখানে আমার আর কি আকর্ষণ আছে বল? হাতেও প্রচুর সময়। তাইতো খোকনের কথা না ভেবে উপায় কি?

এই চিঠির উত্তরে আমি আর খোকন সম্পর্কে বিশেষ কিছু লিখলাম না। ভাবলাম মেমসাহেবের ছুটিতে দিল্লী এলেই কথা-বার্তা বলব।

ছুটিতে মেমসাহেব বোম্বে গিয়েছিল। একবার ভেবেছিলাম দু'তিনদিনের জন্য বোম্বে ঘুরে আসি। খুব মজা হতো। কিন্তু শেষপর্যন্ত গেলাম না। মেজদির ওখানে সতের-আঠারো দিন কাটিয়ে মেমসাহেব কলকাতায় যাবার পথে দিল্লী এসেছিল। কলকাতায় সবাই জানত ও বোম্বেতেই আছে। মেমসাহেব আমার কাছে মাত্র চার-পাঁচদিন ছিল।

মেমসাহেবকে গ্রীনপার্কের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর খুব পছন্দ হয়েছিল। বলেছিল, লাভলি।

তারপর বলেছিল, তুমি যে এর মধ্যেই এত সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবে, তা ভাবতে পারিনি।

আমি বলেছিলাম, তোমাকে বিয়ে করে তো যেখানে-সেখানে তুলতে পারি না।

ঐ লম্বা সরু কালো ভ্রূ দুটো টান করে উপড়ে তুলে ও বলেছিল, ইজ ইট?

'তবে কি?'

মেমসাহেব গজাননকে অশেষ ধন্যবাদ জানাল অত সুন্দর করে বাগান করবার জন্য। জিজ্ঞাসা করল, গজানন, তোমার কি চাই বল?

গজানন বলেছিল, বিবিজি, আভি নেই। আগে তুমি এসো, সবকিছু বুঝে-টুঝে নাও, তারপর হিসাব-টিসাব করা যাবে।

বিকেল হয়ে এসেছিল? গজাননকে কিছু খাবার-দাবার আর কফি আনতে মার্কেটে পাঠিয়ে দিলাম। মেমসাহেব ও-পাশের

সোফাটা ছেড়ে আমার পাশে এসে বসল। আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মাথা নীচু করে কি যেন দেখছিল, কি যেন ভাবছিল। আমি কিছু বললাম না, চুপ করেই বসে রইলাম। কয়েক মিনিট ঐভাবেই কেটে গেল। তারপর ঐ মাথা নীচু করেই নরম গলায় ও বললো, সত্যি, তুমি আমাকে সুখী করার জন্য কত কি করছ।

'কেন? আমি বুঝি সুখী হবো না?'

'নিশ্চয়ই হবে। তবুও এত বড় বাড়ি এত সব আয়োজন তো আমার জন্যই করেছ।

আমি ঠাট্টা করে বললাম, সেজন্য কিছু পুরস্কার দাও না!

মেমসাহেব হেসে ফেললো। বললো, তোমার মাথায় শুধু ঐ এক চিন্তা!

'তোমার মাথায় বুঝি সে চিন্তা আসে না?'

ও চিৎকার করে বললো, নো, নো, নো!

এক মুহূর্তের জন্য আমিও চুপ করে গেলাম। একটু পরে বললাম, এদিকে তো গলাবাজি করে খুব নো, নো বলছ, আর ওদিকে বিয়ের আগেই ছেলেমেয়ের ঘর ঠিক করছ।

মেমসাহেব এইভাবে ফার্স্ট ওভারের ফার্স্ট বলে বোলড্ হবে, ভাবতে পারে নি। আমার কথার কোন জবাব ছিল না ওর কাছে। শুধু বললো, তোমার মত ডাকাতের সঙ্গে ঘর করতে হলে একটু ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে উপায় আছে?

গ্রীনপার্ক থেকে ওয়েস্টার্ন কোর্টে ফিরে আসার পর মেমসাহেব বললো, জান, মেজদি বলছিল বিয়েতে তোমার কি চাই তা জেনে নিতে।

আমি ভ্রূ কুঁচকে বেশ অবাক হয়ে বললাম, সে কি? মেজদি জানে না?

'তুমি বলেছ নাকি?'

'একবার? হাজারবার বলেছি।'

আমার রাগ দেখে ও যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বললো, হয়ত কোন কারণে ··

'এর মধ্যে কারণ-টারণ কিছু নেই।'

মেমসাহেবের মুখটা চিন্তায় কালো হয়ে গেল। মুখ নীচু করে বললো, মেজদি হয়ত ভেবেছে তুমি ফ্রাঙ্কলি আমাকে সবকিছু খুলে বলতে পার···

'তোমাকে যা বলব, মেজদিও তা জানে।'

মেমসাহেব নিশ্চল পাথরের মত মাথা নীচু করে বসে রইল। আমি চুরি করে ওর দিকে চাইছিলাম আর হাসছিলাম।

একটু পরে ও আমার কাছে এসে হাতদুটো ধরে বললো, ওগো, বল না, বিয়েতে তোমার কি চাই।

আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, তোমার মেজদি জানেন না যে আমি তোমাকে চাই?

একটা বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হাসতে হাসতে ও বললো, বাপরে বাপ! কি অসভ্য ছেলেরে বাবা!

আমি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বললাম, এতে অসভ্যতার কি করলাম?

মেমসাহেব আমাকে এক দাবড় দিয়ে বললো, বাজে বকো না। ছি, ছি, অমন করে কেউ ভাবিয়ে তোলে?

পরে ও আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বল না, বিয়েতে তুমি কি চাও?

আমি বললাম, তোমার এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছে না? তুমি কি ভেবেছ আমি সেই ভদ্রবেশী অসভ্য ছোটলোক-গুলোর দলে যে লুকিয়ে লুকিয়ে নগদ টাকা নিয়ে পরে চালিয়াতি করব?

পরে মেজদিকে একটা চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, আপনারা

আমাকে ঠিক চিনতে পারেন নি। বিয়েতে যৌতুক বা উপঢৌকন তো দূরের কথা, অন্য কোন মানুষের দয়া বা কৃপা নিয়ে আমি জীবনে দাঁড়াতে চাই না। সে মনোবৃত্তি থাকলে বেহালায় সরকারী জমিতে সরকারী অর্থে একটা বাড়ি বা কলকাতার শহরে বেনামীতে দুটো-একটা ট্যাক্সি অনেক আগেই করতাম। আর শ্বশুরের পয়সায়, শ্বশুরের কৃপায় সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠা? ছিঃ, ছিঃ। মেরুদণ্ডহীন হীনবীর্য পুরুষ ছাড়া এ কাজ কেউ পারবে না। খিড়কির দরজা দিয়ে আয় করে, সম্পত্তি করে চালিয়াতি করতে আমি শিখিনি। নিজের কর্মক্ষমতা ও কলমের জোরে যেটুকু পাব, তাতেই আমি সুখী ও সন্তুষ্ট থাকব।

এই চিঠির উত্তরে মেজদি লিখেছিলেন, ভাই রিপোর্টার, তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো তুমি আমাদের ভুল বুঝেছ। তোমার সঙ্গে আমাদের সবচাইতে ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে। তাইতো তোমরা দু'জনে আমাদের কত প্রিয়, কত আদরের। তোমাদের বিয়েতে আমরা কিছু দেব না, তাই কি হয়? তোমাদের কিছু না দিলে কি বাবা-মা শান্তি পাবেন?

আমি আবার লিখলাম, সেন্টিমেণ্টের লড়াই লড়বার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আমার কিছু চাই না। যদি নিতান্তই কিছু দিতে চান, তাহলে কন্‌টেম্‌পোরারি হিস্ট্রীর কিছু বই দেবেন। দয়া করে আর কিছু দিয়ে আমাকে বিব্রত করবেন না।

যাক্‌গে ওসব কথা। মেমসাহেব কলকাতা যাবার আগের দিন দু'জনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে শেষে বুদ্ধ-জয়ন্তী পার্কে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। কথায় কথায় মেমসাহেব খোকনের কথা বলেছিল, তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে আসার পর বুঝলাম তোমাকে কত ভালবাসি। এমন একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা আমাকে ঘিরে ধরল যে তোমাকে কি বলব! কোনমতে সেই

লেডিজ ট্রামে চেপে কলেজ যেতাম আর আসতাম। আর কোথাও যেতাম না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সিনেমা টিনেমা কিছু ভাল লাগত না।

আমি বললাম, ঠিক সেইজন্যই তো খোকনকে বেশী আঁকড়ে ধরেছ, তা আমি বুঝি।

'তাইতো সন্ধ্যার পর খোকনকে পড়াতে বসতাম। পড়াশুনা হয়ে গেলে খাওয়া-দাওয়ার পর ছাদে গিয়ে দুজনে বসে বসে গল্প করে কাটাতাম। কোন কোনদিন মা আসতেন। গান গাইতে বলতেন কিন্তু আমি গাইতে পারতাম না। গান গাইবার মত মন আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

একটু পরে আবার বললো, গরমকালে কলকাতার সন্ধ্যাবেলা যে কি সুন্দর তা তো তুমি জান। তোমার সঙ্গে কত ঘুরে বেড়িয়েছি ঐ সন্ধ্যাবেলায় কিন্তু তুমি চলে আসার পর আমি কলেজ থেকে ফিরে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম আমার খাটে।

'তাই বুঝি ?'

'সত্যি বলছি, জানলা দিয়ে পাশের শিউলি গাছটা দেখতাম আর এক টুকরো আকাশ দেখতে পেতাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতাম শুধু তোমার কথা।'

আমি ওর হাতটা আমার হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। বললাম, তুমি যে আমাকে ছেড়ে শান্তিতে থাকতে পার না, তা আমি জানি মেমসাহেব।

ওর চোখদুটো কেমন যেন ছলছল করছিল। গলার স্বরটাও স্বাভাবিক ছিল না। ভেজা ভেজা গলায় বললো, এখন শুধু খোকন ছাড়া কলকাতায় আমার কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু ছেলেটা আজকাল যে কি লাগিয়েছে তা ওই জানে।

'কি আবার লাগাল ?'

'মনে হচ্ছে খুব জোর পলিটিক্স করছে।'

'তার জন্য ভয় পাবার বা চিন্তা করবার কি আছে ?'

'তুমি কলকাতায় রিপোর্টারী করেছ, অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন দেখছ। সুতরাং তুলি দেখলে বুঝতে পারতে কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না ও কি করছে। সেইজন্যই বেশী ভয় হয়।'

'চুরি-জোচ্চুরি তো করছে না, সুতরাং তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ?'

মেমসাহেব দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কেমন যেন অসহায়ার মত আমার দিকে তাকাল। বললো, জান, এই ত কিছুদিন আগে হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফিরল। প্রথমে কিছুই বলছিল না। বার বার জিজ্ঞাসা করার পর বললো, পুলিসের লাঠি লেগেছে। এবার মেমসাহেব আমার হাতদুটো চেপে ধরে বললো, আচ্ছা বলতো, ঐ লাঠিটাই যদি মাথায় লাগত, তাহলে কি সর্বনাশ হতো ?

আমি বেশ বুঝতে পারলাম খোকন রাজনীতিতে খুব বেশী মেতে উঠেছে। সভা-সমিতি মিছিল-বিক্ষোভ করছে সে এবং আজ হাতে লাঠি পড়েছে, কাল মাথায় পড়বে, পরশু হয়ত গুলীর আঘাতে আহত হয়ে মেডিক্যাল কলেজের অপারেশন থিয়েটারে যাবে। চিন্তার নিশ্চয়ই কারণ আছে কিন্তু এ-কথাও জানি ছেলেরা একবার মেতে উঠলে ফিরিয়ে আনা খুব সহজ নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টারী করতে গিয়ে কলকাতার রাজপথে বহুজনকে পুলিশের লাঠিতে আহত, গুলীতে নিহত হতে দেখেছি। সব রিপোর্টারই এসব দেখে থাকেন, নিশ্চল নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমিও সবকিছু দেখেছি, একফোঁটাও চোখের জল ফেলিনি।

আজ মেমসাহেব খোকনের কথা বলায় হঠাৎ মুহূর্তের জন্য এইসব দৃশ্যের ঝড় বয়ে গেল মনের পর্দায়ে। কেন, তা বুঝতে পারলাম না। মনে মনে বেশ একটু চিন্তিতও হলাম। ওকে সেসব

কিছু বুঝতে দিলাম না। সান্ত্বনা জানিয়ে বললাম, হাতে একটু লাঠি লেগেছে বলে অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? কলকাতায় বাস করে যে পুলিসের এক ঘা লাঠি খায়নি, সে খাঁটি বাঙালীই না।

দু' ফোঁটা চোখের জল ইতিমধ্যেই গড়িয়ে পড়েছিল মেমসাহেবের গালের 'পর। আমার কাছ থেকে লুকোবার জন্য তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে সারা মুখটা মুছে নিয়ে বললো, হয়ত তোমার কথাই ঠিক কিন্তু যদি কোনদিন কিছু হয়।...

মেমসাহেব আর বলতে পারল না। দুই হাঁটুর 'পর মাথাটা রাখল। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, অত ভয় পাচ্ছ কেন মেমসাহেব? আবার বললাম, অত চিন্তা করলে কি বাঁচা যায়?

মেমসাহেব রাজনীতি করত না কিন্তু কলকাতাতে জন্মেছে, স্কুল-কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। সুতরাং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অনেক কিছু দেখেছে। হয়ত গুলিতে মরতে দেখে নি কিন্তু লাঠি বা টিয়ার-গ্যাস বা ইট-পাটকেলের লড়াই নিশ্চয়ই অনেকবার দেখেছে। তাছাড়া খবরের কাগজও পড়ে, ছবি দেখে। সেই সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই খোকন সম্পর্কে মেমসাহেব একটু অস্থির না হয়ে পারে নি।

ওয়েস্টার্ন কোর্টে ফিরে আসার পর আমি মেমসাহেবকে বলেছিলাম, তুমি বরং খোকনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। এখানে পড়াশুনা করবে আর আমাকেও একটু-আধটু সাহায্য করবে।

আমার প্রস্তাবে ও আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, সত্যি ওকে পাঠিয়ে দেব?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাও।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'ক'মাস পরেই তো ওর ফাইন্যাল।'

আমি বললাম, ঠিক আছে। পরীক্ষা দেবার পরই পাঠিয়ে দিও, এখানে বি-এ পড়বে।

মেমসাহেব একটু হাসল, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরল। বললো, ততদিনে আমিও তো তোমার কাছে এসে যাব, তাই না?

আমি ওর মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে একটু আদর করে বললাম, তখন খুব মজা হবে, তাই না?

ও আমার বুকের 'পর মাথা রেখে বললো, সত্যি খুব-মজা হবে।

আঠারো

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ছুনিয়ায় আস্তে আস্তে বেশ জল ঘোলা হতে শুরু করল। সীমান্ত নিয়ে মাঝে মাঝেই অস্বস্তিকর খবর ছাপা হতে লাগল পত্র-পত্রিকায়। সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেণ্টে ঝড় বয়ে যেত —সর্ট নোটিশ, কলিং অ্যাটেনশান, অ্যাডজর্নমেণ্ট মোশান! সরকার আর বিরোধী পক্ষের লড়াই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়। কংগ্রেস পার্টির মধ্যেও সরকারী নীতির সমালোচনা শুরু হল গোপনে গোপনে। সরকারী নীতির গোপন সমালোচনার এসব খবর কংগ্রেসীরাই নেমন্তন্ন করে আমাদের পরিবেশন করতেন। তবে সবাইকে নয়, অনেককে। যমুনার জল আরো গড়িয়ে গেল। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সাধারণ সভায় সরকারী নীতির সমালোচনার গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল মাঝে মাঝে। তবে নিয়মিত নয়। সমষ্টিগতভাবেও নয়। পাঁচশ-সাড়ে পাঁচশ জন কংগ্রেসী এম-পি'র মধ্যে মাত্র ছু-চারজন সরকারী নীতির প্রশংসা করতে করতে শেষের দিকে ভুল করে সরকারের সমালোচনা করছিলেন।

রাজনৈতিক ছুনিয়ার জল আরো ঘোলা হল। যমুনার জল আরো গড়িয়ে গেল। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিতে সরকারী নীতির সমালোচকদের সংখ্যা বাড়ল, সমালোচনা তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হল। মাঝে মাঝে নয়, প্রতি মিটিংয়েই সমালোচনা শুরু হল। এখন আর গোপনে নয়, প্রকাশ্যে সর্বজনসমক্ষে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সেক্রেটারীরা এই সব সমালোচনার খবর দিতেন করসপনডেণ্টদের। ভারতবর্ষের প্রতিটি

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় মোটা মোটা বড় বড় হরফে এসব খবর ছাপা হত।

ওদিকে উত্তর সীমান্তের নানা দিক থেকে নানা খবর আসছিল মাঝে মাঝেই। কখনো নেফার জঙ্গল থেকে, কখনো লাডাকের পার্বত্য মরুভূমি থেকে, কখনো ওয়ালঙ থেকে, কখনো দৌলত-বেগ-ওলডি বা চুশুল, মাগার, ডেমচক থেকে গুলীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ঐসব গুলীর আওয়াজ নিউজ এজেন্সীর টেলিপ্রিণ্টার মারফত দিল্লী পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই 'মিস্টার স্পীকার, স্যার'-এর টেবিলে জমা হত কলিং অ্যাটেনশন-অ্যাডজর্নমেণ্ট মোশানের নোটিশ। এয়ার-কণ্ডিসনড লোকসভা চেম্বার রাজনৈতিক উত্তেজনায় দাউ দাউ করে জ্বলত সারা দিন।

ডিফেন্স মিনিস্ট্রি-এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রিতেও চাঞ্চল্য বেড়ে গেল অনেক। মিটিং-কনফারেন্স প্রেসনোট-প্রটেস্ট নোটের ঠেলায় আমাদের কাজের চাপ সহস্র গুণ বেড়ে গেল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের সে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস আর একবার মোড় ঘুরছিল। আমরা দিল্লীপ্রবাসী করসপনডেণ্টের দল প্রতিদিন সেই ইতিহাসের টুকরো টুকরো সংগ্রহ করে পরিবেশন করছিলাম অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার জন্য।

এই বাজারে দিল্লীর গুরুত্ব আরো বেশী বেড়ে গেল। এক দল ফরেন করসপনডেণ্ট আগেও ছিলেন কিন্তু এই বাজারে আরো অনেকে এলেন সান্‌ফ্রান্সিসকো-নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন-অটোয়া-লণ্ডন-প্যারিস - ব্রাসেলস - মস্কো - প্রাগ-কায়রো - করাচী- সিডনি-টোকিও থেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকেও আরো অনেক করসপনডেণ্ট এলেন দিল্লী। ইউনাইটেড নেশনস্-লণ্ডন-প্যারিস-মস্কো-কায়রো-টোকিওর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীও পৃথিবীর অন্যতম প্রধান নিউজ সেণ্টার হল।

আমার কাগজের ডাইরেক্টর ও সম্পাদক এবার উপলব্ধি করলেন আমাকে শুধু মাইনে দিলেই চলবে না, দিল্লী থেকে গরম গরম খবর পাবার জন্য আরো কিছু করতে হবে। সাধারণত দিল্লীর বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য এতদিন আমাকেই কর্তারা ডেকে পাঠাতেন। এবার সম্পাদক স্বয়ং দিল্লী এলেন আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার অছিলায় সম্পাদক সাহেব আরো কয়েকটি অফিস ঘুরে ফিরে তাদের কাজকর্ম ও অফিসের বিধিব্যবস্থা দেখে নিলেন। তারপর আর আমাকে বলতে হল না, নিজেই উপলব্ধি করলেন আমার কাছ থেকে আরো বেশী ও ভাল কাজ পেতে হলে আমাকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

এডিটর সাহেব নিজেই বললেন, বাচ্চু, সব চাইতে আগে তোমার একটা গাড়ি চাই। গাড়ি ছাড়া এখানে কাজ করা রিয়েলি মুশকিল।

আমি বললাম, এখন প্রায় সব করসপনডেণ্টদেরই গাড়ি আছে। গাড়ি না হলে ঠিক স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত ঘোরাঘুরি করা অসম্ভব।

এডিটর সাহেব বললেন, তাছাড়া আমাদের একটা অফিস দরকার।

শেষে বললেন, তুমি এবার ওয়েস্টার্ন কোর্ট ছেড়ে গ্রীন পার্কে চলে যাও। বাড়িতে একটা টেলিফোন নাও। গাড়ি আর টেলিফোন থাকলে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না।

আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললাম, তা ঠিক। তবে ভাবছিলাম ফাল্গুন মাসের পরেই গ্রীন পার্ক যাব।

'কেন তুমি কি ফাল্গুনে বিয়ে করছ ?'

আমি মাথা নীচু করে বললাম, তাইতো ঠিক হয়েছে।

'দুটো এসট্যাবলিসমেণ্ট মেনটেন করতে অযথা তোমার কিছু

খরচা হচ্ছে। যাই হোক এই ক' মাস তাহলে এখানেই থেকে যাও। কিন্তু গেট এ টেলিফোন ইমিডিয়েটলি।'

একটু পরে বললেন, আমাদের নিউজ পেপার সোসাইটি বিল্ডিং-এ হয়ত একটা ঘর পাব কিছুকালের মধ্যেই। যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন তুমি একটা পার্ট-টাইম স্টেনো রেখে দাও।

একটা মাস ঘুরতে না ঘুরতেই সত্যি সত্যিই অফিসের পয়সায় আমি একটা গাড়ি কিনলাম। স্ট্যাণ্ডার্ড হেরল্ড! টু-ডোর! টেলিফোনও হল। একশ টাকা দিয়ে একজন পার্ট-টাইম মাদ্রাজী স্টেনোও রাখলাম।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক চরম সঙ্কটের দিনে আমার ভাগ্যাকাশে এমনভাবে সৌভাগ্যের সূর্যোদয়, কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। দিল্লীর যদি এতটা গুরুত্ব না বাড়ত, যদি কাগজে কাগজে প্রতিযোগিতা এত তীব্র না হত, তাহলে আমার ইতিহাসও অন্যরকম হত। কিন্তু বিধাতাপুরুষের নির্দেশ কি ব্যর্থ হতে পারে?

তিলে তিলে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে অজস্র দিনের পরিশ্রম দিয়ে, অসংখ্য দিনের অনাহার আর অনিদ্রার বিনিময়ে সেদিন যখন আমি কর্মজীবনে এতবড় স্বীকৃতি, এতবড় মর্যাদা, এতবড় সাফল্য অর্জন করলাম, তখন আমি নিজেই চমকে গিয়েছিলাম। কলকাতায় যে আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একবেলা এক আনার ছোলার ছাতু আর দু পয়সায় ভেলী গুড় খেয়ে কাটিয়েছি, যে আমি শুধু এক মুষ্টি অন্ন আর ভদ্রভাবে বাঁচার দাবী নিয়ে কলকাতার পথে পথে ভিখারীর মত অসংখ্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি, সেই আমি গাড়ি চড়ব? বিধাতাপুরুষের কি বিচিত্র খামখেয়ালি! আগে বিশ্বাস করতাম না কিন্তু অসংখ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর আজ বিশ্বাস করি এই দুনিয়ায় সবকিছু সম্ভব। ভগবানের আশীর্বাদ পেলে পঙ্গু সত্যি সত্যিই গিরি-পর্বত লঙ্ঘন করতে পারে।

দোলাবৌদি, আজ বুঝেছি ভগবান বড় বিচিত্র। কখনো নির্মম, কখনো করুণাময়। তিনি সবাইকে কিছুতেই সবকিছু দেন না। যে কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করবে, বৃহত্তর সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে, অগণিত মানুষের হৃদয়ে যার আসন, সে ব্যক্তিগত জীবনে কিছুতেই সুখী হতে পারে না। নিজের জীবনের চরম অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি এই সত্য উপলব্ধি করেছি।

আমার এই মেমসাহেবের কাহিনীর শেষ হতে আর বেশী বাকী নেই। তুমি আর একটু পরেই বুঝবে আমার এই সাফল্য সার্থকতার মধ্যেও বেদনা কোথায়। বুঝবে কেন আমি এত কিছু পেয়েও আজ লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলি। বুঝবে এত মানুষের সংস্পর্শে থেকেও কেন আমি নিঃসঙ্গ। আর একটু জানলেই বুঝবে কেন আমি ক্লান্ত।

যাই হোক ভারতবর্ষের বিচিত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আমার সম্পাদকের দয়ায় আমার এই অভাবনীয় সাফল্যের পর মেমসাহেবকে লিখলাম, তুমি কি কোনদিন তন্ত্রসাধনা করেছিলে? তুমি যদি জ্যোতিষী হতে তাহলে আমার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া তোমার পক্ষে আমার ভূত-ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব ছিল না। একমাত্র তন্ত্রসাধনা করলেই কিছু না জেনেও অপরের ভবিষ্যৎ বলা যায়। আমার সম্পর্কে তুমি যা যা বলেছিলে, যা যা আশা করেছিলে তার প্রায় সবই তো সত্য হয়ে গেল। তাই আজ আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তুমি হয়ত তন্ত্রসাধনা করেছ।

গজানন রোজ গাড়িটাকে দু-দুবার করে পরিষ্কার করে। ড্রাইভারের গাড়ি চালান ওর একটুও পছন্দ ছিল না। বলত, না, না, ছোটাসাব, ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে দেবেন না। ওরা যা তা করে গাড়ি চালায়। আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখতে হবে, কোনদিন ভাবিনি। তাই গাড়ি চালান আগে শিখিনি। তোমাকে নিয়ে এই গাড়িতে ঘুরে বেড়াবার আগে নিশ্চয়ই ড্রাইভিং শিখতাম

না কিন্তু গজানন রাজী হল না। বাধ্য হয়েই আমি গাড়ি চালাচ্ছি কিন্তু তবুও পিছনে বসে বসে গজানন আমাকে বলে, ছোটাসাব, আস্তে আস্তে গিয়ার দাও।

পরশু দিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রীন পার্কে তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় গজানন হতচ্ছাড়া কি বলল জান? বলল, বিবিজির কিসমৎ খুব ভাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন রে? ও বলল, বিবিজির কিসমৎ-এর জন্যই তো আপনার সবকিছু হচ্ছে। আমি ওকে দাবড় দিয়ে বললাম, বাজে বকিস না। হতচ্ছাড়া বলল, ছোটাসাব, বিবিজি না থাকলে তোমার কিছুই হত না। ওর কথাটা আমার ভালই লেগেছিল কিন্তু মুখে বললাম, তুই তোর বিবিজির কাছে যা, আমার কাছে থাকতে হবে না।

ভাল কথা, সেদিন তোমার কলেজে ট্রাঙ্ককল করলে তুমি ঐ রকম চমকে উঠলে কেন? তুমি যত অস্বস্তি বোধ করছিলে আমার তত মজা লাগছিল। ঠিক করেছি প্রতি সপ্তাহেই তোমাকে ট্রাঙ্ককল করব।

শেষে কি লিখেছিলাম জান দোলাবৌদি? লিখেছিলাম, ফাল্গুন মাস তো প্রায় এসে গেল। এবার বল বিয়েতে তোমার কি চাই? লজ্জা কর না। তোমার যা ইচ্ছা, আমাকে লিখো। আমি নিশ্চয়ই তোমার আশা পূর্ণ করব।

মেমসাহেব লিখল, তোমার প্রত্যেকটা চিঠির মত এই চিঠিটাও অনেকবার পড়লাম। পড়তে ভারী মজা লাগল। তোমার এডিটর যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের স্বপ্ন বাস্তব করে তুলবেন, আমি সত্যি ভাবতে পারিনি। ভগবানকে শত-কোটি প্রণাম না জানিয়ে পারছি না। তাঁরই ইচ্ছায় সবকিছু হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। ইঙ্গিত দেখে মনে হয় ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের সুখী করবেন।

তুমি আমার গাড়ি নিয়ে খুব মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ভাবতেও আমার হিংসা হচ্ছে। আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছা করছে, তুমি

গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি যখন গাড়ি চালাও তখন তোমাকে দেখতে নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগে। খুব স্মার্ট? খুব হ্যাণ্ডসাম? খুব সাবধানে গাড়ি চালাবে। তোমাদের দিল্লীতে বড় বেশী অ্যাকসিডেন্ট হয়। তুমি গাড়ি চালাচ্ছ জানার পর আর একটা নতুন চিন্তা বাড়ল। সব সময় মনে রেখো আজ আর তুমি একলা নও। মনে রেখো তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনও ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে গেছে। সুতরাং তোমার ক্ষতি হওয়া মানে আমারও সর্বনাশ! ভুলে যেও না যেন, কেমন?

আচ্ছা সেদিন তুমি হঠাৎ ট্রাঙ্ককল করলে কেন বলত? কলেজের অফিসে তখন লোকজনে ভর্তি ছিল। প্রথমে প্রিন্সিপ্যালই টেলিফোন ধরেন। তারপর যেই শুনলেন দিল্লী থেকে আমার ট্রাঙ্ককল এসেছে তখন তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না যে তুমিই ট্রাঙ্ককল করছ। কারণ তোমার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে, একথা কলেজের সবাই জানেন। প্রিন্সিপ্যালও শুনেছেন। তাছাড়া বেরুট থেকে কেনা জার্মান ফোলডিং ছাতাটা দু-একদিন ব্যবহার করায় উনি একথাও জানতে পেরেছেন যে তুমিই এনে দিয়েছ। তাই তো প্রিন্সিপ্যাল লাইনটা অফিসে দিয়েছিলেন এই ভেবে যে, আমি ওঁর সামনে তোমার সঙ্গে ঠিকমত কথা বলতে পারব না। কিন্তু কলেজের অফিস কি ফাঁকা থাকে? আমি তোমার কোন কথারই জবাব দিতে পারছিলাম না। তাছাড়া ওসব কি যা তা প্রশ্ন করছিলে? কলেজের অফিসে বসে বসে ঐসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়? তাছাড়া আমার এই সব একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় খবর জানার যদি এতই গরজ হয়, তাহলে একবার চলে এসো। আসবে দু-এক দিনের জন্য? এলে খুব খুশি হব।

বিয়ের সময় তুমি আমাকে কিছু উপহার দিতে চেয়েছ। শাড়ি-গহনার কথা বলছ? ওসব কিচ্ছু আমার চাই না। আজ আমার শুধু একটাই কামনা—সে কামনা তোমাকে পাওয়ার। মন-প্রাণ

দিয়ে তোমাকে আমি পেতে চাই। তাহলেই আমি খুশি। স্ত্রী হয়ে আর কি কামনা, আর কি প্রত্যাশা থাকতে পারে? সত্যি বলছি তুমি আমাকে কিছু উপহার দিও না। আমি শুধু তোমাকেই উপহার চাই। দেবে তো?

মেজদি থাকতে ওকে ম্যানেজ করে নানা রকম ধোঁকা দিয়ে তোমার কাছে গেছি ক'বার। এখন আর তা সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম তুমি যদি আসতে তবে ভাল হত। তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না। তুমি কি আমার সে কষ্ট উপলব্ধি করতে পার? যদি পার তবে দয়া করে অন্তত একটি দিনের জন্য দেখা দিয়ে যেও।

ভাল কথা, মেজদির বাচ্চা হবে। এইত ক'মাস আগে বিয়ে হলো! এরই মধ্যেই বাচ্চা? না জানি আমার অদৃষ্টে কি আছে?

মেমসাহেবের এই চিঠির উত্তর তো পোস্টকার্ডে দেওয়া যায় না। কর্মব্যস্ততার জন্য তাই কদিন চিঠি দিতে পারিনি। তাছাড়া কদিনের জন্য সৌরাষ্ট্র গিয়েছিলাম। এমনি করে উত্তর দিতে বেশ দেরী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মেমসাহেবের আবার একটা চিঠি পেলাম। জানলাম, ইতিমধ্যে একদিন ভোর পাঁচটার সময় পুলিস এসে খোকনদের ফ্ল্যাট সার্চ করে গেছে। খোকনকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বিকেলবেলা ছেড়ে দিয়েছিল।

কলকাতার কাগজগুলো পড়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম বাংলা দেশের রাজনৈতিক আকাশের ঈশান কোণে ঘন কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। দামামা আবার বেজে উঠবে। সভা-সমিতির পালা এবার শেষ হবে, শুরু হবে মিছিল, বিক্ষোভ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। তারপর লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, গুলী। আবার বিক্ষোভ, আবার মিছিল হবে। আবার চলবে লাঠি, গুলী। কিছু মানুষ হারাবে তাদের প্রিয়জনকে। তারা কাঁদবে, সারা জীবন ধরে কাঁদবে।

খোকন যে বেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, সেকথা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। এ নেশার ঘোর ওর এখন কাটবে না। কিছু খেসারৎ না দিলে এ নেশা কাটে না। অনেকের কোন কালেই কাটে না। খোকনেরও কাটবে কিনা ঠিক নেই।

মেমসাহেব অবশ্য ভাবছিল আমি কলকাতা গিয়ে খোকনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা কিছু করি। কিন্তু কি করব? কি বোঝাব খোকনকে? বোঝাতে চাইলেই কি সে বুঝবে? আমারও মেমসাহেবকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল। ভেবেছিলাম দু-তিন দিনের জন্য ঘুরে আসব। কিন্তু মেমসাহেবের পরের চিঠিতে খোকনের খবর পাবার পর ঠিক করলাম, না যাব না। মেমসাহেবকে লিখে দিলাম, সত্যি ভাষণ ব্যস্ত। এখন কোনমতেই যেতে পারছি না। যদি এর মধ্যে সময় পাই তাহলে নিশ্চয়ই তোমাকে দেখে আসব। শেষে লিখলাম রাজনীতি অনেকেই করে, খোকনও করছে। তার জন্য অত চিন্তা বা ঘাবড়াবার কি কারণ আছে? তাছাড়া খোকন তো আর শিশু নয়। সুতরাং তুমি অত ভাববে না।

খোকন সম্পর্কে আমার এই ধরনের মন্তব্য মেমসাহেব ঠিক পছন্দ করত না, তা আমি জানতাম। কিন্তু কি করব? আমি স্থির জানতাম খোকন আমার কথা শুনবে না। মেমসাহেবের কথাও তার পক্ষে শোনা তখন সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমি আর কি লিখব?

আমার চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেমসাহেব উত্তর দিল, যে কোন কারণেই হোক তুমি খোকন সম্পর্কে বেশ উদাসীন। হয়ত ওকে ঠিক পছন্দ করো না। জানি না কি ব্যাপার। তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করব না। তবে জেনে রাখ খোকন সম্পর্কে আমার ও আমাদের পরিবারের ভীষণ দুর্বলতা।

আমি সত্যি কোন তর্ক করিনি। তর্ক করব কেন? মানুষের

স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে কি তর্ক করা উচিত? কখনই নয়। তাছাড়া যুক্তি-তর্ক ন্যায়-অন্যায় বাচ-বিচার করে কি মানুষ ভালবাসতে পারে? না। তা আমি জানি। সুতরাং এই বিষয়ে মেমসাহেবকে কিছু না লিখে এবার খোকনকেই একটা চিঠি দিলাম। লিখলাম, তোমার মত ভাগ্যবান ছেলে এই পৃথিবীতে খুব কম পাওয়া যাবে। তার কারণ এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর, বড় কৃপণ। আপনজনের কাছ থেকেই ভালবাসা পাওয়া এই পৃথিবীতে একটা দুর্লভ ব্যাপার। সুতরাং অন্যের কাছ থেকে স্নেহভালবাসা সত্যি সৌভাগ্যের কথা। তুমি সেই অনন্য ভাগ্যশালীদের অন্যতম। অনেক সুখ, অনেক আনন্দ ত্যাগ করে, অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ সহ্য করে, অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করে তোমার বড়মা ও দিদিরা তোমাকে মানুষ করেছেন। তোমাকে নিয়ে ওঁদের অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। তোমার গায় একটু আঁচড় লাগলে ওদের পাঁজরার একটা হাড় ভেঙে যায়। হয়ত এতটা স্নেহ-ভালবাসার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু তুমি তো জান ভাই এই স্নেহ-ভালবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। তোমার বড়মা ও দিদিদেরও তাই অন্ধ করে দিয়েছে। তুমি ওদের এই অমূল্য স্নেহ-ভালবাসার অমর্যাদা কোনদিন করবে না, তা আমি জানি। কিন্তু তোমার জন্য আজকাল ওঁরা বড় চিন্তিত, বড় উদ্বিগ্ন। তুমি কি এর থেকে ওঁদের মুক্তি দিতে পার না? আমার মনে হয় তুমি ইচ্ছা করলেই পার। যাঁরা তোমার জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রাত্রি জেগে কাটিয়েছেন, যাঁরা তোমার কল্যাণে ব্রত-উপবাস করেছেন, কালীঘাটে পূজা দিয়েছেন, তারকেশ্বরে ছুটে গিয়েছেন, তুমি কি তাঁদের উৎকণ্ঠা দূর করতে পার না? পার না ওঁদের চোখের জল বন্ধ করতে? একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ।

আমি একজন সাংবাদিক হয়ে তোমাকে রাজনীতি করতে মানা করব না। তবে আগে লেখাপড়াটা শেষ করলে ভাল হয় না?

লেখাপড়া শিখে সমাজের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দশজনের একজন হয়ে রাজনীতি করা ভাল না? রাজনীতি নিশ্চয়ই করবে, একশ'বার করবে। স্বাধীন দেশের নাগরিকরা নিশ্চয়ই রাজনীতি করবে। কিন্তু তার আগে নিজে প্রস্তুত হও, তৈরী হও, উপযুক্ত হও।

তোমার ফাইন্যাল পরীক্ষা এসে গেছে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। একটু মন দিয়ে লেখাপড়া করলেই চমৎকার রেজাল্ট করবে। তুমি তো জান তোমার বড়মার শরীর ভাল না, ছোড়দিও বড় একলা। ওঁদের একটু দেখো। আর ভুলে যেও না তোমার বাবার কথা— যিনি শুধু তোমারই মুখ চেয়ে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করছেন। একটু তাড়াতাড়ি মানুষ হয়ে ঐ বৃদ্ধ মানুষটাকে একটু শান্তি দেবার চেষ্টা করো।

শেষে জানালাম, এ চিঠির উত্তর না দিলেও চলবে। তোমার বক্তব্য তোমার ছোড়দিকে জানিও। সেই আমাকে সবকিছু জানাবে। আর হ্যাঁ, তুমি যদি চাও তাহলে দিল্লী আসতে পার। যেদিন ইচ্ছা সেদিনই এসো। এবং এখানে এলে তোমার পড়াশুনা ভালই হবে। তাছাড়া আমিও তোমার সাহচর্য পেতাম।

এই চিঠি লেখার পরই আমি আবার বাইরে গেলাম। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দল প্রায় চরমে উঠেছিল। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন নিয়ে দুই দলে প্রায় কুরুক্ষেত্রের লড়াই শুরু করেছিলেন। এডিটরের নির্দেশে সেই কুরুক্ষেত্রের লড়াই কভার করতে আমি লক্ষ্ণৌ চলে গেলাম। যাবার আগে মেমসাহেবকে জানাতে পারিনি। লক্ষ্ণৌ পৌঁছেও প্রথম দু'দিন সময় পাইনি। তার পরদিন ওকে জানালাম যে, আমি দিল্লীতে নেই, লক্ষ্ণৌ এসেছি।

এক সপ্তাহ লক্ষ্ণৌ থাকায় পর লক্ষ্ণৌবাসী এক সাংবাদিক বন্ধু ও একজন এম-পি'র পাল্লায় পড়ে দিল্লী আসার পরিবর্তে চলে গেলাম

নৈনীতাল। ঠিক ছিল দু'দিন থাকব। কিন্তু ওদের পাল্লায় দিল্লী ফিরলাম এক সপ্তাহ পরে।

দিল্লী ফিরে অনেকগুলো চিঠি পেলাম। মেজদির চিঠিতে জানলাম ন্যাভাল অফিসার কোচিনে বদলী হয়েছেন। ওখানে এখন কোয়ার্টার পাওয়া যাবে না। তাই মেজদি কলকাতা যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে কোয়ার্টার পেলেও কোচিনযাবেন না, একেবারে আমাদের বিয়ে দেখে তবে ফিরবেন। মনে মনে ভাবলাম চমৎকার! আমি মেজদিকে লিখলাম, ছি, ছি, অত তাড়াতাড়ি কেউ কো-চিন যায়? আরো এই আকশাই চীনের বাজারে? একেবারে খোকনকে পেরাম্বুলেটারে চড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ভুবনেশ্বরে চা খেয়ে, কোনারকে কফি খেয়ে, ওয়ালটেয়র'এ কাজু খেয়ে, মাদ্রাজে দোসা খেয়ে, কন্যাকুমারিকায় ভারত মহাসাগরের জলে সাঁতার কেটে, ত্রিবান্দ্রমে নারকেল খেয়ে কো-চিন যাবেন! কেমন? দরকার হয় আমিই পেরাম্বুলেটার দেব। কারণ পরে ওটা তো আমাদেরও কাজে লাগবে, তাই না?

খোকনকে চিঠি লেখার জন্য মেমসাহেব খুব খুশি হয়েছিল। এ-কথাও জানিয়েছিল যে খোকনের একটু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

এবার ঠিক করলাম দু'তিন দিনের জন্য কলকাতা যাব। এডিটরকে চিঠি লিখে এক সপ্তাহের ছুটি নিলাম। কলকাতা যাবার কথা মেমসাহেবকে কিছু লিখলাম না। মেজদিকে লিখলাম, কতকাল আপনাকে দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন কত যুগে আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি আপনাকে না দেখে আর থাকতে পারছি না। কাজকর্মে মন বসছে না। রিপোর্ট লিখতে গিয়ে বার বার ভুল করছি। মুখে কিছু ভাল লাগছে না। এমন কি মধুবালা-সোফিয়া লরেনের ফিল্ম দেখতেও ইচ্ছা করছে না। আমাকে মাপ করবেন, তাই আমি আগামী সোমবার সকালে দিল্লী মেলে কলকাতা যাচ্ছি আপনাকে দেখার জন্য।

উনিশ

সেবারের কলকাতা যাওয়া আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। না, না, কোনদিন ভুলব না। সেবারের কলকাতার স্মৃতি আমার জীবনের সব চাইতে মূল্যবান স্মৃতি। আজ আমার পার্থিব সম্পদ অনেক ভবিষ্যতে হয়ত আরো হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে আজ আমার পরিচয়। কত ভি-আই-পি-র সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি দেশ-দেশান্তর। তাদের কত মিষ্টি, কত সুন্দর, কত চমকপ্রদ স্মৃতি আমার মনের সেফ ডিপোজিট ভলটে জমা আছে। কিন্তু সেবারের কলকাতা যাওয়ার স্মৃতির সঙ্গে অন্য কোন স্মৃতির তুলনাই হয় না। একদিন হয়ত আমার সবকিছু হারিয়ে যাবে, হয়ত আমি অতীত দিনের মত একমুষ্টি অন্নের জন্য, একটা লেখা ছাপিয়ে দশটা টাকা পাবার জন্য আবার কলকাতার রাজপথে ঘুরে বেড়াব। হারাবে না শুধু আমার স্মৃতি, মেমসাহেবের স্মৃতি, সেবারের কলকাতার স্মৃতি।

হাওড়া স্টেশনে মেজদি এসেছিলেন। মেমসাহেবকে না দেখে আমি একটু অবাক হলাম। মেজদিকে কিছু বললাম না। শুধু এদিকে-ওদিকে চাইছিলাম। ভাবছিলাম বোধহয় লুকিয়ে আছে। একটু মুচকি হেসে মেজদি বললেন, এদিক-ওদিক দেখে লাভ নেই। ও আসে নি।

আমি একটু জোরে হেসে বললাম, আরে না, না। ওকে কে খুঁজছে? আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। তাই দেখছি এসেছে কিনা।

মেজদি একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললো, ও আই সী।

প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে যাবার পথে মেজদি বললেন, আজ রাত্তিরে আপনি আমাদের ওখানে খাবেন।

আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে বললাম, সে কি?

'মার হুকুম।'

'রিয়েলি?'

'তবে কি আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি?'

মেমসাহেব সেদিন সত্যি স্টেশনে আসে নি; চীফ্ অফ প্রোটোকল হয়ে মেজদি এসেছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। মেমসাহেবকে না দেখে মনে মনে একটু হতাশাবোধ করলেও আমার সামাজিক মর্যাদায় বেশ গর্ববোধ করেছিলাম।

রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। মেমসাহেবের দেওয়া ধুতি পাঞ্জাবী পরে সত্যি প্রায় জামাই সেজে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম। মেমসাহেব আমারই অপেক্ষায় বসেছিল ড্রইংরুমে। কিন্তু যেই আমি 'বাজার' বাজালাম, ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললো, মেজদি! দেখত, কে এসেছে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওর কথা শুনতে পেলাম। এমন একটা ভাব দেখাল যেন ওর কোন গরজ নেই। আসল কথা লজ্জা করছিল।

মেজদি দরজা খুলেই চিৎকার করলেন, মা! তোমার ছোট জামাই এসেছেন।

ভিতর থেকে মেমসাহেবের মার গলা শুনতে পেলাম, আঃ চিৎকার করিস না।

মেজদি ঘর ছেড়ে ভিতরে যাবার সময় হুকুম করে গেলেন, চুপটি করে বসুন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার প্রয়োজন নেই, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মেজদির বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেমসাহেব এলো। একটু এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমি ওর হাত ধরে পাশ থেকে সামনে নিয়ে এলাম। তারপর দু'হাত দিয়ে

ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে আলতো করে মাথাটা রাখলাম।

ও আমায় মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, আঃ, ছেড়ে দাও। কেউ এসে পড়বে।

আমি ওর কথার কোন জবাব দিলাম না। অমনি করেই ওকে জড়িয়ে ধরে রইলাম।

ও আস্তে আস্তে আমার হাতদু'টো ছাড়িয়ে দিতে দিতে বললো, লক্ষ্মীটি ছেড়ে দাও, কেউ দেখে ফেলবে।

আমি এবার ওর হাতদু'টো ধরে মুখের দিকে চাইলাম। বললাম দেখুক না! কি হয়েছে?

ও একটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমার মুখে, কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, কেমন আছ?

'ভাল।'

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেমন আছ?

'ভাল না।'

'কেন?'

'কেন আবার? আমার আর একলা একলা থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।'

আমি ওর ফোলা ফোলা গালদু'টো একটু টিপে ধরে বললাম, এইত এসে গেছে। আর তো দু'মাসও বাকি নেই।

সেদিন রাত্রে মেমসাহেবের মা সত্যি জামাই-আদর করে খাওয়ালেন। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে অত আদর-যত্ন পাওয়া কোনদিন অভ্যাস নেই। অত ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাসও কোনদিন ছিল না। আমি কোনটা খেলাম, কোনটা খেলাম না।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে ড্রইংরুমে বসে বসে মেজদি আর মেমসাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। শেষে মেমসাহেবের

মাকে প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় উনি আমার হাতে একটা পাথর সেটকরা আংটি পরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, একি করছেন?

'বিয়ের আগে তো আর তুমি আসছ না। আশীর্বাদ তো বিয়ের আসরেই হবে। তাই এটা থাক।'

আমি আবার আপত্তি করলাম। উনি বললেন, মায়ের আশীর্বাদ না করতে নেই।

আর আপত্তি করলাম না।

পরের দিন মেমসাহেব আর আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর আরতি দেখে নৌকায় চড়ে গিয়েছিলাম বেলুড়। পৌষ মাসের সন্ধ্যায় মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল গঙ্গার 'পর দিয়ে। মেমসাহেব আমার পাশ-ঘেঁষে বসে আমার কাঁধে মাথা রাখল।

সেদিন সন্ধ্যায় বিশেষ কথাবার্তা হয় নি আমাদের। আনন্দ-তৃপ্তিতে দু'জনেরই মনটা পূর্ণ হয়েছিল। বেশী কথাবার্তা বলতে কারুরই মন চায় নি।

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি আর এর মধ্যে কলকাতা আসবে না?

'না।'

'একেবারে সেই বিয়ের সময়?'

'হ্যাঁ।'

একটু পরে আবার বলেছিল, 'বিয়ের পর তুমি কিন্তু আমাকে তোমার মনের মতন করে গড়ে নিও। আমি যেন তোমার সব প্রয়োজন মেটাতে পারি।'

'আমার সব প্রয়োজনের কথাই তো তুমি জান। তাছাড়া তুমিই তো আমাকে গড়ে তুলেছ। সুতরাং আমি আর তোমাকে কি গড়ে তুলব?'

'আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার নিজের মধ্যে গুণ ছিল

বলেই তুমি জীবনে দাঁড়াতে পেরেছ। গুণ না থাকলে কি কেউ কাউকে কিছু করতে পারে ?'

আমি বললাম, পারে বৈকি মেমসাহেব। শুধু ইট-কাঠ-সিমেণ্ট হলেই তো একটা সুন্দর বাড়ি হয় না। আর্কিটেক্‌ট চাই, ইঞ্জিনীয়ার চাই, মিস্ত্রী চাই। সোনার তালের দাম থাকতে পারে কিন্তু তার সৌন্দর্য নেই। স্বর্ণকারের হাতে সেই সোনা পড়লে কত সুন্দর সুন্দর গহনা হয়।

ওর মুখের পর মুখ রেখে বললাম, মেমসাহেব, তুমি আমার সেই আর্কিটেক্‌ট, ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী।

ও আমার এসব কথার জবাব না দিয়ে বললো, তুমি আমাকে বড্ড বেশী ভালবাস। তাইতো তুমি আমাকে অকৃপণভাবে মর্যাদা দিতে চাও। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, তাই না ?

'তোমার মত আমি তো ইউনিভার্সিটিতে পড়িনি। মনুষ্য-চরিত্রের অতশত বিশ্লেষণ করতে আমি শিখিনি।'

মেমসাহেব এবার যেন একটু অভিমান করে বললো, ওসব আজেবাজে কথা বলবে না তো! হাজার হোক তুমি আমার স্বামী। আর তাছাড়া এম-এ পড়লেই কি সবাই পণ্ডিত হয়ে যায় ?

ও নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল, মোটেই না। তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার কাছে আমি কি দাঁড়াতে পারি ?

দোলাবৌদি, মেমসাহেব শুধু আমাকে ভালবাসত না, শ্রদ্ধা করত, ভক্তি করত। সোনায় যেমন একটু পান মিশিয়ে না নিলে গহনা মজবুত হয় না, সেইরকম ভালবাসার সঙ্গে একটু শ্রদ্ধা, ভক্তি না মিশলে সে ভালবাসাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মেমসাহেব আজ অনেক—অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু যত দূরেই যাক, যেখানেই থাকুক, আমি নিশ্চিত জানি সে আজও আমাকে ভুলতে পারে নি। আমি জানি, সে আজও আমাকে ভালবাসে। প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতি আজও তার মনে আছে।

কলকাতায় আরো ক'দিন ছিলাম। এবার সবাইকে বলে দিলাম, আসছে ফাল্গুনে মেমসাহেবের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। কেউ অবাক হলো, কেউ কেউ আবার বললো, আমরা আগেই জানতাম।

আমি কারুর কোন মন্তব্য গ্রাহ্য করলাম না। গ্রাহ্য করব কেন? তোমরা কি কেউ আমাকে ভালবেসেছ? কেউ কি আমার বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছ? কেউ তো একটা পয়সা দিয়ে বা এক কাপ চা খাইয়ে উপকার কর নি। সুতরাং তোমাদের আমি থোড়াই কেয়ার করি। যখন যেখানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই বলেছি, আমার বিয়ে। মেমসাহেবের সঙ্গে। কবে? এইত এই ফাল্গুনেই। বহুজনকে নেমন্তন্নও করেছিলাম, আসতে হবে কিন্তু। বন্ধুবান্ধবদের বললাম, এবার যদি তোরা দিল্লী না আসিস তবে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।

বিয়ের আগে আর কলকাতা আসা হবে না ভেবে বিয়ের কিছু কাজও করলাম কলকাতায়। দিল্লীতে ভাল পাঞ্জাবী তৈরী হয় না; ভবানীপুরের একটা দোকান থেকে তিন গজ ভাল সিল্কের কাপড় কিনে শ্যামবাজারে মণ্টুবাবুর দোকানেপাঞ্জাবী তৈরী করতে দিলাম। দিল্লীতে ভাল বাংলা কার্ড পাওয়া যায় না; সুতরাং কয়েকশ' কার্ড কিনলাম। আর? আর কিনেছিলাম সিল্ক হাউস দোকান থেকে মেমসাহেবের জন্য দুটো বেনারসী শাড়ি। দিল্লীতে বেনারসী পাওয়া যায় কিন্তু বড্ড বেশী দাম। তাছাড়া ঠিক রুচিসম্মত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। শাড়ি দুটো কেনার সময় মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম পছন্দ করবার জন্য। স্কাই কলারের বেনারসীটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, ওরও খুব ভাল লেগেছিল কিন্তু বার বার বলেছিল, কেন এত দামী শাড়ি কিনছ?

আমি বলেছিলাম, এর চাইতে কম দামের শাড়িতে তোমাকে মানাবে না।

ও ভ্রূ কুঁচকে একটু হাসতে হাসতে বলেছিল, তাই নাকি?

'তবে কি ?'

শাড়ি কিনে দোকান থেকে বেরুবার সময় মেমসাহেব বললো, তুমি আমার দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বিয়ে করতে আসবে।

'সেকি ? আমি তো কাপড় কিনে পাঞ্জাবী তৈরী করতে দিয়ে দিয়েছি।'

'তা হোক। তুমি আমার দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবী পরে বিয়ে করবে।'

সেন্ট্রাল এভিন্যুর খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে মেমসাহেব আমার পাঞ্জাবীর কাপড় কিনে বললো, চল এবার ধুতিটা কিনতে যাই।

ধুতি কিনতে গিয়ে আমি ওর কানে কানে ফিসফিস করে বললাম, প্লেন পাড় দেবে, না, জরি পাড় দেবে ?

আগে কতবার জরি পাড় ধুতি চেয়েছি পাই নি। এবার পেলাম। একটা নয়, একজোড়া।

আমি জানতে চাইলাম, একজোড়া ধুতি পরে বিয়ে করতে যাব ?

'অসভ্যতা করো না।' একটু থেমে বললো, তোমার তো মোটে দুটো ধুতি। তাই একজোড়াই থাক।

ধুতি কিনে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তো আমার বিয়ের কাপড় দিলে, ফুলশয্যার জন্য তো কিছু দিলে না ?

ও আমার কথার জবাব না দিয়ে বললো, সেদিন যে তুমি কি করবে, তা ভাবতেই আমার গায় জ্বর আসছে।

'তাই নাকি ?' একটু থেমে আবার বললাম, বেশ, তাহলে শুধু বিয়েই হোক, ফুলশয্যার আর দরকার নেই।

ও একটু বাঁকা চোখে হাসি হাসি মুখে বললো, ভূতের মুখে রাম নাম ?

কলকাতায় এমনি করে ক'টা দিন বেশ কেটে গেল। আমার

কলকাতা বাসের মেয়াদ শেষ হলো। দেহটাকে আবার চাপিয়ে দিলাম দিল্লী মেলের কামরায়। মন ? সে পড়ে রইল কলকাতায়। মেমসাহেবের কাছে।

দিল্লীতে ফিরে এসে আবার বেশ কাজকর্মের চাপ পড়ল। দশ-বারো দিন প্রায় নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম না। সমাগত কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য কংগ্রেস পার্টিতে দলাদলি চরম পর্যায়ে পৌঁছল। কংগ্রেসের ঘরোয়া বিবাদ যত তীব্র থেকে তীব্রতর হলো, আমাদের কাজের চাপও তত বেশী বাড়ল।

এদিকে কলকাতার কাগজ পড়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম অবস্থা সুবিধার নয়। গণ্ডগোল শুরু হলো বলে।

মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশন কভার করতে গিয়েই খবর পেলাম, কলকাতায় গুলী চলেছে। দু'জন মারা গেছে। বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে এই ধরনের রাজনৈতিক নাটক প্রায়ই অভিনীত হয়।

দিল্লী ফিরে এসে খবর পেলাম ডুয়ার্সে, কৃষ্ণনগরে, দুর্গাপুরে, আর বসিরহাটেও গুলী চলেছে। কিছু আহত কিছু নিহত হয়েছে। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। না জানি খোকন আবার কি করে। গতবার কলকাতায় গিয়ে তো কত বুঝিয়ে এলাম কিন্তু সন্দেহ হলো ওসব কিছুই হয়ত ওর কানে ঢোকে নি। উপদেশ আর পরামর্শ দিয়ে যদি কাজ হতো তাহলে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-নেতাজীকে পাওয়া যেত।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের শান্ত হিমালয় সীমান্ত আরো অশান্ত হয়ে উঠেছিল। সীমান্ত নিয়ে অনেক আজগুবী কাহিনী ছাপা হচ্ছিল নানা পত্র-পত্রিকায়। স্বাভাবিক ভাবেই সরকার উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এসব খবরে। তাছাড়া পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশন এসে গিয়েছিল। এই সময় এই ধরনের খবর নিয়মিত ছাপা হলে পার্লামেন্টে অযথা ঝড় বয়ে যাবে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর

সরকার একদল জার্নালিস্টকে লাডাকে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর্মি হেড কোয়ার্টার্সের ঠিক মত ছিল না; কারণ, এই তীব্র ঠাণ্ডায় জার্নালিস্টদের লাডাকে নিতে হলে অনেক ঝঞ্ঝাট। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরাও রাজী হলেন। দশজন দেশী-বিদেশী সাংবাদিক দলে আমিও স্থান পেলাম।

এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম। মেমসাহেবকে জানালাম, এক সপ্তাহের জন্য লাডাক যাচ্ছি। আমরা রওনা হবো ২রা ফেব্রুয়ারী। এখান থেকে জম্মু যাব। সেখান থেকে উধমপুর, কোর কমাণ্ডারের হেড কোয়ার্টার্স। একদিন উধমপুর থেকে যাব লে'তে। সেখানে একদিন থেকে যাব অপারেশন্যাল এরিয়া ভিজিট করতে। ফিরে এসে আবার একদিন লে'তে থেকে ফিরব দিল্লী।

১৪ই ফেব্রুয়ারী বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী বাজেট পেশ করা হবে। আমি ৪ঠা মার্চ কলকাতা রওনা হবো। বাবা বেনারস থেকে ২রা কি ৩রা কলকাতা পৌঁছবেন। ৬ই মার্চ বিয়ে হবার পর ৮ই মার্চ ডি-ল্যুক্স এক্সপ্রেসে তোমাকে নিয়ে আবার দিল্লী ফিরব। ১৪ই মার্চ আমার ছুটি শেষ হবে। সুতরাং যদি কোথাও বাইরে বেড়াতে যেতে চাও, তাহলে ঐ ক'দিনের মধ্যেই ঘুরে আসতে হবে। পার্লামেণ্ট শেষ হলে তোমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই কোথাও বেড়াতে যাব। কেমন? মত আছে তো?

মেমসাহেব লিখল, তোমার চিঠিতে জানলাম, তুমি লাডাক যাচ্ছ। তুমি যখন সাংবাদিক, তখন তোমাকে তো সর্বত্রই যেতে হবে। অনেক সময় বিপদের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে। আমার মুখ চেয়ে নিশ্চয়ই তুমি সব সময় সাবধানে থাকবে। তবে আমি জানি, তোমাকে কোন বিপদ স্পর্শ করতে পারবে না।

তুমি লিখেছ লাডাকে এখন মাইনাস ১০—১২ ডিগ্রী টেম্পারেচার। কলকাতার বাঙালী হয়ে আমাদের কল্পনাতীত। আমার তো ভাবতেও ভয় লাগছে। উলের আণ্ডারউয়্যার, গ্লোভস্,

ক্যাপ ইত্যাদি নিতে ভুলো না। তুমি বার্লিন থেকে যে ওভারকোটটা এনেছ, সেটা অতি অবশ্য নেবে। আমি জানি তুমি ভাল থাকবে কিন্তু তবুও চিন্তা তো হবেই। তাই যদি পার লে'তে পৌঁছবার পর একটা টেলিগ্রাম করো।

শেষে লিখেছিল, ৮ই মার্চ তোমার সঙ্গে দিল্লী যাবার পর খুব বেশী বেড়াবার সময় থাকবে কি? তুমি তো প্রায় সবকিছুই গুছিয়ে রেখেছ কিন্তু তবুও নতুন সংসার করার কিছু ঝামেলা তো থাকবেই। তাছাড়া তোমার ক'দিন বিশ্রাম চাই ত! এইত কংগ্রেস কভার করে ফিরলে। এখন যাচ্ছ লাডাক। ফিরে এসেই পার্লামেণ্ট। তারপর কলকাতায় আসা-যাওয়া বিয়ে-থার জন্য তোমার কি কম পরিশ্রম হবে? সেজন্য দিল্লী গিয়ে আবার কোথাও যাবার আমার ইচ্ছে নেই।

তোমাকে আর এর মধ্যে দেখতে পাব না। সেই ২০শে ফাল্গুন রাত্রে একেবারে শুভমুহূর্তে তোমাকে দেখব! ভাবতেও তারী মজা লাগছে। তোমার ভাবতে ভাল লাগছে না?

মেমসাহেবের চিঠি পাবার পরদিনই ভোরবেলায় পালামের এয়ার ফোর্স স্টেশন থেকে এয়ার ফোর্সের এক স্পেশ্যাল প্লেনে আমরা চলে গেলাম জম্মু। সেখান থেকে মোটরে উধমপুর। এক রাত্রি উধমপুরে কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলায় জম্মু এয়ারপোর্টে এসে শুনলাম লে'তে ভীষণ খারাপ আবহাওয়া। প্রুভিং ফ্লাইটে একটা প্লেন গিয়েছে। যদি ঐ প্লেনটা ল্যাণ্ড করতে পারে, তাহলে সেই মেসেজ পাবার পর আমাদের প্লেন ছাড়বে। বেলা আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে আবহাওয়ার উন্নতি না হলে আজ আর যাওয়া হবে না।

সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোন মেসেজ এলো না। প্রুভিং ফ্লাইটে যে-প্লেনটি গিয়েছিল, সেটি ফেরত এলো নটা নাগাদ। কোর হেড কোয়ার্টার্স থেকে আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে মেসেজ চলে গেল, ব্যাড ওয়েদার এ্যারাউণ্ড লে স্টপ প্রুভিং ফ্লাইট ফেল্ড স্টপ প্রেস পার্টি

হেল্ড-আপ। আমিও আমার হেড কোয়ার্টার্সে একটা টেলিগ্রাম করলাম, লে আণ্ডার ব্যাড ওয়েদার, স্টপ নো ফ্লাইট টু-ডে স্টপ।

উধমপুরে একটা অতিরিক্ত রাত্রিবাস ভালই কেটেছিল। দুপুরে একটা চমৎকার লাঞ্চ ছাড়াও সন্ধ্যায় আমাদের সম্মানে একটা কক্‌টেল দিলেন কোর কমাণ্ডার নিজে। পরের দিন ভোরে রওনা হবার আগে আমরা ওয়েদার রিপোর্ট চেক-আপ করে জানলাম, লে'র আবহাওয়া ভালই। সুতরাং ফার্স্ট সর্টির ফার্স্ট এয়ারক্রাফটেই আমরা রওনা হয়ে জম্মু থেকে লে এলাম।

লে'তে পৌঁছবার পর একটু বিশ্রাম করে শহরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মেমসাহেবকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করলাম, রিচড সেফলি।

লাডাকে আসার পর কলকাতার আর কোন খবর পেলাম না। সময়ও হতো না, সুযোগও হতো না। কলকাতার স্টেশন অত্যন্ত উইক। তাছাড়া এত ঠাণ্ডায় ব্যাটারীও ঠিক কাজ করে না। সুতরাং রেডিওতেও কলকাতার কোন খবর পেলাম না।

লে'তে একদিন কাটাবার পর আমরা ফরোয়ার্ড এরিয়া দেখতে রওনা হলাম। কোথাও জীপ, কোথাও হেলিকপ্টার। সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম চোদ্দ-পনের হাজার ফুট উপরে হিমালয়ের মরু অঞ্চলে। বিকেল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাটাতাম আমাদের বা অফিসারদের কোন-না-কোন মঙ্গোলিয়ান টেণ্টে বোখারীর পাশে।

ফরোয়ার্ড এরিয়া ঘুরে লে'তে ফেরার পর জানলাম, গত পাঁচদিন ধরে কোন প্লেন ল্যাণ্ড করে নি। ব্যাড ওয়েদার। আবহাওয়া কবে ভাল হবে, সে-কথা কেউ জানেন না। পরের দিনও ভাল হতে পারে, আবার আট দশদিনের মধ্যেও না হতে পারে। শীতকালে লাডাকের আবহাওয়া এমনিই হয়। চিন্তিত না হয়ে পারলাম না, কিন্তু চিন্তা করেও কোন উপায় ছিল না।

শহরে গিয়ে পোস্টাফিস থেকে মেমসাহেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম, রিটার্ণড্ ফ্রম ফরোয়ার্ড এরিয়াস স্টপ ব্যাড ওয়েদার প্রোগ্রাম আনসার্টেন।

শেষপর্যন্ত এক সপ্তাহের পরিবর্তে, বারো দিন পর আবার পালামের মাটি স্পর্শ করলাম।

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এলাম ওয়েস্টার্ন কোর্ট। রিসেপশন কাউন্টারে আমার ঘরের চাবি চাইতেই বললো, ইওর সিস্টার-ইন-ল'…ইজ দেয়ার।

সিস্টার-ইন-ল ?

অবাক হয়ে গেলাম। দিদি ? মেজদি ? কিন্তু ওঁরা এখন আসবেন কেন ? বেড়াতে ? একটা খবর তো পাওয়া উচিত ছিল। জরুরী কোন কাজে ? লিফট্-এ উঠতে উঠতে অনেক কিছু ভাবছিলাম। আবার ভাবলাম বিয়ে নিয়ে কোন গণ্ডগোল হলো নাকি ? না, না, তা কেমন করে সম্ভব।

ঘরে ঢুকতে গিয়েই মেজদিকে দেখে থমকে গেলাম। হঠাৎ মেজদিকে অমন বিশ্রীভাবে দেখে মনে হলো বোধহয় মেজদিরই চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে। মনটা ব্যথায় ভরে গেল। এইত ক'মাস আগে বিয়ে হলো। এরই মধ্যে…

মেজদি আমাকে দেখেই হাউ-হাউ করে কেঁদে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ওর অপ্রত্যাশিত আগমন এবং ততোধিক অপ্রত্যাশিত কান্নায় আমি এমন ঘাবড়ে গেলাম যে আমার গলা দিয়ে একটি শব্দও বেরুতে চাইল না। মেজদি আমাকে ঐ ভাবে জড়িয়ে ধরে কতক্ষণ কেঁদেছিলেন তা আমার মনে নেই। তবে মনে আছে বেশ কিছুক্ষণ বাদে মেজদি হঠাৎ বলে উঠলেন, তুমি কিভাবে একলা একলা বাঁচবে ভাই ?

একলা ? একলা ? আমি ?

আমি এবার মেজদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেই ওর দুটো হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, মেমসাহেব কেমন আছে ?

মেমসাহেবের নাম শুনে মেজদি আর থাকতে পারলেন না। আবার আমাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। বেশ কড়া করে দাবড় দিয়ে বললাম, কি হয়েছে মেমসাহেবের ?

অস্পষ্ট স্বরে মেজদি জবাব দিলেন, সে আর নেই ভাই।

মুহূর্তের মধ্যে মনে হলো সারা পৃথিবীটা অন্ধকারে ভরে গেল। কার যেন অকল্যাণ হাতের ছোঁয়ায় পৃথিবী থেকে সবার প্রাণশক্তি হারিয়ে গেল। মনে হলো পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে আর আমি পাতালের অতল গহ্বরে ডুবে যাচ্ছি।

দোলাবৌদি, আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। পাঁড় মাতালের মত টলে পড়ে গেলাম সোফার 'পর। অত বড় একটা মহা সর্বনাশের খবর শোনার পর আমার কিচ্ছু হলো না। মহা আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি রাত হয়ে গেছে আর আমার চারপাশে অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে আমি কাউকে চিনতে পারছিলাম না। খানিকক্ষণ পরে চিনতে পারলাম ডাঃ সেন আমার পাশে বসে আছেন।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাঃ সেন জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন ?

ঘুম ভাঙার পর ডাঃ সেনকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম বোধহয় বেড়াতে এসেছেন। তাই আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনি কেমন আছেন ?

'আমি ভাল আছি। আপনি ভাল তো ?'

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কাল আসবেন।' আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন অনেক বেলায় আমার ঘুম ভাঙল। গজানন চা নিয়ে এলো, ফিরিয়ে দিলাম। স্নান করতে বললো, করলাম

না। গজানন আবার কিছুক্ষণ পরে এসে অনুরোধ করল, আবার ওকে ফিরিয়ে দিলাম। আমি চুপচাপ বসে রইলাম।

এর পর মেজদি এসে অনুরোধ করলেন, নাও ভাই স্নান করে একটু কিছু মুখে দাও।

আমি কোন জবাবই দিলাম না। আরো কিছুক্ষণ এমনি করে বসে থাকার পর মনে হলো গ্রীনপার্কে মেমসাহেবের সংসারটা দেখে আসি। গজাননকে ডাক দিয়ে বললাম, গাড়ি তৈয়ার করো।

'কাঁহা যানা ছোটাসাব?' খুব মিহি গলায় গজানন জানতে চাইল।

'গ্রীন পার্ক।'

কিছুক্ষণ বাদে গজানন এসে খবর দিল, গাড়ি তৈয়ার হ্যায় ছোটাসাব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম।

গজানন বললো, এই নোংরা জামাকাপড় পরে বেরুবেন?

'তবে কি সিল্কের পাঞ্জাবী চাপিয়ে বেরুব?'

একটা চটি পায় দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেলাম। গজানন দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে পিছনের সীটে বসে পড়ল। মেজদিও নিঃশব্দে আমার পাশে এসে বসল।

সেদিন গাড়ি চালিয়েছিলাম বিদ্যুৎ বেগে। কোন স্টপ সিগন্যাল পর্যন্ত মানিনি। গজানন বললো, এত্‌না তেজ মাত চালাইয়ে। আমি ওর কথার কোন জবাবই দিলাম না। মেজদি বললেন, একটু আস্তে চালাও ভাই, বড় ভয় করে।

'কিচ্ছু ভয় নেই মেজদি। আমরা মরব না।'

সেদিন গ্রীনপার্কের বাসায় গিয়ে প্রথমে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখে জল এসেছিল। মুছে নিলাম। সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম, খুব ভাল করে দেখলাম। তারপর ড্রইংরুমে এসে বুক সেলফ-এর পর থেকে মেমসাহেবের পোট্রেটটা তুলে নিলাম।

ব্যস? আর আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। হাউ হাউ করে, চীৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। এত ছোটবেলায় মা'কে হারিয়েছিলাম যে চোখের জল ফেলতে পারিনি। পরবর্তীকালে জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক আঘাত পেয়েছি কিন্তু তখনও চোখের জল ফেলার অবকাশ পাই নি। তাইতো সেদিন গ্রীনপার্কের বাসায় আমার জমিয়ে রাখা সমস্ত চোখের জল বেরিয়ে এলো বিনা বাধায়।

মেমসাহেব আমার কাছে ছিল না, কিন্তু আমি স্থির জানি সে আমার কান্না না শুনে থাকতে পারে নি। আমার সমস্ত জীবনের চোখের জলের সব সঞ্চয় সেদিন ঐ পোড়ামুখীর জন্য ঢেলে দিয়েছিলাম, ভবিষ্যতের জন্য একটা ফোঁটাও লুকিয়ে রাখিনি।

মেজদি চুপটি করে পাশের সোফায় বসে কেঁদেছিলেন। গজানন দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিল।

চোখের জল থামলে মেজদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেমসাহেবের কি হয়েছিল মেজদি?

আর কি হবে? সেই কলকাতার চিরন্তন ঝামেলা আর খোকনের বিপ্লব।

পাঁচই ফেব্রুয়ারী। সওয়া-তিনটায় ক্লাস শেষ হবার পর মেমসাহেবের কলেজ থেকে বেরুতে বেরুতে প্রায় পৌনে চারটে হলো। হাওড়ায় এসে পাঁচ নম্বর বাস ধরল বাড়ি যাবার জন্য। আগের কয়েকদিনের মত সেদিনও বাস ডালহৌসী হয়ে গেল না। যাই হোক বাসায় পৌঁছবার পরই খোকনের এক ক্লাস ফ্রেণ্ড বলাই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, ছোড়দি, খোকনের বুকে গুলী লেগেছে।

মেমসাহেব শুধু চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায়?

'এসপ্ল্যানেড ইস্টএ।'

একমুহূর্ত নষ্ট করে নি মেমসাহেব। ট্যাক্সি নিয়ে ছুটেছিল

এসপ্লানেড। গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থামল। পুলিস আর এগুতে দিল না। মেমসাহেব ঐখান থেকে দৌড়ে গিয়েছিল এসপ্লানেড ইস্টে। তখন সেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলছে। মেমসাহেবও দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল খোকনকে পাবার জন্য। খোকনকে কি পাওয়া যায়? সে তো তখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মেমসাহেব খোকনকে না পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তার পাগলামি করতে হয় নি। ঐ চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে, টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ার অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটা রাইফেলের বুলেট এসে লেগেছিল বুকের মধ্যে।

আর খোকন? তার বুকে বুলেট লাগে নি, পায় লেগেছিল। ছোড়দিন মৃত্যু সংবাদে সেও উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। মেডিক্যাল কলেজের সমস্ত রোগীর আর্তনাদ ছাপিয়ে খোকনের কান্না শোনা গিয়েছিল।

দুদিন পরে কলকাতার কাগজগুলো মেমসাহেবের মৃত্যু নিয়ে চমৎকার হিউম্যান স্টোরি লিখেছিল। একটা কাগজে মেমসাহেব আর খোকনের ছবি পাশাপাশি ছেপেছিল। রিপোর্টটা পড়ে সবার মন খারাপ হয়েছিল। স্কুল-কলেজ, অফিসে, রেস্তোরাঁয়, ট্রামে-বাসে, লোক্যাল ট্রেনে সবাই এই স্টোরিটা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পুলিসের লোকজনও পড়েছিল। সবাই দুঃখিত, মর্মাহত হয়েছিলেন।

মনে পড়ল অনেকদিন আগে আমি যখন কলকাতায় রিপোর্টারী করতাম, তখন আমিও এমনি কত হিউম্যান স্টোরি লিখেছি, পড়েছি কিন্তু যেদিন আমার মেমসাহেবকে নিয়ে কলকাতার সব কাগজে এত বড় আর এত সুন্দর রিপোর্টটা ছাপা হলো, সেদিন অনেক চেষ্টা করেও আমি সে রিপোর্ট পড়তে পারলাম না।

বুকের মধ্যে খবরের কাগজগুলো চেপে জড়িয়ে ধরে শুধু নীরবে চোখের জল ফেলেছিলাম।

কুড়ি

তারপরের ইতিহাস আর কি বলব? আমার জীবন-মধ্যাহ্নেই এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবন-সূর্য চিরকালের জন্য ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়বে, কোনদিন কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু কি করব? ভগবান বোধহয় আমার জীবনটাকে নিয়ে লটারী খেলবার জন্যই আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। জীবনে যা কোনদিন কল্পনা করিনি, যা আমার মত অতি সাধারণ ছেলের জীবনে হওয়া উচিত ছিল না, আমার জীবনে সেইসব অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। যা বহুজনের জীবনে সম্ভব হয়েছে ও হবে, যা আমার জীবনেও ঘটতে পারত, ঠিক তাই হলো না।

কেন, কেন আমার এমন হলো বলতে পার? কে চেয়েছিল জীবনে এই প্রতিষ্ঠা? অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি? কে চেয়েছিল স্ট্যাণ্ডার্ড হেরল্ড? বছর বছর বিদেশ ভ্রমণ? আমি তো এসব কিছুই চাইনি। তিন-চারশ' টাকা মাইনের সাধারণ রিপোর্টার হয়ে মীর্জাপুর বা বৈঠকখানাতেই তো আমি বেশ সুখে থাকতে পারতাম। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অন্যান্য অনেকের মত আমিও তো পেতে পারতাম আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-সাধনার মানসীকে। আমার প্রেয়সীকে, আমার জীবন-দেবতাকে, আমার সেই এক অদ্বিতীয়া অনন্যাকে। ঐ পোড়ামুখী হতভাগী মেয়েটা আমার জীবনে এলে কি পৃথিবীর চলা থেমে যেত? চন্দ্র-সূর্য ওঠা বন্ধ হতো?

মাঝে মাঝে মনে হয়, কালাপাহাড়ের মত ভগবানের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিই। মনে হয় মন্দির-মসজিদ-গীর্জাগুলো ভেঙে চুরমার করে দিই। আমাদের মত অসহায় মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার ভগবানকে কে দিল? মায়ের কোল

থেকে একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নেবার অধিকার কে দিয়েছে ভগবানকে? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের পাকা ধানে মই দেবার সাহস ভগবানের এলো কোথা থেকে?

বিশে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ বিয়ের দিন আমি মেমসাহেবের দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গ্রীন পার্কের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর ঐ পোর্ট্রেটটা কোলে নিয়ে এইসব আজে-বাজে কথা ভাবতে ভাবতে চোখের জল ফেলেছিলাম সারারাত। চোখের জল মুছতে মুছতে ঐ ফটোয় মালা পরিয়েছিলাম, সিঁদুর দিয়েছিলাম। আর? আদর করেছিলাম, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিলাম।

শুধু সেই শুভদিনে নয়, তারপর থেকে রোজই আমি গ্রীন পার্কে যাই। কাজকর্ম শেষ করে রোজ সন্ধ্যার পর ওখানে গিয়ে মেমসাহেবের সংসারের তদারকি করি, মেমসাহেবকে আদর করি, সুখ-দুঃখের কথা বলি। রোজ অন্তত একবার মেমসাহেবের কাছে না গিয়ে থাকতে পারি না। কোন কোনদিন কাজকর্ম শেষ করতে করতে অনেক রাত হয়, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে চোখদুটো ঘুমে ভরে আসে। মনে হয় ওয়েস্টার্ন কোর্টেই চলে যাই, শুয়ে পড়ি। কিন্তু কি আশ্চর্য! গাড়ির স্টিয়ারিংটা ঠিক হেস্টিংস-তুগলক রোডের দিক ঘুরে সফদারজং এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে মেহেরলী রোড ধরে শেষপর্যন্ত গ্রীন পার্কে এসে হাজির হই।

লাদাক থেকে ফিরে এসে মেজদির কাছে যখন আমার চরম সর্বনাশের খবর শুনেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল আর বাঁচব না। প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় সব মানুষের মনেই এই প্রতিক্রিয়া হয়। আমারও হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমারও পরিবর্তন হয়েছে। মেমসাহেব নেই, কিন্তু আমি আছি। আমি মরিনি, মরতে পারিনি। আমি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতই বেঁচে আছি। আমাকে দেখে বাইরের কেউ জানতে পারবে না, বুঝতে পারবে না যে আমার বুকের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দুঃখ-আক্ষেপের হিমালয়

লুকিয়ে আছে। আমার হাসি-ঠাট্টা হৈ-হুল্লোড় দেখে কেউ অনুমান পর্যন্ত করতে পারেন না এতবড় একটা বিয়োগান্ত নাটকের আমি হিরো। আমার মুখে হাসি আছে, কিন্তু মনের বিদ্যুৎ, প্রাণের উচ্ছ্বাস, চোখের স্বপ্ন চলে গেছে, চিরকালের জন্য, চিরদিনের জন্য চলে গেছে।

জান দোলাবোদি, যতক্ষণ কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ততক্ষণ বেশ থাকি। বুকের ভিতরের যন্ত্রণা ঠিক অনুভব করার অবকাশ পাই না। কিন্তু রাত্রিবেলা? যখন আমি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের থেকে বহুদূরে চলে আসি, যখন আমি শুধু আমার স্মৃতির মুখোমুখি হই, তখন আর স্থির থাকতে পারি না। নিজেকে হারিয়ে ফেলি। সমস্ত শাসন অমান্য করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। মেমসাহেবের ফটোটাকে নিয়ে আদর করি, ভালবাসি, কথা বলি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। কত রাত হয়ে যায়, তবু ঘুম আসে না। আর ঘুম এলেও কি শান্তি আছে? ঐ হতচ্ছাড়ী পোড়ামুখী আমাকে একলা একলা ঘুমুতে দেখলে বোধহয় হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে। আমার ঘুম না ভাঙিয়ে ওর যেন শান্তি হয় না।

ফীরাক গোরখপুরীর একটা 'শের' মনে পড়ছে—

'নিদ আয়ে, তো খোয়াব আয়ে
খোয়াব আয়ে, তো তুম আয়ে
পর তুমহারি ইয়াদ মে
ন নিদ আয়ে, ন খোয়াব আয়ে।'

চমৎকার! তাই না? ঘুম এলেই স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন এলেই তুমি আস কিন্তু যেই তুমি আস তখন না আসে ঘুম, না আসে স্বপ্ন।

ফীরাক গোরখপুরীর জীবনেও বোধহয় আমারই মত কোন বিপর্যয় এসেছিল। তা না হলে এত করুণ, এত সত্য কথা, এত মিষ্টি করে লিখলেন কেমন করে? ফীরাক যা লিখেছেন তা বর্ণে

বর্ণে সত্য। যেই চোখের পাতাছুটো ভারী হয়ে বুজে আসে, সঙ্গে সঙ্গে ও পা টিপে টিপে আমার ঘরে ঢুকবে। আমি বুঝতে পেরেও পাশ ফিরে শুয়ে থাকি। ও আমার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে, কিন্তু তবুও আমি ওর দিকে ফিরে তাকাই না। হতচ্ছাড়ী আমাকে আদর করে ভালবেসে ঠোঁটছুটোকে শেষ করে দেয়। তারপর কিছুক্ষণ আমার বুকের 'পর মাথা রেখে শোবে, হয়ত বা আমার মুখটাকে নিজের বুকের মধ্যে রেখে আমাকে জড়িয়ে শোবে। আর চুপ করে থাকতে পারে না। ডাক দেবে, শুনছ?

আমি শুনতে পাই কিন্তু জবাব দিই না। আবার ডাকে, ওগো, শুনছ?

আমি হয়ত ছোট্ট জবাব দিই, উঃ।

হাত দিয়ে আমাকে টানতে টানতে বলবে, এদিক ফিরবে না?

অস্ফুটস্বরে একটা বিচিত্র আওয়াজ করে আমি এবার চিৎ হয়ে শুই। ও এক টানে আমাকে ওর দিকে ঘুরিয়ে নেয়। আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। ওকে জড়িয়ে ধরি আর যেই ছু'চোখ ভরে ওকে দেখতে চাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে মেমসাহেব রোজ রাত্রে আমার কাছে এসে ঘুমটা কেড়ে নিচ্ছে। আগে আমার কি বিশ্রী ঘুম ছিল! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হয়ে গেলেও আমার ঘুম ভাঙত না। ঘুমের জন্য মেমসাহেব নিজেই কি আমাকে কম বকাবকি করেছে? আর আজকাল? ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিছানায় গড়াগড়ি করি, কিন্তু ঘুম আসে না। একেবারে শেষরাত্রের দিকে ও ভোরবেলায় মাত্র ছু'তিন ঘণ্টার জন্য ঘুমাই।

জীবনটা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সবকিছু থেকেও আমার কিছু নেই। ঘর-সংসার থেকেও সংসারী হতে পারলাম না। তাছাড়া সংসারের জন্য কম করলাম না। সুন্দর সুখী পরিবারের জন্য যা কিছু দরকার, তা সবই আমার গ্রীন পার্কের বাড়িতে আছে।

যখন যেখানে গেছি, সেখান থেকেই মেমসাহেবের জন্য কিছু না কিছু এনে গ্রীন পার্কের বাড়িতে জমা করেছি। সোফা-কার্পেট-ফ্রিজ থেকে শুরু করে রেডিও-ট্রানজিস্টার-টেপরেকর্ডার পর্যন্ত আছে। মেমসাহেবের তো খুব চুল ছিল, তাই একবার ওকে বলেছিলাম, তোমাকে একটা হেয়ার-ড্রায়ার দেব। বেডরুমের ওয়াড্রবের নীচের তাকে দেখবে আমি ওর জন্য হেয়ার-ড্রায়ারও এনেছি। ওর খুব ইচ্ছে ছিল ও অর্গান বাজিয়ে গান গাইবে। বছর-দুই আগে জার্মান এম্বাসীর ফার্স্ট সেক্রেটারী দিল্লী থেকে বদলী হবার সময় ওদের অর্গানটা আমি কিনে নিই। ড্রইংরুমের ডানদিকে কোনায় অর্গানটা রেখেছি। অর্গানের এক পাশে মেমসাহেবের একটা ছবি আর গীতবিতান। ডানদিকে চেক্ কাট-গ্লাসের একটা ফ্লাওয়ার-ভাস-এ ফুল রেখে দিই।

মেমসাহেবের স্বপ্ন দেখার কোন সীমা ছিল না।...'ওগো, তুমি আমাকে একটা রকিং চেয়ার কিনে দেবে। শীতকালের দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া করে বারান্দায় রোদ্দুরের মধ্যে রকিং চেয়ারে বসে বসে দুলতে দুলতে আমি তোমার লেখা বই পড়ব।'...কবে আমি বই লিখব আর কবে ও আমার বই পড়বে, তা জানি না। তবে গ্রীন পার্কের বাড়ির সামনের বারান্দায় রকিং চেয়ার রেখেছি। শীতকালের দুপুরবেলা গ্রীন পার্ক গেলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, মেমসাহেব ওর লম্বা লম্বা চুলগুলো খুলে দিয়ে রকিং চেয়ারে দুলে দুলে আমার লেখা বই পড়ছে। ড্রইংরুমে ঢুকলে মনে হয় অর্গান বাজিয়ে মেমসাহেব গান গাইছে, জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।

আর কি লিখব দোলাবৌদি ? আমি আর পারছি না। এসব কথা লিখতে আমার হাতটা পর্যন্ত অবশ হয়ে আসে। আমি ভাবতে পারি না মেমসাহেব নেই। রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে গিয়ে দূর থেকে একটু ময়লা, একটু টানা-টানা চোখের বিরাট খোঁপাওয়ালা

মেয়ে দেখলেই মনে হয়, ঐ বুঝি মেমসাহেব। প্রায় ছুটে যাই তার পাশে। কোথায় পাব মেমসাহেবকে? ও এমন আড়াল দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে যে সারাজীবন আমি চোর হয়ে ওকে খুঁজে বেড়াব কিন্তু পাব না। আমি খালি অবাক হয়ে ভাবি আমাকে এত কষ্ট দিয়ে ওর কি লাভ? ওর কি একটু দুঃখ হয় না? আমাকে একটু দেখা দিলে কি আমি ওকে গিলে খেতাম? আজ আর আমি কিছুই চাই না। শুধু মাঝে মাঝে ওকে একটু দেখতে চাই, দেখতে চাই ওর সেই ঘন কালো টানা টানা গভীর দুটো চোখ, ঐ বিরাট খোঁপাটা, ঐ একটু হাসি। আর? আর কি চাইব? চাইলেই কি পাব? পাব কি আমার কপালে ওর একটু হাতের ছোঁয়া? আমি ভাবতে পারি না ওকে আর কোনদিন দেখতেও পাব না।

একসঙ্গে বেশীদিন আমি দিল্লীতে টিকতে পারি না। বছরে আটবার-দশবার ছুটে যাই কলকাতায়। ওর-আমার স্মৃতি-জড়ান রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। সকালবেলায় রাসবিহারীর মোড়ে লেডিজ ট্রামটার জন্য আর বিকেলবেলা এ্যাসেমব্লী হাউসের কোণে বা হাইকোর্টের ঐ ধারের রেস্টুরেন্টে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। ওকে দেখতে পাই না কিন্তু ওর ছায়া দেখতে পাই।

আরো কত কি করি! যেখানে যেখানে মেমসাহেবের স্মৃতি লুকিয়ে আছে, আমি সময় পেলেই সেখানে ছুটে যাই। ডায়মণ্ড-হারবার—কাকদ্বীপ থেকে শুরু করে দার্জিলিং-এর পাহাড়ে, পুরীর সমুদ্রপাড়ে, জয়পুরের রাস্তায়, সিলিসেরের লেকের ধারে ছুটে যাই। বিনিময়ে? বিনিময়ে শুধু চোখের জল আর পাঁজর-কাঁপানো দীর্ঘনিঃশ্বাস! ব্যস, আবার কি?

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ভুল, আমি মিথ্যা, আমি ছায়া, আমি অব্যয়! মনে হয় এমন করে নিজেকে বঞ্চনা করে কি লাভ? মেমসাহেব যদি আমাকে ঠকিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে, তবে আমিই

যা তাকে মনে রাখব কেন? হতচ্ছাড়ীকে ভুলব বলে হোয়াইট হর্স বা ভ্যাট-সিক্সটিনাইনের বোতল নিয়ে বসে ঢক-ঢক করে গিলেছি। গিলতে গিলতে বুক-পেট জ্বলে উঠেছেও আমি স্বাভাবিক থাকতে পারিনি, কিন্তু তবুও ওর হাসি, ওর ঐ দুটো চোখ আমার সামনে থেকে সরে যায় নি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি লম্পট, বদমাইস, দুশ্চরিত্র হবো; যখন যেখানে যে-মেয়ে পাব, তখন তাকে নিয়েই স্ফূর্তি করব, মজা করব, আনন্দ উপভোগ করব। মনে করেছি রক্তমাংসের এই দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলব। পারিনি দোলাবৌদি, পারিনি। সুযোগ-সুবিধা পেলেও পারিনি। সফিস্টিকেটেড সোসাইটির কত মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। কতজনের সঙ্গে আমি ঘুরে বেড়াই, সিনেমায় যাই, হোটেলে যাই, ফ্লোর শো'তে যাই। কখনো কখনো বাইরেও বেড়াতে যাই। রক্ত-মাংসের একটু-আধটু ছোঁয়াছুইতে ওদের অনেকেরই জাত যায় না, তা আমি জানি কিন্তু পারি না। মনে হয় মেমসাহেব পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

মেমসাহেবকে ভুলি কি করে? ওকে ভুলতে হলে নিজেকেও ভুলতে হয়, ভুলতে হয় আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু সে কি সম্ভব? আমি যদি উন্মাদ না হই, তাহলে তা কি করে হবে? আমার জীবনের অমাবস্যার অন্ধকারে ওর দেখা পেয়েছিলাম। কৃষ্ণপক্ষের দীর্ঘ পথযাত্রায় ও আমার একমাত্র সঙ্গিনী ছিল। কিন্তু পূর্ণিমার আলোয় ওকে পাবার আগেই ও পালিয়ে গেল। ও আমাকে সবকিছু দিয়েছে। কর্মজীবনে সাফল্য, সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা, প্রাণভরা ভালবাসা—সবকিছু দিয়েছে। নিজে কিছুই ভোগ করল না, কিছুরই ভাগ নিল না। সবকিছু রেখে গেল, নিয়ে গেছে শুধু আমার হৃৎপিণ্ডটা।

এই বিরাট দুনিয়ায় কত বিচিত্র আকর্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের মনকে প্রলুব্ধ করার জন্য সম্পদ-সম্ভোগের বন্যা বয়ে যাচ্ছে

দেশে দেশে। কত নারী, কত পুরুষ তা উপভোগ করছে। আমার জীবনেও সে সুযোগ এসেছে বার বার, বহুবার। স্বদেশে, বিদেশে সর্বত্র। কিন্তু পারিনি। মনের মধ্যে এমন জমাট-বাঁধা কান্না জমে আছে যে, আনন্দে-বাসরের কাছে গেলে আমি আঁতকে উঠি। দিল্লী, বোম্বে, কলকাতায় কত রসের মেলা বসে রোজ সন্ধ্যাবেলায়। কত বন্ধু-বান্ধব ও বান্ধবী সাদর আমন্ত্রণ জানান সে-উৎসবে, সে-রসের মেলায় অংশ নিতে। হয়ত সেসব উৎসবে উপস্থিত থাকি, হয়ত ঠোঁটের কোনায় একটু শুকনো হাসির রেখা ফুটিয়ে কাকলী রায় বা অনিমা মৈত্রকে আর এক গেলাস শ্যাম্পেন বা হুইস্কি এগিয়ে দিই কিন্তু মেতে উঠতে পারি না ওদের মত। শুধু এখানে কেন? লণ্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্কে? ওখানে তো সন্ধ্যার পর মানুষ মাটিতে থেকেও অমরাবতী-অলকানন্দায় বিচরণ করে। পরিচিত-পরিচিতার দল আমাকে হোটেল থেকে টেনে নিয়ে যায়, একলা থাকতে দেয় না। কিন্তু পারি কি ওদের মত অমরামতী-অলকানন্দায় উড়ে যেতে? পারি কি নিজেকে ভুলে যেতে? পারি না দোলাবৌদি, পারি না। সব সময় মনে হয় মেমসাহেব থাকলে কত মজা হতো!

ওর কত ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরবে। যখন ও আমার কাছে ছিল, তখন ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সামর্থ্য আমার ছিল না। অকর্মণ্য বেকার সাংবাদিক হয়ে ওকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় বেরুতেও ভয় পেতাম, লোকলজ্জায় পিছিয়ে যেতাম। আজ? আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আজ ঐ চিরপরিচিত কলকাতার রাজপথে আমি যে-কোন মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি। আমি জানি কেউ আমার সমালোচনা করবে না বা করলেও সে বিশ্ব-নিন্দুকদের আমি ভয় করি না। কিন্তু আজ কোথায় পাব আমার মেমসাহেবকে? যে কলকাতার রাজপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে স্বপ্ন দেখেছি ভবিষ্যৎ জীবনের, আজ আমি সেই পথ দিয়েই একা একা ঘুরে বেড়াই। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা

থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াই। ক্লান্ত হলে এক কাপ চা বা এক পেগ্ হুইস্কি নিয়ে বসে পড়ি, কিন্তু মেমসাহেবের স্মৃতি-বিজড়িত পথের আকর্ষণ কাটিয়ে ঘরে ফিরতে পারি না। ভাবি, নিঃসঙ্গভাবে পথ চলতে গিয়েই একদিন মেমসাহেবের দেখা পেয়েছিলাম ভিড়ের মধ্যে ওকে হারিয়ে ফেলেছি। হয়ত পথে পথে ঘুরতে ঘুরতেই আবার ওর দেখা পাব। আমি জানি এই পৃথিবীতে আর একটা মেমসাহেব পাওয়া অসম্ভব। যদিও বা সবকিছুর মিল খুঁজে পাই, ওর ঐ অপারেশনের চিহ্ন তো পাব না।

মেমসাহেবকে পেয়ে বোধহয় মনে মনে বড় বেশি অহংকার হয়েছিল। বোধহয় সেই তরুণ প্রেমিকের মত ভেবেছিলাম—

'জিস্ত্ পর ইনকিলাব আনে দে
কম্সিনী পর শরাব্ আনে দে
এ খুদা, তেরী খুদাই পলট্ দুঙ্গা
জরা লব্ তক্ শরাব্ আনে দে।
মরনে আর জিনে কা ফয়সালা হোগা
জরা উন্কা জবাব আনে দে।'

হয়ত সেই তরুণ প্রেমিকের মত ভেবেছিলাম, আমার হৃদয়ে বিপ্লব আসুক, আমার ঐ প্রাক্-যুবতীর যৌবন আসুক, ওর ঠোঁটে ভালবাসা আসুক, তারপর ভগবানের ভগবানত্ব ঘুচিয়ে দেব। ওর দেহে এই বিবর্তন আসার পর একবার বাঁচা-মরার ফয়সালা করে ছাড়ব।

আমিও বোধহয় এমনি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, মেমসাহেবকে পাবার পর সারা দুনিয়াটাকে একবার মজা দেখাব। আজ আমার পাশে মেমসাহেব থাকলে দুজনে মিলে হয়ত সত্যি অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতাম। ভগবান নিজের মাতব্বরী বজায় রাখবার জন্য আমাদের সে-সুযোগ দিলেন না। হিংসুটে ভগবান কেড়ে নিলেন মেমসাহেবকে। হতচ্ছাড়া ভগবান যদি আমাদের মত রক্ত-মাংসের

তৈরী হতেন, তাহলে অনুভব করতেন আমাদের জ্বালা-যন্ত্রণা। কিন্তু নিষ্প্রাণ পাথরের ঐ মূর্তিগুলো কি করে অনুভব করবে আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জ্বালা-যন্ত্রণার কথা। মানুষের মনের কথা বুঝবে না বলেই তো ও পাথরের মূর্তি হয়ে আমাদের উপহাস করছে, বিদ্রূপ করছে।

কাজকর্ম, দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে একটু মুক্তি পেয়ে একটু একলা হলেই এইসব আজেবাজে চিন্তা করি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, হয়ত মেমসাহেবকে নিয়ে অত আনন্দ করা আমার উচিত হয় নি। ভগবানের ব্যাঙ্কে আমার অদৃষ্টে যে-পরিমাণ আনন্দ জমা ছিল, আমি বোধহয় তার চাইতে অনেক, অনেক বেশি আনন্দের চেক কেটেছিলাম। তাই বোধহয় এখন সারাজীবন ধরে চোখের জলের ইনস্টলমেণ্ট দিয়ে সে দেনা শোধ করতে হবে। আবার কখনও কখনও মনে মনে সন্দেহ হয় যে, শ্যামবাজারের মোড়ে যেমন ফিরপো বা গ্র্যাণ্ড-গ্রেটইস্টার্ন হোটেল মানায় না, এসপ্লানেডের মোড়ে যেমন ছানার দোকান বেমানান হয়, তেমনি আমার পাশেও বোধহয় মেমসাহেবকে মানাত না। আই এফ এস বা আই এ এস বা টপ মার্কেণ্টাইল এক্সিকিউটিভের পাশে ওকে যেমন মানাত, তেমনি কি আমার পাশে সম্ভব হতো? কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে ভগবান আমার জীবনে ওকে আনলেন কেন? কি প্রয়োজন ছিল এই রসিকতার?

এসব কথা ভাবতে গেলে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। মাথাটা ঝিমঝিম করে, বুকের মধ্যে অসহ্য ব্যথা করে, হাত-পা অবশ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে ভাবি ও হতচ্ছাড়ী পোড়ামুখীর কথা আর ভাবব না, আর কোনদিন মনে করব না ওর স্মৃতি। ওর স্মৃতিকে ভুলবার জন্যই হয়ত দুটি-একটি বান্ধবীর সঙ্গে একটু বেশী মেলামেশা, একটু বেশী মাতামাতি করেছি কখনও কখনও। কিন্তু এক পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে এসেছি। অন্য কোন মেয়ের

সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা মেমসাহেব সহ্য করতে পারত না। বলত, 'ওগো, তুমি অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করো না।'

আমি জিজ্ঞাসা করতাম, কেন? আমি কি হারিয়ে যাচ্ছি?

'তা জানি না, তবে আমার বড় কষ্ট হয়।'

সেই স্মৃতি, সেই কথা, মেমসাহেবের সেই মুখখানা যেই মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমি পালিয়ে আসি ঐসব বান্ধবীর কাছ থেকে। তাছাড়া ও যদি অন্য ছেলেদের সঙ্গে একটু হাসি-ঠাট্টা বা গল্প-গুজব করত, তাহলে আমিও তো সহ্য করতে পারতাম না। সেবার দার্জিলিং-এ গিয়ে ও যখন আধঘণ্টার কথা বলে ঘণ্টা-দুই ধরে ইউনিভার্সিটির পুরান বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে হোটেলে ফিরে এলো, তখন ওকে আমি কি ভীষণ বকেছিলাম। সুতরাং আজ আমার কি অধিকার আছে বনানী, চন্দ্রাবলী বা অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে স্বতন্ত্র বিচরণ করবার? আমি যে অধিকার ওকে দিতে পারিনি, সে অধিকার আমি উপভোগ করি কোন্ মুখে?

তাইতো ওদের সবার কাছ থেকে পালিয়ে আসি। পালিয়ে আসি গ্রীন পার্কে। মেমসাহেবের সংসারে। ওর নিজে হাতে লাগান কাঠচাঁপা গাছে একটু জল দিই, বারান্দায় ডেকচেয়ারটাকে ঠিক করে রাখি। ড্রইংরুমে গিয়ে অর্গানটাকে একটু পরিষ্কার করি, মেমসাহেবের পোর্ট্রেটটা একটু বাঁকা করে ঘুরিয়ে রেখে ওর মুখোমুখি বসে থাকি।

আগে ভাবতাম কাজকর্ম শেষ করে বাড়িতে ফিরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনব। ভাবতাম, দুটো-একটা গান শোনাবার পর ও বলবে, সারাদিন বাদে বাড়ি ফিরলে। আগে স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। তারপর আবার গান শোনাব।

'আগে তুমি গান শোনাও। পরে স্নান করব।'

'লক্ষীটি, আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও, পরে গান শুনো। খাওয়া-দাওয়ার এত অনিয়ম করো না।'